সচিত্র ফিকহুল ইবাদাত

ইবাদাত-বিষয়ক বিধানাবলির সহজ ও সাবলীল উপস্থাপনা

https://www.al-feqh.com/bn

Dr. Abdullah Bahmmam





অনুবাদ

আবদুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান

পর্যালোচনার

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক



১

তাহারাত (পবিত্রতা) ও পানি

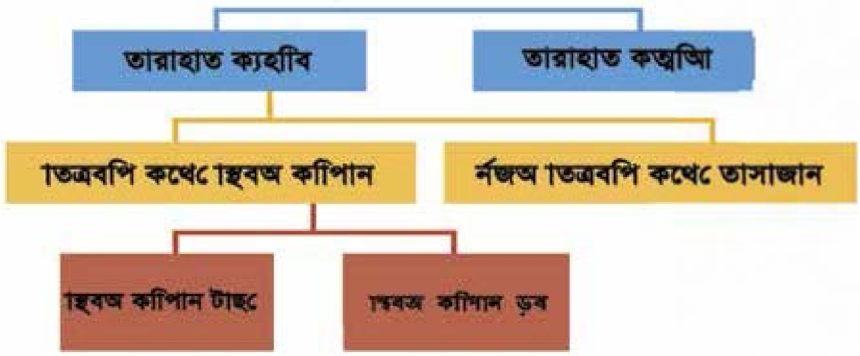
সূচীপত্র

তাহারাত

আভিধানিক অর্থে তাহারাত
ময়লা-আবর্জনা থেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

শরয়ী পরিভাষায় তাহারাত
অপবিত্রতা ও নাজাসাত দূর করা

তাহারাতের প্রকারভেদ





আত্মিক তাহারাত

আর তা হলো শিরক, পাপাচার ও যা কিছু অন্তরকে কলুষিত করে তা থেকে পবিত্রতা। হৃদয়ে শিরকের উপস্থিতি বজায় রেখে কখনো তাহারাত অর্জন করা যায় না। আল্লাহ তাআলা বলেন, {হে ঈমানদারগণ, নিশ্চয় মুশরিকরা অপবিত্র, সুতরাং তারা যেন মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী না হয় তাদের এ বছরের পর। আর যদি তোমরা দারিদ্র্যকে ভয় কর, তবে আল্লাহ চাইলে নিজ অনুগ্রহে তোমাদের অভাবমুক্ত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।} [সূরা আত তাওবা: ২৮]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুমিন কখনো অপবিত্র হয় না। (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

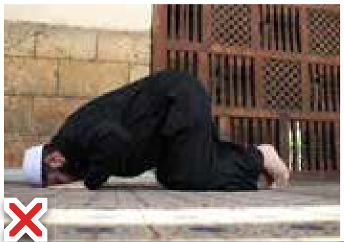
বাহ্যিক তাহারাত

আর তা হলো শরীরকে নাপাকি অবস্থা ও নাজাসাত থেকে পবিত্র করা।

তাহারাত দু'প্রকার:

১- নাপাকি অবস্থা থেকে পবিত্রতা

নাপাকি অবস্থা বলতে বুঝায়, দু'প্রকার: শরীরে এমন অবস্থার সৃষ্টি হওয়া, যার কারণে যেসকল ইবাদতে তাহারাতের শর্ত রয়েছে তা আদায় করতে না পারা। যেমন, নামাজ, পবিত্র কাবার তাওয়াফ ইত্যাদির জন্য তাহারাত শর্ত।


নাপাকি অবস্থায় নামাজ আদায় নিষেধ

আর এ নাপাকি অবস্থা

ছোট নাপাকি অবস্থা:

তা হলো যা সংঘটিত হলে অজু করা জরুরি হয়ে পড়ে। যেমন পেশাব, পায়খানা ও অন্যান্য অজু ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ। অজুর মাধ্যমে এ ধরনের নাপাকি থেকে পবিত্রতা অর্জন করা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

{হে মুমিনগণ, যখন তোমরা নামাজে দণ্ডায়মান হতে চাও, তখন তোমাদের মুখ ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর, মাথা মাসেহ কর এবং পা টাখনু পর্যন্ত ধৌত কর। } [সূরা আল-মায়েদা : ৬]


অজু হলো ছোট নাপাকি অবস্থা থেকে পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম

বড় নাপাকি অবস্থা:


শরীরের পবিত্রতা

তা হলো যা গোসল ফরজ করে দেয়। যেমন সঙ্গমজনিত নাপাকি, মাসিক ঋতু ইত্যাদি। এ থেকে পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম হলো গোসল। আল্লাহ তাআলা বলেন, (আর যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তবে ভালোভাবে পবিত্র হও।) [সূরা আল মায়েদা: ৬]

২- নাজাসাত থেকে পবিত্রতা অর্জন

নাপাক-ময়লা দূর করা ওয়াজিব। আল্লাহ তাআলা বলেন,

{আর তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র করো।} [সূরা আল মুদ্দাসসির : ৪]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,'অধিকাংশ কবরের আযাব হয়ে থাকে পেশাবের অপবিত্রতার কারণে।' (বর্ণনায় ইবনে মাজাহ)

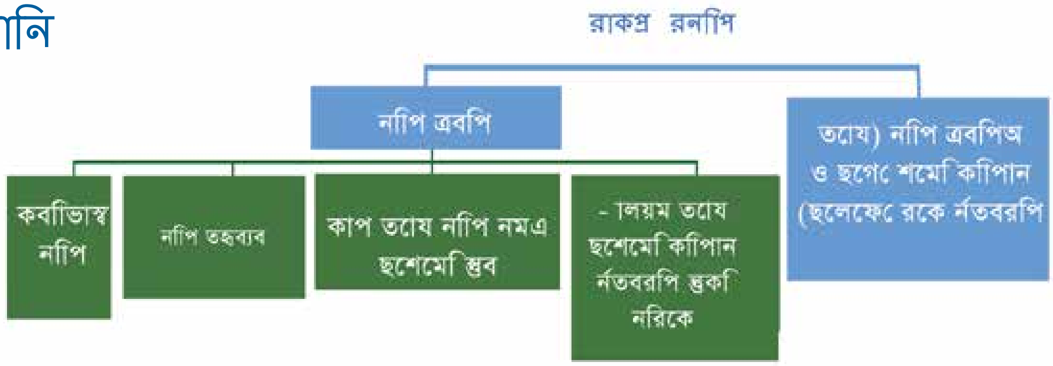
তিনি আরো বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ মসজিদে আসবে তখন সে যেন দেখে নেয়, যদি তার জুতোয় ময়লা-নাপাকি থাকে তাহলে সে যেন তা দুর করে নেয় এবং সে জুতো নিয়েই নামাজ আদায় করে।'(বর্ণনায় আবু দাউদ)


স্থানের পবিত্রতা


শরীরের পবিত্রতা


পোশাকের পবিত্রতা

পানি



পানির প্রকার

প্রথমত: পবিত্র পানি

তা হলো এমন পানি, নাপাক ময়লা যার রং বা স্বাদ অথবা গন্ধ পরিবর্তন করে দেয়নি, যেমন:

১- স্বাভাবিক পানি

আর তা হলো এমন পানি যা তার সৃষ্টিগত চরিত্র ধারণ করে আছে। হোক তা আকাশ থেকে বর্ষিত যেমন, বৃষ্টি কিংবা বরফ বা শিলা। অথবা জমিনে প্রবহমান পানি যেমন সাগরের পানি, নদীর পানি, বৃষ্টির পানি, কূপের পানি।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا﴾ {আর আমি আকাশ থেকে পবিত্র পানি বর্ষণ করেছি।} [সূরা আল ফোরকানঃ ৪৮]

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِۦ﴾

{এবং আকাশ থেকে তিনি তোমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন, এর দ্বারা তোমাদেরকে পবিত্র করার উদ্দেশ্যে।} [সূরা আল আনফাল : ১১]

আর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুআ করার সময় বলতেন, 'হে আল্লাহ আপনি বরফ, পানি আর শিলা দ্বারা আমার পাপ থেকে আমাকে ধুয়ে ফেলুন।'(বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

তিনি সাগরের পানি সম্পর্কে বলেছেন,'তার পানি পবিত্র আর তার মৃত হালাল।'(বর্ণনায় আহমাদ ও আবু দাউদ)


বৃষ্টি


নদী


কূপ


সাগর

২- ব্যবহৃত পানি

তা হলো অজু বা গোসলকারীর অঙ্গ স্পর্শ করে পতিত হওয়া পানি। পবিত্রতা অর্জনের জন্য এ পানির ব্যবহার দোষনীয় নয়। ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন স্ত্রী একটি পাত্র থেকে গোসল করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে পানি দিয়ে অজু করতে গেলে তাঁর স্ত্রী বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি তো অপবিত্র ছিলাম। তিনি বললেন, পানি অপবিত্র হয় না।' (বর্ণনায় তিরমিযী)

৩- যে পানির সাথে পবিত্র বস্তু মিশ্রিত হয়েছে

আর তা হলো এমন পানি যাতে কোনো পবিত্র বস্তু মিশে গেছে। যেমন গাছের পাতা বা মাটি অথবা মরিচা, যেমন পানির ট্যাংকিতে জমে-থাকা মরিচা। এগুলো যদি পানিকে এমন পরিবর্তন করে না দেয় যার কারণে পানিকে পানি বলে অভিহিত করা যায় না। এর প্রমাণ, যে সকল মহিলা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেয়েকে গোসল করাচ্ছিলেন তাদের তিনি বলেছেন, 'তোমরা তাকে পানি ও কুল পাতা দিয়ে গোসল করাও তিনবার বা পাঁচবার কিংবা তার চেয়ে বেশি - তোমরা যদি ভাল মনে কর- আর শেষে কর্পূর লাগিয়ে দাও।'(বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)



পানির ট্যাংকির মরিচা



এমন পানি যাতে গাছের পাতা মিশেছে



এমন পানি যাতে মাটি মিশ্রিত হয়েছে

> পানি যখন অন্য কিছুর প্রভাবে পরিবর্তন হয়ে ভিন্ন নামে অভিহিত হয়, তখন সে পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা শুদ্ধ নয়। যেমন চা, শরবত ইত্যাদি। কেননা তখন এটাকে পানি নামে অভিহিত করা হয় না।



ঝোল



চা



কালি



শরবত

৪- এমন পানি যার সাথে নাপাকি মিশ্রিত হয়েছে কিন্তু পানিকে পরিবর্তন করেনি

আর তা হলো এমন পানি যার মধ্যে কিছু নাপাকি পড়েছে, যেমন পেশাব বা মৃত প্রাণী ইত্যাদি। কিন্তু এটা পানির কোনো গুণকে পরিবর্তন করেনি।

এ পানি পবিত্র। কারণ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুযাআ কূপ সম্পর্কে বলেছেন, 'পানি হলো পবিত্র, কোনো কিছু এটাকে অপবিত্র করে না।'(বর্ণনায় আহমাদ ও তিরমিযী)

অর্থাৎ লোকেরা এই কূপের পাশে ময়লা আবর্জনা রেখে দিত আর বৃষ্টি সেগুলো কূপে নিয়ে যেত। কূপে পানির পরিমাণ বেশি হওয়ার কারণে এ সকল নাপাকি পতিত হওয়ার কারণে পানিতে কোনো প্রভাব বিস্তার করত না এবং পানি পরিবর্তিত হত না।

দ্বিতীয়ত: নাপাক পানি

তা হলো এমন পানি যার মধ্যে কোনো নাপাকি পতিত হয়েছে, যেমন পেশাব বা মৃত প্রাণী। এর ফলে পানির গন্ধ, স্বাদ, রং এ তিনটি গুণের একটি পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এ পানি সর্বসম্মতভাবে নাপাক। এটা ব্যবহার করা জায়েয নয়।





পানি পরিবর্তন করে-দেয়া মৃত প্রাণী



এমন মৃত প্রাণী যা পানি পরিবর্তিত করেনি

মাসায়েল

- পানির মৌলিক গুণ হলো পবিত্র হওয়া। তাই যদি কোথাও এমন পানি পাওয়া যায়, যা পাক না নাপাক, তা জানা না থাকে, তবে তা পবিত্র বলেই ধরতে হবে। এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ির প্রয়োজন নেই।

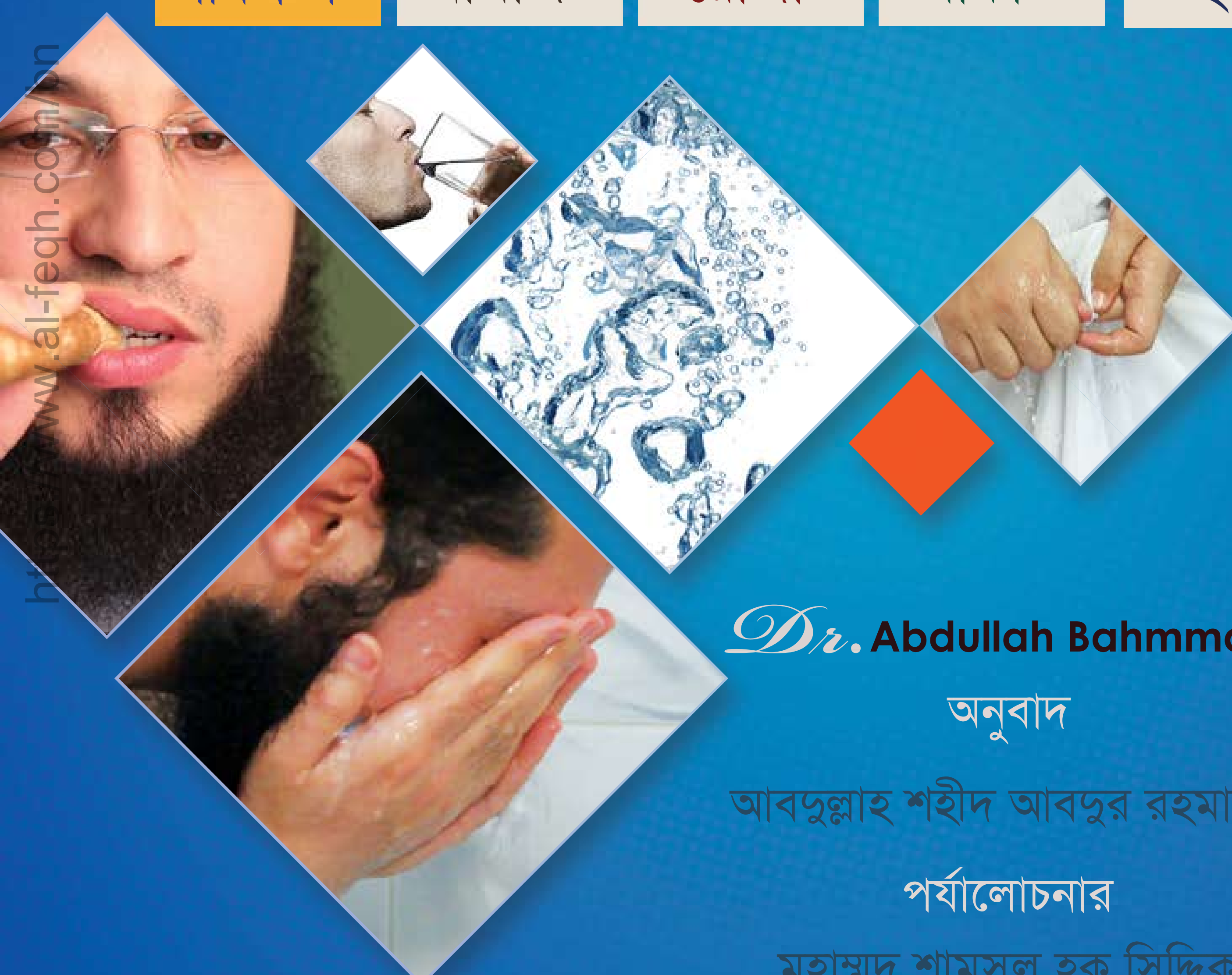
- যমযমের পানি দিয়ে অজু করা জায়েয। কারণ, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত, 'তিনি যমযমের এক বালতি পানি তলব করেছেন। অতঃপর তা থেকে তিনি পান করেছেন ও অজু করেছেন।'



আলোকচিত্রে ইবাদত

সহজ সরল উপায়ে ইসলামের বিধি-বিধান শেখা

পবিত্রতা | নামাজ | রোজা | যাকাত | হজ্ব



Dr. Abdullah Bahmmam

অনুবাদ

আবদুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান

পর্যালোচনার

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

নাজাসাত এর বিধি-বিধান

২ নাজাসাত এর বিধি-বিধান

সূচীপত্র

নাজাসাতের আভিধানিক অর্থ

নোংরা ময়লা

শরয়ী পরিভাষায় নাজাসাত

এমন নোংরা-ময়লা যা দূর করার জন্য শরীয়তে নির্দেশ এসেছে

নাজাসাতের প্রকারভেদ

১- মানুষের পেশাব ও মল

এক বেদুইন ব্যক্তি মসজিদে পেশাব করে দিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেছিলেন, 'এ সকল মসজিদ পেশাব ও নোংরা-ময়লার স্থান নয়। মসজিদ হলো আল্লাহ তাআলার যিকির, নামাজ ও কুরআন তেলাওয়াতের স্থান।' (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

২- রক্ত

হাদীসে এসেছে, খাওলা বিনতে ইয়াসার রাযি. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, 'আমার মাত্র একটি কাপড়, আমি ঋতুগ্রস্ত অবস্থায় তাই পরি। তিনি বললেন, 'যখন তুমি পবিত্র হবে তখন রক্তের স্থান ধুয়ে ফেলবে। এরপর সেই কাপড় পরে নামাজ আদায় করবে।'(বর্ণনায় আবু দাউদ)

কোনো কোনো ইমামের মতে শুধু মাসিকের রক্ত নাপাক। অন্যান্য রক্ত পবিত্র, প্রবাহিত রক্ত হোক বা অপ্রবাহিত। কারণ, হাদীসে এসেছে 'এক মুসলিম ব্যক্তি নামাজে থাকাকালে এক কাফের ব্যক্তি তার গায়ে তীর নিক্ষেপ করল। মুসলিম ব্যক্তি তার শরীর থেকে তীর উঠিয়ে ফেলল ও নামাজ চালিয়ে গেল, যদিও তার শরীর থেকে রক্ত ঝরছিল।'(বর্ণনায় আবু দাউদ)

৩-যেসকলজন্তুখাওয়াযায়নাতারপেশাব-পায়খানা

হাদীসে এসেছে, ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পায়খানায় গেলেন এবং আমাকে তিনটি পাথর নিয়ে যেতে বললেন। আমি দুটো পাথর পেলাম, তৃতীয় পাথর খোঁজ করেও পেলাম না। তখন আমি শুকনো গোবর নিলাম। এগুলো নিয়ে তাঁর কাছে গেলাম। তিনি পাথর দুটো নিলেন আর গোবর ফেলে দিলেন আর বললেন, এটা অপবিত্র।' (বর্ণনায় বুখারী)



যেসব জন্তু খাওয়া যায় তার পেশাবের হুকুম কি?

যেসকল জন্তু খাওয়া যায় বহু সংখ্যক আলেমের মতানুসারে তার পেশাব পবিত্র। তাদের প্রমাণ আনাস ইবনে মালেক রাযি. আনহুর বর্ণনা যে, কিছু সংখ্যক লোক মদীনায় এল। তারা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ল। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সদকার উটের কাছে পাঠালেন, যাতে তারা উটের দুধ ও পেশাব পান করতে পারে।

অবশ্য হানাফী মাযহাব মতে, ঘোড়া ও যে সকল জন্তু খাওয়া হয়, তার পেশাব লঘু নাপাক। যদি তা পরিমাণে বেশি না হয়, তাহলে তা ক্ষমাযোগ্য। যদি তা পোশাক বা শরীরের এক চতুর্থাংশ হয় তাহলে পরিমাণে বেশি বলে গণ্য হবে ।(বর্ণনায় বুখারী)

৪- মৃত প্রাণী

আর তা হলো, যা শরয়ী পদ্ধতিতে যবেহ ব্যতীত মারা যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٖ فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ﴾

{বল, 'আমার নিকট যে ওহী পাঠানো হয়, তাতে আমি আহারকারীর ওপর কোনো হারাম পাই না, যা সে আহার করে। তবে যদি মৃত কিংবা প্রবাহিত রক্ত অথবা শূকরের গোশত হয়- কারণ, নিশ্চয় তা অপবিত্র।} [সূরা আল আনআম : ১৪৫]

জীবিত অবস্থায় যদি পশুর কোনো অংশ কেটে আলাদা করা হয়, তা মৃত জন্তু বলে গণ্য হবে।



মৃত জন্তু

তবে এর ব্যতিক্রম হলো:

১-মৃত মাছ ও ফড়িং।

কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমাদের জন্য দুটো মৃত প্রাণী ও দুটো রক্ত হালাল করা হয়েছে। মৃত প্রাণী দুটো হলো, মাছ ও ফড়িং। আর রক্ত দুটো হলো, কলিজা ও প্লীহা।'(বর্ণনায় আহমদ)



মাছ



ফড়িং

২- এমন মৃত প্রাণী যার তরল রক্ত নেই, যেমন মাছি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যদি তোমাদের কারো পাত্রে মাছি পতিত হয়, তাহলে তাকে তাতে ডুবিয়ে দাও। কেননা তার এক ডানায় আরোগ্য ও অন্য ডানায় রোগ থাকে।'(বর্ণনায় বুখারী)



মাছি

৫- শূকরের গোশত

আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

﴿قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٖ فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ﴾

{বল, 'আমার নিকট যে ওহী পাঠানো হয়, তাতে আমি আহারকারীর ওপর কোনো হারাম পাই না, যা সে আহার করে। তবে যদি মৃত কিংবা প্রবাহিত রক্ত অথবা শূকরের গোশত হয়- কারণ, নিশ্চয় তা অপবিত্র।} [সূরা আল আনআম : ১৪৫]



শূকর

৬- কুকুর

কুকুরের সবকিছুই নাপাক। আর তার মুখের লালা হলো জঘন্য নাপাক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যদি তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর মুখ লাগায় তাহলে তা পবিত্রকরণের মাধ্যম হলো, সাতবার ধৌত করা। প্রথমবার মাটি দ্বারা।'(বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

কুকুরের মুখ লাগানোর অর্থ হলো, কুকুর তার জিহ্বা পাত্রে ঢুকিয়ে নাড়াচাড়া করা, সে পাত্র থেকে পান করুক বা না করুক।



কুকুরের মুখের লালা

৭- মযী বা কামরস

আর তা হলো, স্বচ্ছ, পাতলা, পিচ্ছিল পানি, যা যৌন উত্তেজনার শুরুতে বের হয় কিন্তু চরম পুলক অনুভব হয় না, তীব্র বেগে বের হয় না ও বের হওয়ার পর কোনো ক্লান্তি আসে না। অনেক সময় এ পানি বের হওয়ার বিষয়টি অনুভব করা যায় না।আলী ইবনে আবি তালেব রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যখন তিনি কামরস সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন, তখন তিনি বলেছেন, 'অজু করো আর পুরুষাঙ্গ ধুয়ে ফেল।' (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

৮- ওদী বা অনাকাঙ্খিত বীর্য

আর তা হলো, ঘন সাদা পানি, যা পেশাবের পর বের হয়।

বীর্যের পবিত্রতা ও অপবিত্রতা প্রসংগ

বীর্য: ঘন সাদা পচা ডিমের ন্যায় গন্ধযুক্ত পদার্থ যা চরম উত্তেজনার সময় প্রবল বেগে বের হয় আর বের হওয়ার পর ক্লান্তি অনুভূত হয়।ইমাম আবু হানিফা র: এর মতে বীর্য নাপাক।



যদি তা তরল হয় তাহলে ধুয়ে ফেলা



যদি তা শুকনো হয় তা হলে ঘষে উঠিয়ে ফেলা

মদ ও মাদকদ্রব্য দিয়ে তৈরি সুগন্ধি

আলেমদের অনেকের মত হলো, মদ বাহ্যিক অর্থে হোক বা অন্তরগত, সর্বাবস্থায় নাপাক। অপরদিকে অন্যএক দল আলেমের প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হলো, বাহ্যিকভাবে মদ পবিত্র ; অন্তরগত অর্থে তা অপবিত্র এবং তা পান করা কবীরা গুণাহ হওয়া সত্ত্বেও ।

তারা আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত বাণীতে মদকে অন্তরগত অপবিত্রতার অর্থে নিয়েছেন, জুয়া ও প্রতিমা-বেদীর মতোই। আল্লাহ তাআলা বলেন,

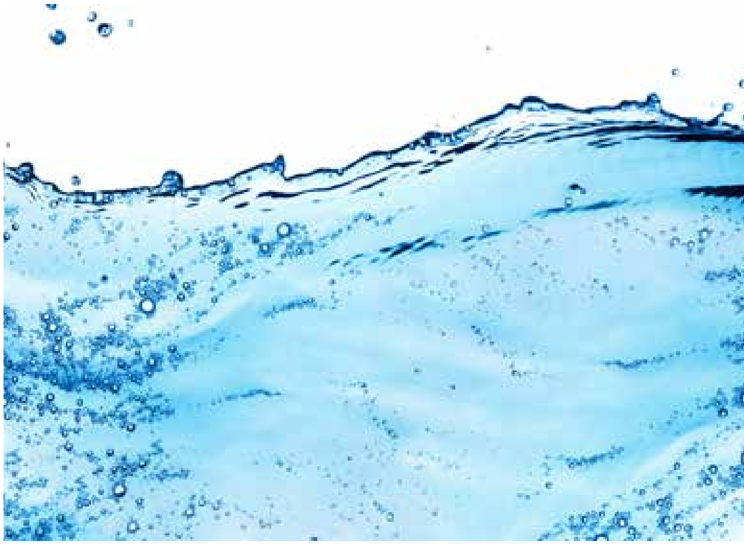
﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠﴾

{হে মুমিনগণ, নিশ্চয় মদ, জুয়া, প্রতিমা-বেদী ও ভাগ্যনির্ধারক তীরসমূহ তো নাপাক, শয়তানের কর্ম। সুতরাং তোমরা তা পরিহার কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।} [সূরা আল মায়েদা : ৯০]

এ মতের ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, যেসকল সুগন্ধিদ্রব্য মাদক বা এলকোহল দিয়ে তৈরি করা হয়, শরীয়তের দৃষ্টিতে তার ব্যবহার জায়েয।



মদ ও সুগন্ধিদ্রব্য



নাজাসাত পবিত্র করার পদ্ধতি

১-জমিনেলেগে-থাকানাজাসাতপবিত্রকরার পদ্ধতি

যখন জমিনে কোনো নাজাসাত লেগে যায় তখন পানি বা অন্যকিছু দিয়ে তা দূর করা হবে। এর প্রমাণ, যে বেদুইন লোকটি মসজিদে পেশাব করেছিল তার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তাকে ছেড়ে দাও আর তার পেশাবের ওপর এক পূর্ণ-বালতি বা এক পূর্ণঢোল পানি ঢেলে দাও।' (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)



পানি দ্বারা জমিন ধৌত করা

পবিত্রতা

আর নাজাসাত যদি তরল হয়, তবে তা শুকিয়ে গেলে জমিন পাক হয়ে যায়। আবু কিলাবাহ রাযি. থেকে বর্ণিত,'যদি জমিন শুকিয়ে যায় তাহলে তা পবিত্র হয়ে যায়।'(বর্ণনায় বুখারী)



তরল নাজাসাত শুকিয়ে যাওয়া



জমিনের ওপর তরল নাজাসাত

২- নাজাসাতযুক্ত পানি পবিত্র করা

যদি নাজাসাতযুক্ত পানির সাথে অধিক পরিমাণে পানি মিশে যাওয়ার ফলে নাজাসাতের প্রভাব চলে যায় তাহলে পানি পবিত্র হয়ে যায়। এমনিভাবে বর্তমান সময়ে বিভিন্ন আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করে পানি বিশুদ্ধ করা হয়, এ প্রক্রিয়াতেও পানি পবিত্র হয়ে যাবে।



অতিরিক্ত পানি দিয়ে পবিত্র করা



আধুনিক মাধ্যম ব্যবহার করে পবিত্র করা

৩- নাজাসাতযুক্ত কাপড় পবিত্র করা

নাজাসাতযুক্ত কাপড় পানি দিয়ে ধুইতে হবে, খুঁচিয়ে তুলে ফেলতে হবে ও নিংড়াতে হবে যাতে নাজাসাত দূর হয়ে যায়।



নাজাসাতযুক্ত কাপড় পবিত্র করা

৪- বিছানা-কার্পেট পবিত্র করা

বিছানা-কার্পেট ইত্যাদি পানি দিয়ে ধুইতে হবে অথবা আধুনিক ক্লিনিং যন্ত্রপাতি দিয়ে পরিষ্কার করতে ও খুঁচিয়ে তুলে ফেলতে হবে, যাতে নাজাসাত দূর হয়ে যায়।



বিছানা-কার্পেট পবিত্র করা

৫- মৃত জন্তুর চামড়া পবিত্র করা

১- গোশত খাওয়া যায় এমন মৃত প্রাণীর চামড়া পবিত্র করার পদ্ধতি

এ ধরনের চামড়া দাবাগাত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পবিত্র করা যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন

'যখন চামড়া দাবাগাত করা হয়, তখন পবিত্র হয়ে যায়।' (বর্ণনায় মুসলিম)

দাবাগাত হলো: কোনো কিছু দিয়ে চামড়া এমনভাবে প্রক্রিয়াজাত করা যাতে তা নরম ও দুর্গন্ধমুক্ত হয়ে যায়। আর যদি গোশত খাওয়া যায় এমন প্রাণী মৃত না হয় বরং শরীয়তসম্মত উপায়ে যবাইকৃত হয় তবে তার চামড়া পবিত্র ।



যেসকল প্রাণীর গোশত খাওয়া যায়



চামড়া প্রক্রিয়াজাত করা

২- গোশত খাওয়া যায় না এমন মৃত প্রাণীর চামড়া পবিত্রকরণ

এ প্রকৃতির প্রাণী ও মৃত প্রাণী একই হুকুমের আওতাভুক্ত। অর্থাৎ তা এমন নাজাসাত যা পবিত্র করা যায় না। যদি প্রাণীটি শরয়ী পদ্ধতিতে যবেহ করা হয় তবুও।



যেসব প্রাণীর গোশত খাওয়া যায় না

৬- দুগ্ধপোষ্য মেয়ে ও পুত্র সন্তানের পেশাব থেকে পবিত্রতা অর্জন

দুগ্ধপোষ্য মেয়ের পেশাব ধুয়ে ফেলতে হবে আর পুত্রের পেশাবে পানির ছিটা দিলেই চলবে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

'কন্যা সন্তানের পেশাব ধুয়ে ফেলা হবে আর পুত্রসন্তানের পেশাবের ওপর পানির ছিটা দিতে হবে।'(বর্ণনায় আবু দাউদ)



পুত্রসন্তানের পেশাবে পানি ছিটিয়ে দেয়া



কন্যাসন্তানের পেশাব ধৌত করা

৭- কুকুর যে পাত্রে মুখ দিয়েছে তা পবিত্রকরণ

সাতবার ধুইতে হবে, প্রথমবার মাটি দিয়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের কারো পাত্রে যদি কুকুর মুখ দেয় তাহলে তা সাতবার ধুইতে হবে, প্রথমবার মাটি দিয়ে।'(বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

একবার ৬ বার



মাটি দিয়ে পবিত্র করা ধুয়ে পবিত্র করা

৮-মযী বা কামরস ও ওদী বা অনাকাঙ্খিত বীর্য থেকে পবিত্রতা অর্জন

এ অবস্থায় পুরুষাঙ্গ ধুয়ে ফেলে অজু করতে হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী ইবনে আবু তালেব রাযি. কে বলেছেন, 'অজু করো আর তোমার পুরুষাঙ্গ ধুয়ে ফেল।' (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

আর কাপড়ের ব্যাপারে কথা হলো, যেখানে মযী বা ওদী লেগেছে সে স্থানে পানির ছিটা দিতে হবে। কারণ, সাহল ইবনে হানীফ রাযি. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে, তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করে বলেছেন,'ইয়া রাসূলুল্লাহ, যদি আমার কাপড়ে এগুলো লেগে যায় তাহলে আমি কি করব? তিনি বললেন, তুমি হাতের তালুতে পানি নিয়ে তোমার কাপড়ের সেই স্থানে লাগাবে যেখানে তুমি দেখতে পাও উহা লেগেছে।' (বর্ণনায় আবু দাউদ)

৯- মাসিকের রক্ত থেকে পবিত্রতা অর্জন

মাসিকের রক্ত পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। ধুয়ে ফেলার পর যদি রং অবশিষ্ট থাকে তবে কোনো ক্ষতি নেই। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'পানি তোমার জন্য যথেষ্ট আর তার রং অবশিষ্ট থাকলে ক্ষতি নেই।'(বর্ণনায় আবু দাউদ)

১০- জুতা পবিত্র করা

জুতা মাটির সাথে ঘষতে হবে যেন নাজাসাতের আলামত চলে যায়। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যদি তোমাদের কেউ তার জুতো দিয়ে নাজাসাত মাড়ায় তাহলে মাটি হলো তার পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম।'(বর্ণনায় আবু দাউদ)



জমিনে ঘষে জুতা পবিত্র করা

১১- মেয়েদের মাটি পর্যন্ত ঝুলে-পড়া পোশাক পবিত্র করা

যদি মেয়েদের ঝুলে পড়া আঁচলে নাজাসাত লেগে যায়, তাহলে পবিত্র স্থান দিয়ে হেঁটে যাওয়া পবিত্রতার জন্য যথেষ্ট। পবিত্র জমিন ওটাকে পাক করে দেবে। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তার পরের পথ তাকে পবিত্র করে দেবে।'(বর্ণনায় আবু দাউদ)



ময়লাবিহীন জমিনে হেঁটে যাওয়ার ফলে নারীর কাপড় পবিত্র হয়ে যাওয়া।

১২- জমে যাওয়া খাদ্যদ্রব্য পবিত্র করা

নাজাসাত ও তার আশপাশের অংশ ফেলে দিয়ে এ জাতীয় খাদ্যদ্রব্য পবিত্র করা যায়। আর যা অবশিষ্ট থাকবে তা পবিত্র হিসাবে থেকে যাবে। এর প্রমাণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঘি এর মধ্যে ইঁদুর পতিত হওয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছেন, 'ওটা এবং ওর আশপাশের ঘি ফেলে দাও আর বাকিটা রেখে দাও। এরপর তোমরা তোমাদের ঘি খেয়ে নাও।'(বর্ণনায় বুখারী)



ঘি, যাতে মৃত ইঁদুর পতিত হয়েছে

১৩- মসৃণ স্থান পবিত্র করা যেমন আয়না ও কাঁচ

এসব জিনিস মাসেহ করা হবে যেন নাজাসাতের আলামত চলে যায়



মোছার মাধ্যমে কাঁচ পবিত্র করা

নাজাসাত সম্পর্কে কিছু মাসায়েল

- নাজাসাত সম্পর্কে কিছু মাসায়েল

- যেকোনো বস্তুর মৌলিক গুণ হলো পবিত্র হওয়া। যতক্ষণ না তাতে নাজাসাতের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়।

- যদি কোনো বস্তুতে নাজাসাত লেগে যায় কিন্তু তার স্থান জানা না থাকে, তাহলে পুরোটাই ধুয়ে ফেলতে হবে।

- যদি কোনো নাজাসাত অন্য বস্তুতে পরিণত হয় - যেমন গাধার গোবর পুড়ে ছাই হয়ে গেল- তাহলে তা পবিত্র বলে গণ্য হবে।

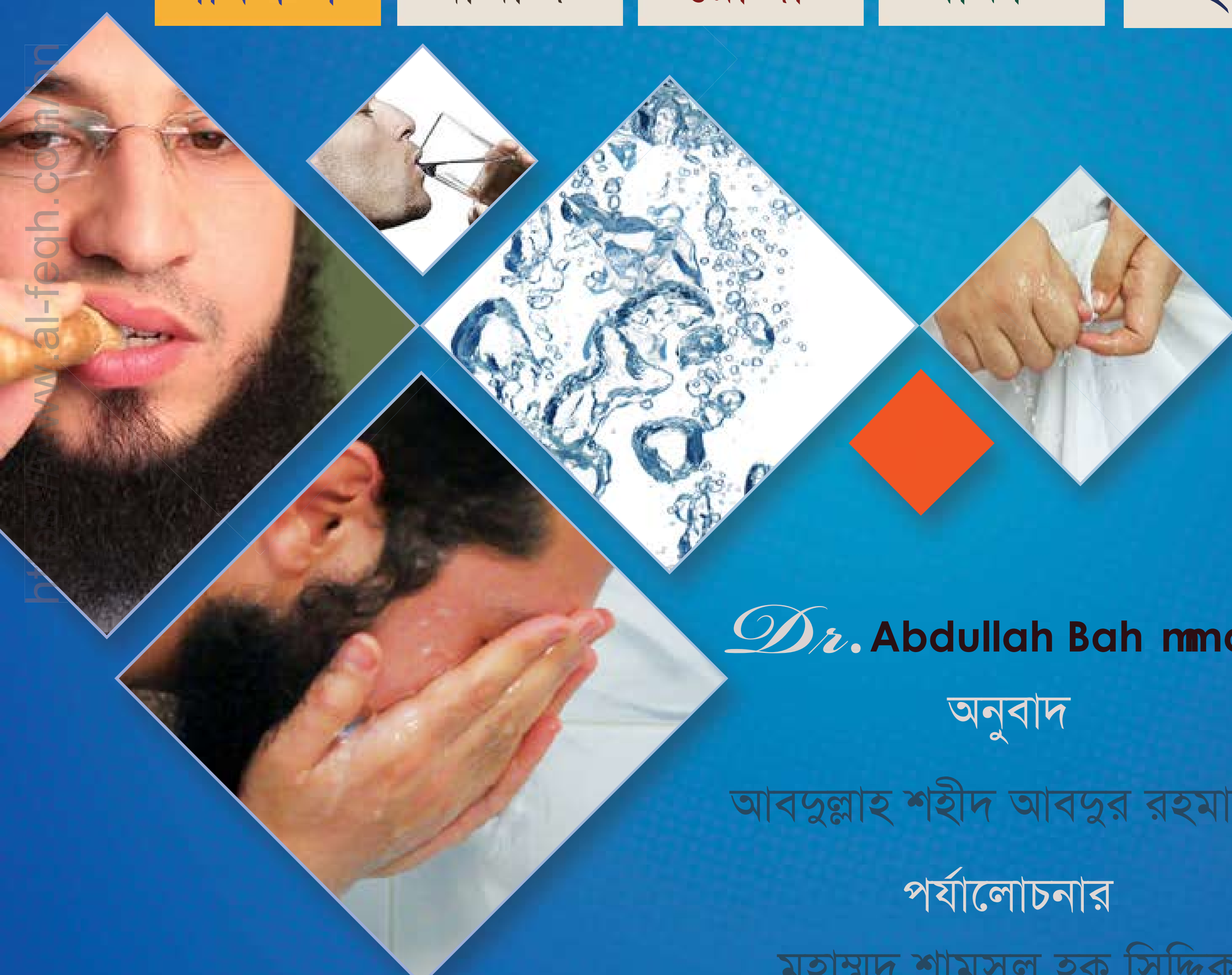


গোবর ছাইয়ে পরিণত হলে তা পবিত্র হয়ে যায়।

আলোকচিত্রে ইবাদত

সহজ সরল উপয়ে ইসলামের বিধি-বিধান শেখা

পবিত্রতা | নামাজ | রোজা | যাকাত | হজ্ব



Dr. Abdullah Bah mmam

অনুবাদ

আবদুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান

পর্যালোচনার

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

ইসলামে উচ্ছিষ্ট জিনিসের বিধান

৩ উচ্ছিষ্ট জিনিস

সূচীপত্র

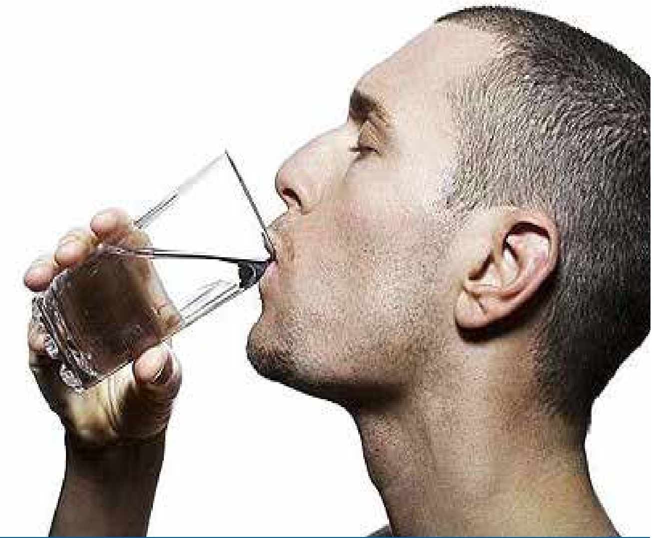
উচ্ছিষ্ট
পানকারী পান করার পর পাত্রে যা অবশিষ্ট থাকে তাকেই উচ্ছিষ্ট বলে

উচ্ছিষ্ট বস্তু মৌলিকভাবে পবিত্র যতক্ষণ না এর নাপাকির পক্ষে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় :

১- পবিত্র উচ্ছিষ্টসমূহ

ক) মানুষের উচ্ছিষ্ট

হাদীসে এসেছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশা রাযি. এর উচ্ছিষ্ট থেকে পান করতেন, এমনকি তিনি ঋতুগ্রস্ত থাকা অবস্থায়ও। তিনি সেখানে মুখ লাগাতেন যেখানে আয়েশা রাযি. মুখ লাগিয়েছেন।’(বর্ণনায় মুসলিম)


মানুষের উচ্ছিষ্ট

খ) বিড়ালের উচ্ছিষ্ট

এর প্রমাণ, একটি বিড়ালের পান করা পানির ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘এটা অপবিত্র নয়। এটা তোমাদের কাছে বার বার আসা যাওয়া করে।’(বর্ণনায় তিরমিযী)


বিড়ালের উচ্ছিষ্ট



গ) যেসকল প্রাণীর গোশত খাওয়া হয় এবং গাধা ও খচ্চর, হিংস্র জন্তু, শিকারী পাখির উচ্ছিষ্ট ইত্যাদির হুকুম

এসব পবিত্র; কেননা মৌলিকভাবে সকল বস্তুই পবিত্র যতক্ষণ না তার অপবিত্র হওয়ার পক্ষে কোনো শরয়ী দলিল পাওয়া যায়। আর এ ক্ষেত্রে অপবিত্র হওয়ার দলিল অনুপস্থিত। উপরন্তু নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গাধার ওপর আরোহন করতেন, গাধা তাঁর আমলে যানবাহন হিসাবে ব্যবহৃত হত।



শিকারী পাখির উচ্ছিষ্ট



হিংস্র প্রাণীর উচ্ছিষ্ট



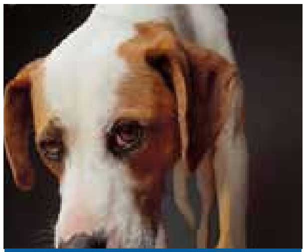
গাধার উচ্ছিষ্ট



যেসকল প্রাণীর গোশত খাওয়া যায় তার উচ্ছিষ্ট

২- অপবিত্র উচ্ছিষ্ট

ক) কুকুরের উচ্ছিষ্ট



কুকুরের উচ্ছিষ্ট

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের কারো পাত্রে যদি কুকুর মুখ দেয় তাহলে তা সাতবার ধুইতে হবে, প্রথমবার মাটি দিয়ে।(বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

খ) শূকরের উচ্ছিষ্ট



শূকরের উচ্ছিষ্ট

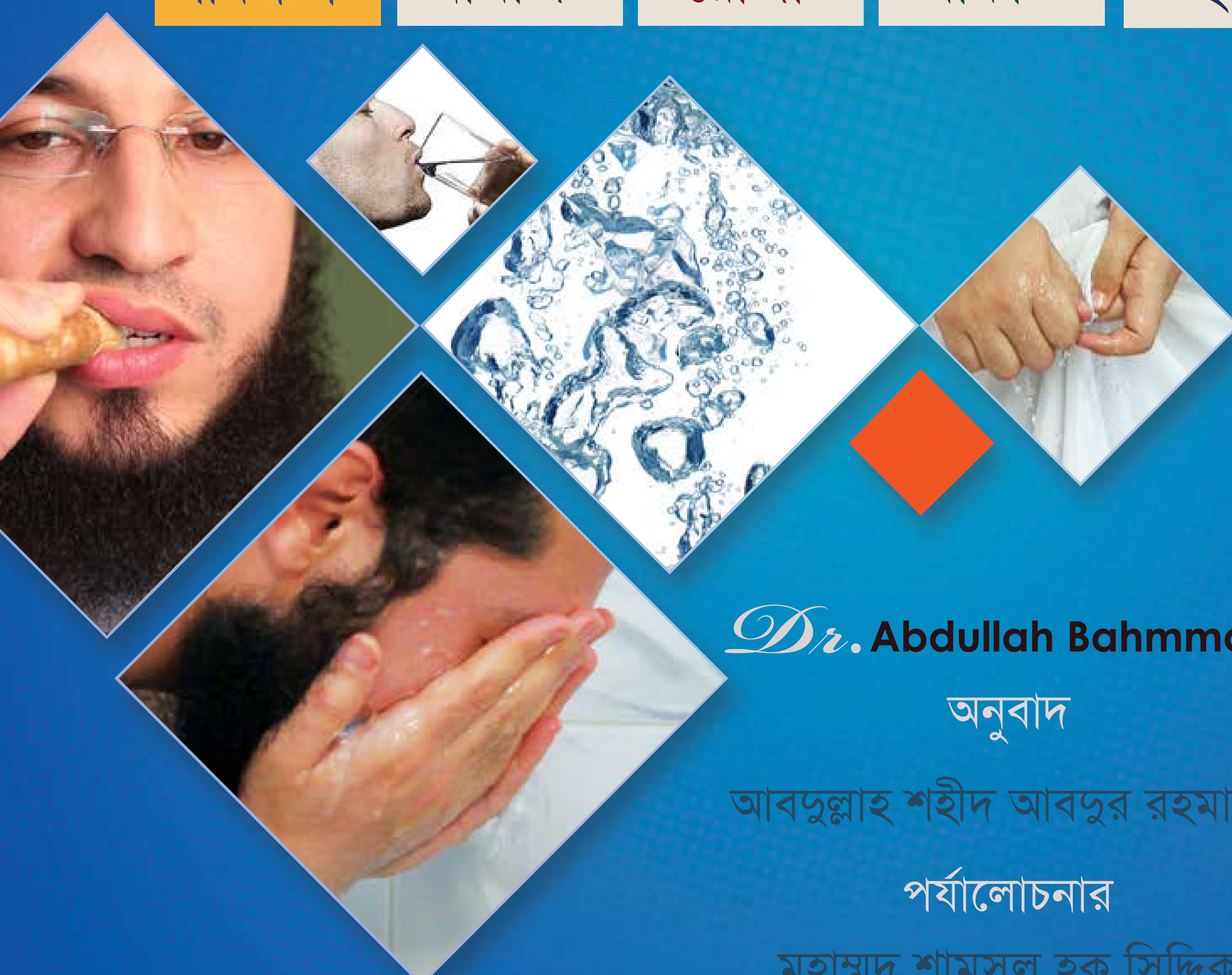
কুকুরের যে হুকুম শূকরেরও একই হুকুম। কারণ উভয় প্রাণী প্রকৃতগতভাবে অপবিত্র।



আলোকচিত্রে ইবাদত

সহজ সরল উপায়ে ইসলামের বিধি-বিধান শেখা

পবিত্রতা | নামাজ | রোজা | যাকাত | হজ্ব



Dr. Abdullah Bahmmam

অনুবাদ

আবদুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান

পর্যালোচনায়

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

স্বর্ণ-রুপার পাত্র ব্যবহারে ইসলামের বিধান

৪ পাত্র



সূচীপত্র

পাত্র

যেসকল পাত্রে পানি ইত্যাদি সংরক্ষণ করা হয়

পানাহার ইত্যাদিতে সকলপ্রকার পাত্র ব্যবহার করা যায় তবে স্বর্ণ ও রুপার পাত্র ব্যতীত। এ সম্পর্কে বিস্তারিত নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

পানাহারে স্বর্ণ ও রুপার পাত্র ব্যবহার

এটা হারাম। কারণ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা স্বর্ণ ও রুপার পাত্রে পান করবে না। আর এসবের পাত্রে খানা খাবে না। এগুলো দুনিয়াতে তাদের জন্য আর আমাদের জন্য রয়েছে আখেরাতে তিনি আরো বলেছেন, যে ব্যক্তি রুপার পাত্রে পান করবে সে তার পেটে জাহান্নামের আগুন টেনে বেড়াবে।(বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)



রুপার পাত্রে খাওয়া দাওয়া করা



¯^র্ণের পাত্রে খাওয়া দাওয়া করা



পানাহার ব্যতীত অন্য কাজে স্বর্ণ ও রুপার পাত্র ব্যবহার

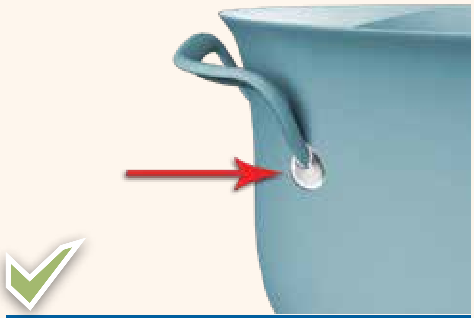
পানাহার ব্যতীত অন্য কাজে এর ব্যবহার জায়েয, যেমন অজু ইত্যাদিতে ব্যবহার করা। কেননা উল্লিখিত হাদীসটিতে শুধু পানাহারের কথা বলা হয়েছে। হাদীসে এসেছে যে, উম্মে সালামা রাযি. এর কাছে রুপার একটি বাটা ছিল, আর তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কয়েকটি কেশ রাখা ছিল।'(বর্ণনায় বুখারী)

রুপাযুক্ত পাত্র ব্যবহার

প্রয়োজনে সামান্য রুপাযুক্ত পাত্র ব্যবহার জায়েয। কেননা হাদীসে এসেছে যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাপ ভেঙ্গে গেলে তিনি ফাটা স্থানে রুপার চেইন লাগিয়েছিলেন। (বর্ণনায় বুখারী)



অজুর জন্য রুপার বদনা



রুপা দিয়ে ঝালাই-করা পাত্র ব্যবহার



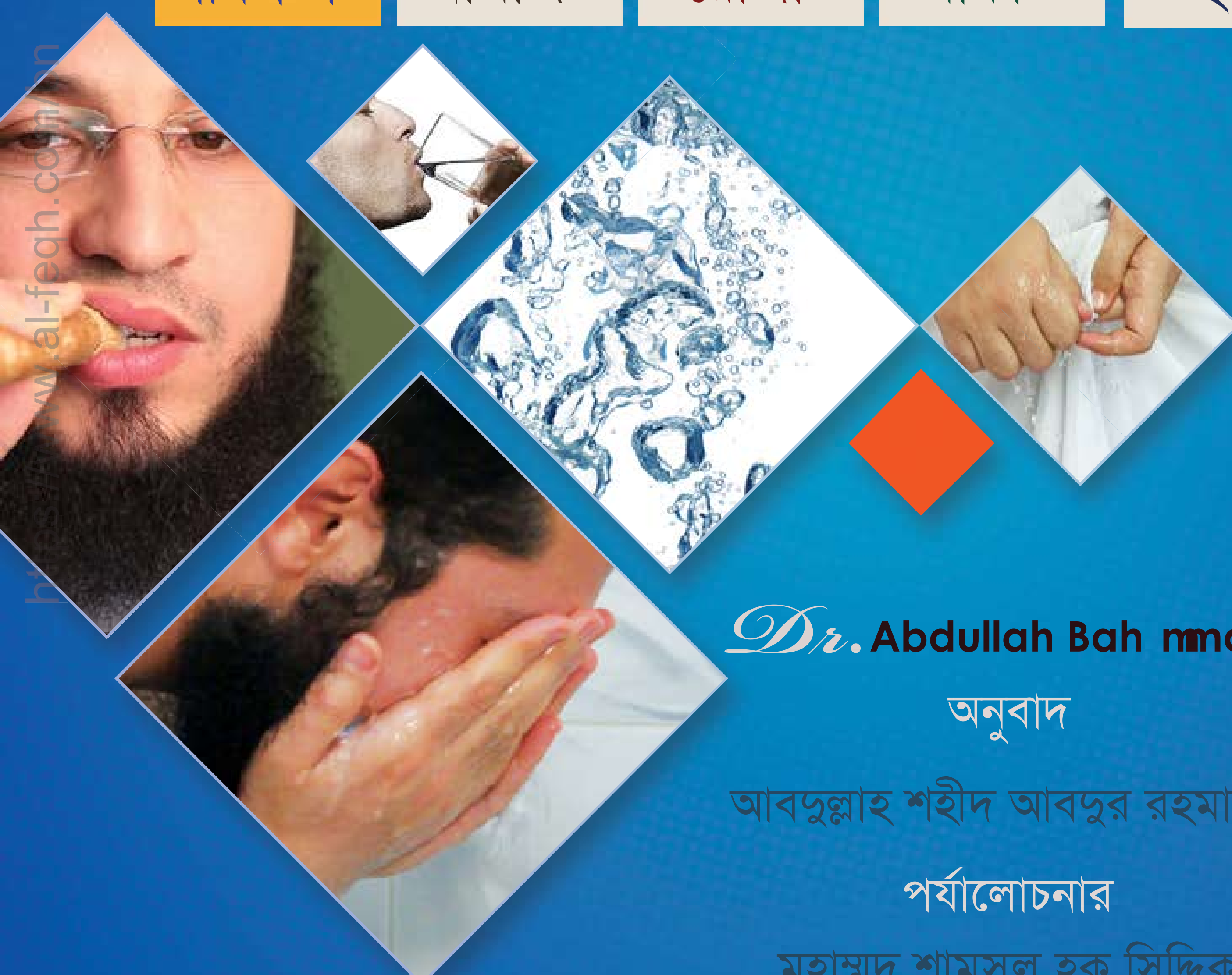
পুরুষ লোকের স্বর্ণ ব্যবহার

পুরুষের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার জায়েয নয়। আবু মূসা আল আশআরী রাযি. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য রেশমী কাপড় ও স্বর্ণ ব্যবহার হারাম করা হয়েছে, আর নারীদের জন্য হালাল করা হয়েছে।' বর্ণনায় তিরমিযী

আলোকচিত্রে ইবাদত

সহজ সরল উপয়ে ইসলামের বিধি-বিধান শেখা

পবিত্রতা | নামাজ | রোজা | যাকাত | হজ্ব



Dr. Abdullah Bah mmam

অনুবাদ

আবদুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান

পর্যালোচনার

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

পেশাব পায়খানার বিধি-বিধান



পেশাব পায়খানার বিধি-বিধান

পেশাব পায়খানার সময় যা করণীয়

- পেশাব পায়খানার সময় মানুষের দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করা। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘জিনের দৃষ্টি ও মানব সন্তানের লজ্জাস্থানের মধ্যে আড়াল হলো, যখন তাদের কেউ শৌচাগারে প্রবেশ করবে তখন বলবে ‘বিসমিল্লাহ।’(বর্ণনায় তিরমিযী)

- নাপাকি থেকে নিজের শরীর ও কাপড়ের দূরত্ব বজায় রাখা। যদি কিছু লেগে যায় তাহলে ধুয়ে ফেলা। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুটো কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, ‘তাদের উভয়কে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। বড় কোনো গুনাহের কারণে শাস্তি দেয়া হচ্ছে না। এই ব্যক্তি তো পেশাব থেকে দূরত্ব বজায় রাখত না।’(বর্ণনায় আবু দাউদদ)

- পানি ব্যবহার বা ঢিলা-কুলুক ব্যবহার করা। আনাস বিন মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, তিনি বলেছেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইস্তেন্জার স্থানে প্রবেশ করতেন। আমি ও একটি বালক পানি ও নেজা বহন করে নিয়ে যেতাম। তিনি পানি দিয়ে ইস্তেন্জা করতেন।’(বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

সূচীপত্র

পেশাব পায়খানার সময় যা নিষিদ্ধ

১. খোলা স্থানে পেশাব-পায়খানা করার সময় কেবলা-কে সামনে বা পিছনে রাখা। আর দেয়াল-ঘেরা স্থানে পেশাব-পায়খানা করার সময় এটি পরিহার করা উত্তম। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যখন তোমরা শৌচস্থানে যাবে তখন পেশাব অথবা পায়খানার সময় কেবলা-কে সামনে বা পিছনে রাখবে না। তোমরা পূর্ব বা পশ্চিমে মুখ করে বসবে (অর্থাৎ কেবলা এড়িয়ে অন্যদিকে বসবে)।'(বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

২. মানুষের চলাচলের পথে, মানুষ যে ছায়ায় আশ্রয় নেয়, মানুষের সমাগম স্থানে পেশাব পায়খানা করা। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা দুটো অভিশাপদানকারী থেকে বেঁচে থাকো। লোকেরা প্রশ্ন করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, দুটো অভিশাপদানকারী কি? তিনি বললেন, 'যে মানুষের চলাচলের পথে বা তাদের ব্যবহারের ছায়ায় পেশাব-পায়খানা করে। (বর্ণনায় মুসলিম)

৩. কুরআনের কপি নিয়ে টয়লেটে প্রবেশ করা। কারণ, এতে আল্লাহ তাআলার কিতাবকে অপমান করা হয়।

৪. স্থির অর্থাৎ চলমান নয় এমন পানিতে পেশাব করা, যেমন গোসল করার হাউয।

কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যেন কখনো স্থির পানিতে পেশাব না করে। অতঃপর তা থেকে গোসল করে।'(বর্ণনায় বুখারী)



কেবলাকে সামনে বা পিছনে না রাখা



মানুষ থেকে দূরে যাওয়া



এমন জিনিস নিয়ে টয়লেটে প্রবেশ করা যাতে আল্লাহর যিকির রয়েছে

আবদ্ধ পানিতে পেশাব করা

এটা প্রমাণিত যে আবদ্ধ পানিতে পেশাবের কারনে মানুষ (সিস্টোসোমিয়াসিস) রোগে আক্রান্ত হয়, যা পানিবাহিত পরজীবী কৃমির মাধ্যমে ছড়ায়, যাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে (বা শামুক জ্বর) বলা হয়। (আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে তিব্বে ('নববী 'গিয়াস আল-আহমাদ

পেশাব পায়খানার সময় যা মুস্তাহাব

১. উন্মুক্ত স্থানে পেশাব পায়খানা করার সময় মানুষ থেকে দূরে যাওয়া

২. টয়লেটে প্রবেশের সময় বলা,

«باسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخُبْث والخبائث».

'বিসমিল্লাহ, আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল খুবসি ওয়াল খাবায়িস।'

৩. টয়লেটে প্রবেশের সময় বাম পা প্রথমে ঢুকানো আর বের হওয়ার সময় ডান পা প্রথমে বের করা।

৪. বের হওয়ার সময় বলা," غفرانك " "গুফরানাকা"



পেশাব-পায়খানার সময় কথা বলা



ডান পা দিয়ে বের হওয়া



বাম পা দিয়ে প্রবেশ করা

পেশাব-পায়খানার সময় যা মাকরূহ

১. পেশাব-পায়খানা করার সময় কথা বলা অথবা প্রয়োজন ব্যতীত কাউকে সম্বোধন করা। ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে, ''নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পেশাবরত অবস্থায় থাকাকালে একব্যক্তি তাকে সালাম দিলে, তিনি তার উত্তর দিলেন না।'(বর্ণনায় মুসলিম)

২. এমন কিছু নিয়ে টয়লেটে প্রবেশ করা যাতে আল্লাহ তাআলার যিকির আছে। তবে সেটি যদি চুরি হওয়া বা হারিয়ে যাওয়ার ভয় থাকে তাহলে অন্যকথা। কারণ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন টয়লেটে প্রবেশ করতেন তখন তার আংটি খুলে রেখে যেতেন।'(বর্ণনায় আবু দাউদ)

৩. ডান হাত দিয়ে লজ্জাস্থান স্পর্শ করা অথবা ডান হাত দিয়ে ইস্তেন্জা বা ঢিলা-কুলুক ব্যবহার করা। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'পেশাব করার সময় তোমাদের কেউ কখনো ডান হাত দিয়ে লজ্জাস্থান ধরবে না আর টয়লেটে সেরে ডান হাত দিয়ে ইস্তেন্জা করবে না।'(বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

৪. ফাটল বা বন্যজন্তুর গর্তে পেশাব করা; তাতে কীট-পতঙ্গ দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।



এমন জিনিস নিয়ে টয়লেটে প্রবেশ করা যাতে আল্লাহর যিকির রয়েছে

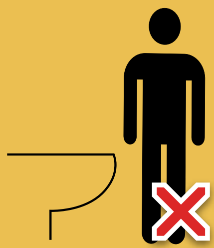


বন্যজন্তুর গর্তে পেশাব করা



দাঁড়িয়ে পেশাব করা

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু প্রয়োজনের ক্ষেত্রে যদি পেশাবের ছিটা থেকে নিরাপদ থাকা যায় তাহলে দাঁড়িয়ে পেশাব করা জায়েয। হাদীসে এসেছে, হুযাইফা রাযি. বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি জনপদের ময়লা-আবর্জনা ফেলার স্থানে এসে দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন।’(বর্ণনায় বুখারী)



ইস্তেনজা ও ঢিলা-কুলুক ব্যবহার

ইস্তেনজা

মলদ্বার ও লজ্জাস্থান থেকে বহির্গত ময়লা পবিত্র পানি দ্বারা পরিষ্কার করা।

ঢিলা-কুলুক ব্যবহার

মলদ্বার ও লজ্জাস্থান থেকে বহির্গত ময়লা পাথর ইত্যাদি দ্বারা পরিষ্কার করা।

ইস্তেঞ্জা বিধানসম্মত, এর প্রমান: আনাস ইবনে মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পায়খানার স্থানে প্রবেশ করতেন। আমি ও একটি বালক পানি ও নেজা বহন করতাম। তিনি পানি দিয়ে শৌচকর্ম করতেন।’

শুধুমাত্র ঢিলা-কুলুক ব্যবহার করলেও জায়েয হবে। তবে তার জন্য দুটো শর্ত প্রযোজ্য:

১- ময়লা বা পেশাব বের হওয়ার সময় তা যেন স্বাভাবিক স্থান অতিক্রম করে না যায়। অন্যথায় পানি অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে।

২- ময়লা বা পেশাব বের হওয়ার সময় তা যেন স্বাভাবিক স্থান অতিক্রম করে না যায়। অন্যথায় পানি অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে।

শৌচকর্ম ও ঢিলা-কুলুক ব্যবহারের হিকমত

১- পবিত্রতা অর্জন ও নাজাসাত দূর করা

২- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন ও রোগ-ব্যাধির কার্যকারণ থেকে মুক্ত থাকা

কতিপয় জ্ঞাতব্য

১- বায়ু বের হওয়ার পর ইস্তেন্জার দরকার নেই

২- ঢিলা-কুলুক ব্যবহারের চেয়ে পানি দিয়ে ইস্তেন্জা করা উত্তম। কারণ এতে রয়েছে অধিকতর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা

যা দিয়ে ঢিলা-কুলুকের কাজ সারা হবে তার শর্তাবলী

ক) তা পবিত্র হতে হবে, নাপাক হলে শুদ্ধ হবে না।

খ) বস্তুটির ব্যবহার জায়েয হতে হবে, নিষিদ্ধ হলে শুদ্ধ হবে না।

গ) নাপাকির স্থান পরিষ্কারকারী হতে হবে।

ঘ) বস্তুটি হাড্ডি বা গোবর হতে পারবে না। সালমান আল ফারেসী রাযি. বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পেশাব-পায়খানার সময় আমাদের কেবলার দিকে মুখ করতে নিষেধ করেছেন। ডান হাত দিয়ে ইস্তেন্জা করতে নিষেধ করেছেন। অথবা তিনটি পাথরের কম দিয়ে ঢিলা-কুলুকরে কাজ সারতে নিষেধ করেছেন। আর হাড্ডি বা গোবর দিয়ে ঢিলা-কুলুকের কাজ করতে নিষেধ করেছেন।'(বর্ণনায় মুসলিম)

ঙ) বস্তুটি সম্মানিত বস্তু হতে পারবে না। যেমন খাদ্যদ্রব্য অথবা কাগজ যাতে কোনো সম্মানিত বিষয় লেখা আছে।



হাড্ডি দিয়ে ঢিলা-কুলুকের কাজ করা



খাদ্যদ্রব্য দিয়ে ঢিলা-কুলুকের কাজ করা



সম্মানজনক কাগজ দিয়ে ঢিলা-কুলুকের কাজ করা

আর যা দিয়ে ঢিলা-কুলুকের কাজ করা জায়েয তা হলো, পবিত্র মাটির চাকা বা পাথর, টিস্যু পেপার, কাপড়ের টুকরা।





কাপড়ের টুকরা দিয়ে ঢিলা-কুলুকের কাজ করা



টিস্যু পেপার দিয়ে ঢিলা-কুলুকের কাজ করা



পাথর দিয়ে ঢিলা-কুলুকের কাজ করা



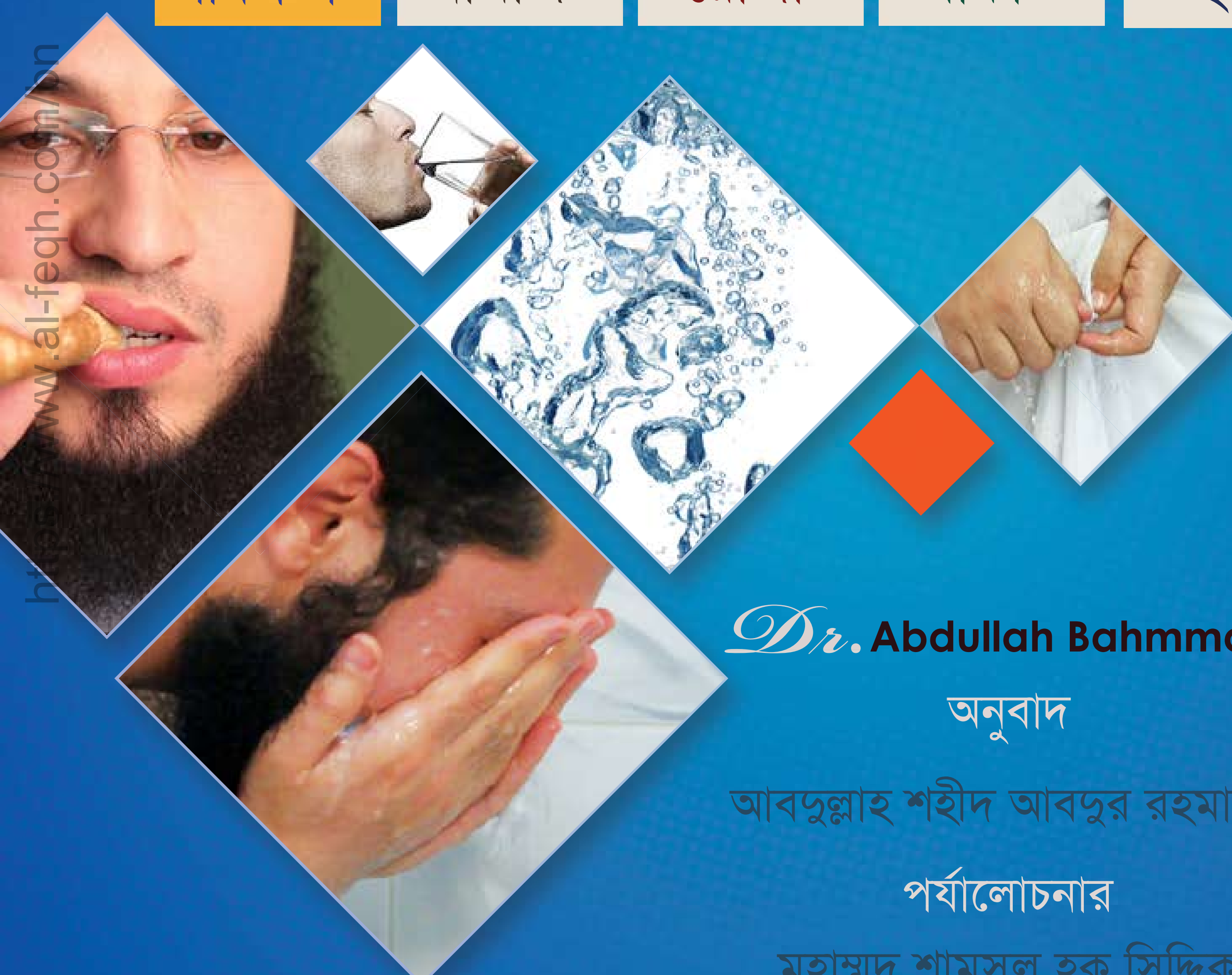
ডান হাত দিয়ে ইস্তেন্জা করা

ডান হাত দিয়ে ইস্তেন্জা করা জায়েয নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'পেশাব করার সময় তোমাদের কেউ কখনো ডান হাত দিয়ে লজ্জাস্থান ধরবে না আর টয়লেট সেরে ডান হাত দিয়ে ইস্তেন্জা করবে না।'(বর্ণনায় মুসলিম)

আলোকচিত্রে ইবাদত

সহজ সরল উপয়ে ইসলামের বিধি-বিধান শেখা

পবিত্রতা | নামাজ | রোজা | যাকাত | হজ্ব



Dr. Abdullah Bahmmam

অনুবাদ

আবদুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান

পর্যালোচনার

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

মেসওয়াক ও স্বভাবজাত সুন্নতসমূহ

৬ স্বভাবজাত সুন্নতসমূহ

সূচীপত্র

স্বভাবজাত সুন্নতসমূহ

যেসকল প্রকৃতিগত স্বভাব দিয়ে আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তা হলো নিম্নরূপ:

আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'দশটি বিষয় হলো মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাব: গোঁফ কর্তন করা, দাড়ি বড় হতে দেয়া বা ছেড়ে দেয়া, মেসওয়াক করা, নাকের ভিতর শ্বাসের সাথে পানি নেয়া, নখ কাটা, আঙ্গুলের গিরা ধৌত করা, বগলের পশম উপড়ানো, নাভির নিম্নদেশে ক্ষৌরকর্ম, পায়খানা বা পেশাবের পর পানি ব্যবহার করা ও কুলি করা।'(বর্ণনায় মুসলিম)

১- মেসওয়াক করা

মেসওয়াক

গাছের ডাল-শিকড় ইত্যাদি যা মুখের খাদ্যকণা ও দুর্গন্ধ দূর করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

মেসওয়াক করা সবসময় সুন্নত, কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মেসওয়াক হলো মুখের পবিত্রতা ও প্রতিপালকের সন্তুষ্টি।'(বর্ণনায় মুসলিম)

তবে নিম্নোক্ত সময়গুলোয় মেসওয়াক করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ:

১- অজু ও নামাজের সময়

কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,'যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর না হত তাহলে প্রত্যেক অজুর সময় আমি তাদের মেসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।'(বর্ণনায় মুসলিম)

তিনি আরো বলেছেন,'যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর না হত তাহলে প্রত্যেক নামাজের সময় আমি তাদের মেসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।'(বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

২- ঘরে প্রবেশের সময়

মিকদাম তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'আমি আয়েশা রাযি. কে প্রশ্ন করলাম, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ঘরে প্রবেশ করতেন তখন প্রথম কি কাজ করতেন? তিনি বললেন, 'মেসওয়াক করতেন।'(বর্ণনায় মুসলিম)

৩- ঘুম থেকে জাগার পর মেসওয়াক করা

হুযাইফা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন রাতে জাগ্রত হতেন তখন মেসওয়াক দিয়ে মুখ পরিষ্কার করতেন।'(বর্ণনায় বুখারী)

৪- আল কুরআন তেলাওয়াতের সময় মেসওয়াক করা

আলী রাযি. থেকে বর্ণিত যে, তিনি মেসওয়াক করতে নির্দেশ দিয়েছেন আর বলেছেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'মানুষ যখন মেসওয়াক করে, অতঃপর সালাতে দাঁড়ায় তখন ফেরেশতাগণ তার তেলাওয়াত শোনার জন্য তার পিছনে দাঁড়ায়। তাঁরা তার কাছে চলে আসে। এমনিভাবে তাঁদের মুখ তার মুখের কাছে রাখে। তার মুখ থেকে কুরআনের যা কিছু বের হয় তা ফেরেশতাদের মুখে যায়। অতএব তোমরা আল কুরআনের জন্য নিজেদের মুখ পরিষ্কার করো।'(বর্ণনায় বাযযার)

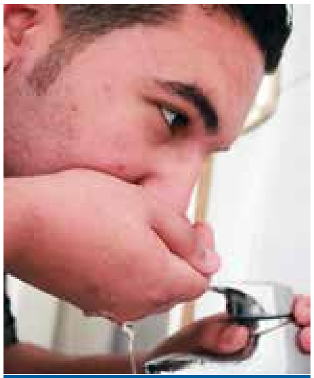


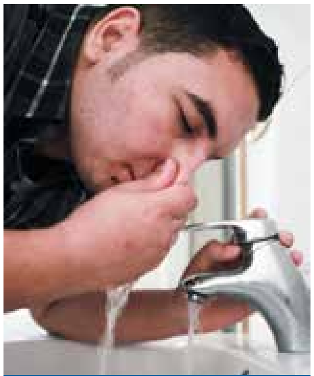
> ### মেসওয়াকের উপকারিতা
> মেসওয়াক দুনিয়াতে মুখের পরিচ্ছন্নতা আর আখেরাতে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি। এটি দাঁতকে মজবুত করে। মাড়িকে শক্ত রাখে। কণ্ঠস্বরকে পরিষ্কার করে আর মানুষকে উদ্যমী করে।

২- কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া

কুলি করা
মুখের মধ্যে পানি প্রবেশ করিয়ে নাড়াচাড়া করা

নাকে পানি দেয়া
শ্বাসের মাধ্যমে নাকের মধ্যে পানি টেনে নেয়া


কুলি করা


নাকে পানি দেয়া

৩- ইস্তেনজা

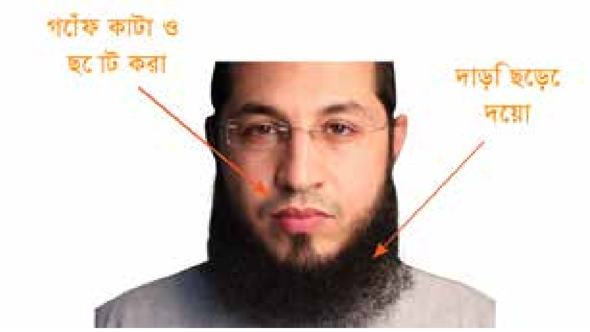
ইস্তেনজা
ইস্তেন্জা হলো মলদ্বার ও লজ্জাস্থান থেকে নির্গত ময়লার প্রভাব পবিত্র পানি দ্বারা পরিষ্কার করা।

৪- গোঁফ কাটা ও ছোট করা

অধিক ছোট করা বাঞ্ছনীয়; কারণ এতে রয়েছে সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্নতা ও কাফেরদের বিরোধীতা।

৫- দাড়ি ছেড়ে দেয়া

আর তা হলো দাড়ি কর্তন না করা এবং দাড়ির পিছনে না লাগা।



> **দাড়ি মুন্ডানো**
>
> দাঁড়ি মুণ্ডানো নিষিদ্ধ। এ ব্যাপারে হাদীসে স্পষ্ট নির্দেশনা এসেছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘‘গোঁফ কেটে ছোট করো আর দাড়ি ছেড়ে দাও, (অগ্নিপূজকদের বিরোধিতা করো।’(বর্ণনায় মুসলিম

৬- নাভির নীচে ক্ষৌরকর্ম করা

নাভির নীচে ক্ষৌরকর্ম করা

লজ্জাস্থানের পার্শ্ববর্তী কেশ মুণ্ডানো

> **নাভির নীচে ক্ষৌরকর্মের উপকারিতা**
>
> বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত যে, নাভির নীচের কেশ পরিষ্কার করা স্বাস্থ্য, শরীরের শক্তি ও সুরক্ষার কারণ। এ অঞ্চলে কেশের আধিক্য বিভিন্ন রকম চর্মরোগ সৃষ্টির কারণ হিসাবে ভূমিকা রাখে।

৭- খতনা ও খিফায

পুরুষাঙ্গের খতনা

যে চামড়া পুরষাঙ্গের মাথা ঢেকে রাখে তা অপসারণ করা।

মেয়েদের খিফায

লজ্জাস্থানের যেজায়গা দিয়ে পুরুষাঙ্গ প্রবেশ করে তার উপরের অতিরিক্ত মাংশ কেটে ফেলা

খতনা পুরুষের জন্য আর খিফায মেয়েদের জন্য। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে আতিয়া রাযি. কে বলেছেন, ‘খিফায করো, তবে বেশি কেটোনা। কেননা তা সৌন্দর্যবর্ধক ও পুরষের কাছে অধিক সম্মানিত হওয়ার কারণ।’(বর্ণনায় হাকেম)

কিন্তু পুরুষদের জন্য খতনা ওয়াজিব আর নারীদের জন্য সুন্নত।

খতনা করার হিকমত হলো পুরুষাঙ্গের মাথায় চামড়া থাকার কারণে যে ময়লা জমে তা থেকে পুরুষাঙ্গ পরিষ্কার রাখা। আর নারীদের ক্ষেত্রে খিফাযের হেকমত হলো সৌন্দর্য বৃদ্ধি।

৮- নখ কাটা

অর্থাৎ নখ কেটে ফেলা এবং তা এমনভাবে ছেড়ে না দেয়া যে তা লম্বা হয়ে যায়।



নখ কাটা

৯- বগলের কেশ উপড়ে ফেলা

অর্থ্যাৎ বগলে উদিত কেশ দূর করা। এতে পরিচ্ছন্নতার বাধা দূর হবে আর কেশ থাকার কারণে যে দুর্গন্ধ হয় তা চলে যাবে।



বগলের কেশ উপড়ে ফেলা

চল্লিশদিন

চল্লিশদিনের বেশি নখ, বগল, নাভির নিম্নাংশ ও গোঁফ পরিষ্কার না করা মাকরূহ। আনাস ইবনে মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোঁফ কাটা, নখ কাটা, নাভির নিচের কেশ মুণ্ডানো, বগলের কেশ মুণ্ডানোর জন্য আমাদের সময় বেঁধে দিয়েছেন। আমরা যেন চল্লিশদিনের বেশি এগুলো ছেড়ে না রাখি।'(বর্ণনায় তিরমিযী

১০- আঙ্গুলের পৃষ্ঠদেশের গিরাসমূহ ধৌত করা

অনেক আলেম উল্লিখিত বিষয়গুলোর সাথে কান, ঘাড় ও শরীরের অন্যান্য ময়লা দূর করার বিষয়টি যোগ করেছেন।



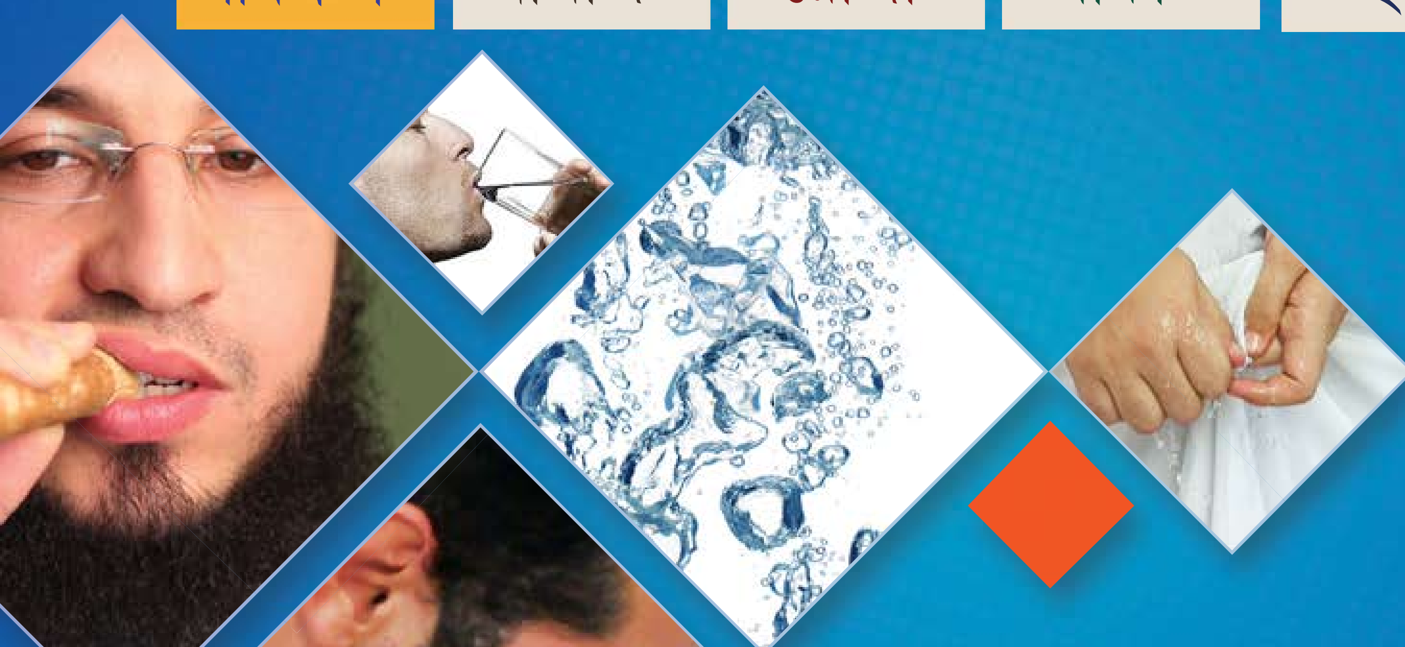
আঙ্গুলের গিরা



আলোকচিত্রে ইবাদত

সহজ সরল উপয়ে ইসলামের বিধি-বিধান শেখা

পবিত্রতা | নামাজ | রোজা | যাকাত | হজ্ব





Dr. Abdullah Bahmmam

অনুবাদ

আবদুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান

পর্যালোচনার

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

অজু করার নিয়ম ও অজুর মাসায়েল

৭ অজু করা

আভিধানিক অর্থে অজু
সৌন্দর্য ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

শরীয়তের পরিভাষায় অজু
পবিত্রতা অর্জনের নিয়তে নির্দিষ্ট অঙ্গসমূহে পানি ব্যবহার করা

অজুর হুকুম

অজু করা হয়ত ফরজ অথবা মুস্তাহাব

ক) তিন কারণে অজু ফরজ হয়ে থাকে

১- নামাজ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِ﴾

{হে মুমিনগণ, যখন তোমরা সালাতে দন্ডায়মান হতে চাও, তখন তোমাদের মুখ ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর, মাথা মাসেহ কর এবং টাখনু পর্যন্ত পা (ধৌত কর)।} [সূরা আল-মায়েদা : ৬]



সালাতের জন্য অজু

২- কাবাঘরের তাওয়াফ

কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঋতুবতী মহিলাকে বলেছেন,

'তুমি পবিত্র হওয়ার আগে তাওয়াফ করবে না।'(বর্ণনায় বুখারী)

সূচীপত্র



তাওয়াফের জন্য অজু

৩- আল-কুরআন স্পর্শ করা

কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন,﴿لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلۡمُطَهَّرُونَ﴾
{পবিত্রগণ ব্যতীত কেউ তা স্পর্শ করে না।} [[আল ওয়াকিয়া: ৭৯]]



কুরআন স্পর্শ করার জন্য অজু

ক) উল্লিখিত সময় ছাড়া অন্যসময়ে অজু করা মুস্তাহাব

এর দলিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস,'ঈমানদার ব্যক্তিই কেবল অজুর হেফাজত করে।' (বর্ণনায় আহমাদ) সে হিসেবে নিম্নবর্ণিত জায়গাসমূহে অজু করা তাগিদসহ মুস্তাহাব:

প্রত্যেক নামাজের সময় অজু নবায়ন করা। আল্লাহ তাআলার যিকির ও দুআর সময়, কুরআন তেলাওয়াতের সময়, নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে, গোসল করার পূর্বে অজু করা গুরত্বপূর্ণভাবে মুস্তাহাব। মৃত ব্যক্তিকে বহন করার পর ও প্রতিবার অজু ভঙ্গের পর অজু করা মুস্তাহাব, যদিও তখন নামাজ আদায়ের ইচ্ছা না থাকে।

অজুর ফজিলতসমূহ

১- অজু আল্লাহর ভালোবাসার কারণ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ﴾

{নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারীদের ভালবাসেন এবং ভালবাসেন অধিক পবিত্রতা অর্জনকারীদের।} [সূরা আল বাকারা : ২২২]

২- অজু উম্মতে মুহাম্মাদীর আলামত; যেহেতু তারা কেয়ামতের দিবসে উজ্বল অঙ্গ নিয়ে উপস্থিত হবে

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'কেয়ামতের দিন আমার উম্মত অজুর অঙ্গগুলো উজ্জ্বল ঝলমলে অবস্থা নিয়ে উপস্থিত হবে। কাজেই তোমাদের যে এগুলো দীর্ঘ করতে চায় সে যেন তা করে নেয়।'(বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম।)





আল্লাহর যিকিরের জন্য অজু



ঘুমানোর সময় অজু



কুরআন তেলাওয়াতের জন্য অজু



মৃত ব্যক্তিকে বহন করার জন্য অজু

৩- অজু গুনাহ ও পাপ মিটিয়ে দেয়।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে অজু করে এবং সুন্দরভাবে অজু করে তার শরীর থেকে পাপসমূহ বের হয়ে যায়। এমনকি নখের নীচ থেকেও বের হয়ে যায়।' (বর্ণনায় মুসলিম।)

৪- মর্যাদা বেড়ে যাওয়া

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমি কি তোমাদের এমন বিষয় সম্পর্কে খবর দেব না যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা গুনাহ মিটিয়ে দেন ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেন? তারা বললেন, অবশ্যই বলবেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, 'কষ্ট সত্ত্বেও অজু পূর্ণভাবে করা, মসজিদের দিকে বার বার পদচালনা করা, সালাতের পর সালাতের জন্য অপেক্ষা করা। এটা হলো রিবাত।'(বর্ণনায় মুসলিম।)

অজুর পদ্ধতি

১. অন্তরে অজুর নিয়ত করা।

২. বিসমিল্লাহ বলা।

৩. হাতের দু'কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা (তিনবার)।

৪. মেসওয়াক করা: এর সময় হলো কুলি করার মুহূর্তে।

৫. কুলি করা, নাকে পানি দেয়া, নাক ঝাড়া (তিনবার)।

কুলি করা অর্থ : মুখের মধ্যে পানি প্রবেশ করিয়ে নাড়াচাড়া করা



.নাকে পানি দেয়া অর্থ: নিশ্বাসের সাথে নাকের মধ্যে পানি টেনে নেয়া।

৭. নাক ঝাড়া অর্থ: নাকের ভিতর থেকে পানি বের করা।

৮. মুখমন্ডল ধৌত করা (তিনবার) দাড়ি খেলাল করাসহ।

৯. আঙ্গুলের মাথা থেকে কনুই পর্যন্ত ডান হাত তিনবার ধৌত করা। অতঃপর একইরূপে বাম হাত ধৌত করা।

১০. মাথা মাসেহ করা: আর তার পদ্ধতি হলো প্রথমে হাত পানি দিয়ে ভিজিয়ে নেয়া। এরপর মাথার সামনের দিক থেকে পিছনের দিকে চুলের শেষ সীমানা পর্যন্ত হাত বুলানো। এরপর পেছনের দিক থেকে সামনের দিকে হাত ফিরিয়ে আনা (একবার)।

১১. তর্জনী অঙ্গুলি দিয়ে কানের ভিতরে মাসেহ করা আর বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে কানের বাহিরের অংশ মাসেহ করা (একবার)।

১২. ডান পা টাখনু পর্যন্ত ধৌত করা (তিনবার) অতঃপর একইরূপে বাম পা ধৌত করা ।

১৩. অজু শেষ করার পর এই দুআ পাঠ করা :

أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ، وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ سُبْحَانَكَ اللهمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

(অর্থ) 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। তিনি এক, তার কোনো শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ, আপনি আমাকে তাওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমাকে পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। হে আল্লাহ, আপনার প্রশংসাসহ আপনার মহত্ব বর্ণনা করছি। সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি আর তাওবা করছি আপনার কাছে।' (বর্ণনায় নাসায়ী)





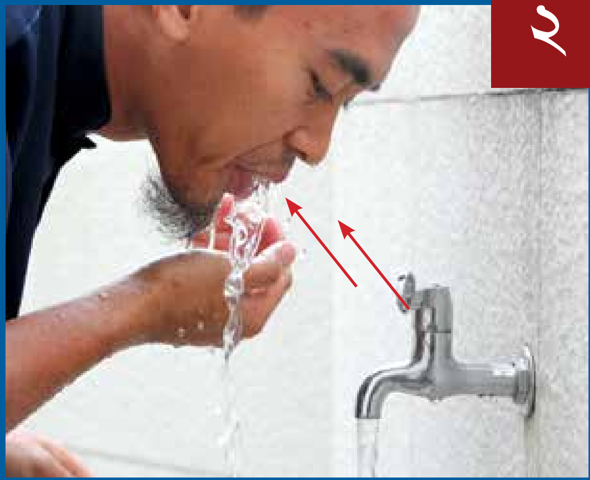
অজুর পদ্ধতি

১



হাতের দু'কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা
(তিনবার)

২



কুলি করা (তিনবার)

৩



নাকে পানি দেয়া
(তিনবার)

৪



নাক ঝাড়া
(তিনবার)

৫



মুখমন্ডল ধৌত করা

৬



দাড়ি খেলাল করা

৭



আঙ্গুলের মাথা থেকে কনুই পর্যন্ত ডান হাত তিনবার ধৌত করা। অতঃপর একইরূপে বাম হাত ধৌত করা

৮



মাথা মাসেহ করা

৯



তর্জনী অঙ্গুলি দিয়ে কানের ভিতরে মাসেহ করা আর বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে কানের বাহিরের অংশ মাসেহ করা (একবার)

১০



ডান পা টাখনু পর্যন্ত ধৌত করা (তিনবার) অতঃপর একইরূপে বাম পা ধৌত করা

অজুর শর্তাবলী

১- পানি পবিত্র হতে হবে।

২- পানি বৈধ হতে হবে। উদাহরণত কেউ যদি চুরি করা পানি দিয়ে অজু করে তবে তার অজু হবে না।

৩- যা কিছু ত্বকে পানি পেছাতে বাধা দেয় তা অজুর পূর্বে অপসারণ করে নিতে হবে, যেমন চর্বি ইত্যাদি।

অজুর ফরজসমূহ

১- মুখমন্ডল ধৌত করা।

২- দু'হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করা।

৩- দু'পা টাখনুসহ ধৌত করা।

৪- মাথা মাসেহ করা।

হানাফী মাযহাবে স্বীকৃত এ সকল ফরজের সাথে ইমামদের কেউ কেউ আরো কয়েকটি ফরজ যোগ করেছেন। আর তা হলো:

৫- নিয়ত করা: নিয়তের স্থান হলো অন্তর। নিয়ত মুখে উচ্চারণ করার বিষয় নয়। অজুর নিয়ত ব্যতীত কেউ যদি শীতলতা অর্জন অথবা পরিচ্ছন্নতা অর্জনের জন্য অজুর অঙ্গগুলো ধৌত করে তাহলে তা অজু বলে গণ্য হবে না।

৬- অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গগুলো ধৌত করার সময় ক্রম বজায় রাখা।

৭- অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গগুলো ধৌত করতে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা, ধৌত করতে এতটা দেরি না করা যে আগের ধোয়া অঙ্গটি শুকিয়ে যায়।

অজুর সুন্নতসমূহ

১- অজুর শুরুতে দু'হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করা

২- মেসওয়াক করা।

৩- মাথা ও কান বাদে প্রত্যেকটি অঙ্গ তিনবার ধৌত করা। মাথা কেবল একবার মাসেহ করা।

৪- ডান দিক অনুসরণ: অর্থাৎ অঙ্গগুলো ধৌত করার সময় ডানের অঙ্গ দিয়ে শুরু করা।

৫- উজ্জ্বলতা দীর্ঘ করা: অর্থাৎ হাত ধৌত করার সময় কনুই ছাড়িয়ে আরো একটু ধৌত করা।

৬- হাত ও পায়ের আঙ্গুলসমূহের মধ্যবর্তী স্থানগুলো মাসেহ করা।

৭- যেসকল অঙ্গ ধৌত করতে হয় তা হাত বুলিয়ে ধৌত করা। পানি ছিটিয়ে দেয়া যথেষ্ট নয়।

৮- পানি ব্যবহারে মিতব্যয়ী হওয়া; নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'এ উম্মতের মধ্যে এমন এক সম্প্রদায় হবে যারা পবিত্রতা অর্জনে সীমালঙ্গন করবে। (বর্ণনায় আবু দাউদ।)(অর্থাৎ অজুর সময় পানি অপচয় করবে।)



হাতে চর্বি থাকাবস্থায় অজু



মেসওয়াক করা



দু'হাতের আঙ্গুলসমূহ খিলাল করা



উজ্জ্বলতা দীর্ঘ করা

অজুর পর দুআ পাঠ করা : নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের যে কেউ সুন্দর করে পরিপূর্ণভাবে অজু করবে অতঃপর বলবে,

أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ.

(অর্থ) ('আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। তিনি এক, তার কোনো শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তার বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ, আপনি আমাকে তাওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন।'তাহলে তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হবে। যেকোনো দরজা দিয়ে ইচ্ছা করবে প্রবেশ করতে পারবে।)(বর্ণনায় তিরমিযী)

৯- অজুর পর দু'রাকাআত নামাজ আদায় করা। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার এ অজুর মত করে অজু করবে এরপর এমনভাবে দু'রাকাআত নামাজ আদায় করবে যাতে অন্যকোনো চিন্ত-কল্পনা ছিল না, তাহলে তার অতীতের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।' (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম।)

অজু ভঙ্গের কারণসমূহ

১- মলদার ও লজ্জাস্থান থেকে যা কিছু বের হয়, যেমন পেশাব, পায়খানা, বায়ু ইত্যাদি অজু ভঙ্গের কারণ। কেননা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'অজু ভঙ্গ হওয়ার কারণ ঘটে যাওয়ার পর অজু করার পূর্বে তোমাদের কারো নামাজ আল্লাহ কবুল করেন না।'

২- গভীর ঘুম, যাতে অনুভূতি থাকে না। বেহুশ হওয়া, পূর্ণ মাতাল হওয়া ইত্যাদির হুকুমও গভীর ঘুমের হুকুমের মতোই।

৩- মুখ ভরে বমি করা। কারণ আবু দারদা রাযি. এর এক বর্ণনা অনুযায়ী, 'নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বমি করলেন অতঃপর রোজা ভঙ্গ করলেন, এবং অজু করলেন।' (বর্ণনায় তিরমিযী)

৪- বয়স্ক জাগ্রত ব্যক্তি রুকু সিজদাবিশিষ্ট নামাজে নামাজরত অবস্থায় যদি অট্টহাসি হাসে তাহলে অজু ও নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অট্ট হাসি হেসেছে সে যেন অজু ও নামাজ আবার আদায় করে নেয়। (বর্ণনায় দারা কুতনী)

৫- প্রবাহমান রক্ত। এর প্রমাণ হলো 'আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাযি. এর নাক থেকে যখন রক্ত পড়ত, তখন তিনি ফিরে এসে অজু করে নিতেন অতঃপর নামাজ পূর্ণ করতেন,এর মাঝে কোনো কথা বলতেন না।' (ইমাম মালেক রহ. তার মুয়াত্তা কিতাবে বিশুদ্ধ সুত্রে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)



উটের গোশত খাওয়া



গভীর নিদ্রা

মাসায়েল

১- যখন কোনো মুসলিম নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়ে অজু করতে চায় তখন যেন সে তার হাত পানির পাত্রে ঢুকিয়ে না দেয়। বরং তিনবার হাত ধুয়ে নেয়ার পর হাত ঢুকাবে। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ নিদ্রা থেকে জাগ্রত হলে সে যেন তিনবার হাত ধৌত করার আগে তার হাত পাত্রের মধ্যে না ঢুকায়। কেননা সে জানে না তার হাত কোথায় রাত কাটিয়েছে।'

২- অজুতে যেসকল অঙ্গ ধৌত করা জরুরি তার প্রত্যেকটিতে ভালোমতো পানি পেছাতে হবে। বিশেষ করে হাত ও পায়ের আঙ্গুলের ফাঁকে, দাড়ির ও কানের মধ্যবর্তী জায়গায়। এমনিভাবে দুই কনুই ও পায়ের গোড়ালিতে। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'পায়ের গোড়ালির জন্য জাহান্নামের আগুনের হুমকি রয়েছে।'

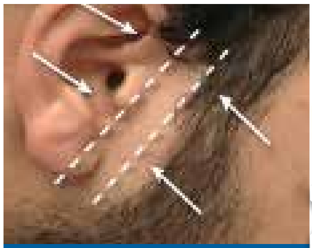
৩- ইয়াকীন বা দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তি হলো প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে মৌলিক গুরুত্বের ব্যাপার। সে হিসেবে যদি তাহারাত বা পবিত্রতা অর্জনের কথা দৃঢ়ভাবে মনে থাকার পর অজু ভেঙ্গে গেছে বলে সন্দেহ হয়, তাহলে দৃঢ় বিশ্বাসের ওপর স্থিত বিষয়টিকেই প্রাধান্য দিতে হবে। আর সেটা হলো তাহারাত। আর যদি তাহারাত অর্জন করেনি মর্মে দৃঢ় বিশ্বাস থাকে আর অজু করেছে বলে সন্দেহ হয় তাহলে তাহারাত অর্জন না করার বিষয়টিই প্রাধান্য পাবে।

৪- যদি কোনো মুসলিম এমনভাবে অজু করে যে, কোনো অঙ্গ একবার আবার কোনোটি দু'বার আবার কোনোটি তিনবার ধৌত করে তাহলেও অজু শুদ্ধ হবে।

৫- যে ব্যক্তি ভুলে অজু ব্যতীত নামাজ আদায় করেছে, সে তা স্মরণ করামাত্র নামাজ আবার পড়ে নেবে।

৬- অজু করার পর যদি কোনো নাপাকি লেগে যায়, তাহলে নাপাকি দূর করে নেবে। অজু করতে হবে না। কারণ নাপাকি লেগে যাওয়াটা অজু ভঙ্গের কারণ নয়।





দাড়ি ও কানের মধ্যবর্তী স্থান



নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়ার পর পাত্রে হাত ধোয়া



দু'পায়ের আঙ্গুল খেলাল করা



পায়ের গোড়ালি



অজু ও সাধারণ স্বাস্থ্য

জাতিসংঘ কর্তৃক প্রকাশিত সোর্স মাগ্যাজিনে প্রকাশিত হয়েছে যে, নিয়মিত গোসল ও ইসলামি সমাজে নামাজের জন্য অজু টেরাকোমা রোগ থেকে সুরক্ষা পেতে সাহায্য করে। এ রোগটি তৃতীয় বিশ্বে অন্ধত্বের কারণ হিসাবে ধরা হয়ে থাকে। বিশ্বের প্রায় ৫০০ মিলিয়ন মানুষ এ রোগে আক্রান্ত। যদি তারা নামাজপূর্ব পরিচ্ছন্নতা অর্জনের পদ্ধতি অনুসরণ করে তাহলে এ রোগ থেকে নিরাপদ থাকা যায়। দেখা গেছে ইসলামি সমাজে এ রোগটির প্রাদুর্ভাব কম। বরং নেই বললেই চলে।(আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে তিব্বে নববী'গিয়াস ('আল-আহমাদ

যা উচিত নয়

১- অজুর সময় মুখে নিয়ত উচ্চারণ করা।



পানি ব্যবহারে অপচয়

২- পানি অপচয় করা।

৩- অজুতে তিনবারের বেশি ধৌত করা। কারণ হাদীসে এসেছে, 'এক বেদুইন ব্যক্তি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অজু সম্পর্কে প্রশ্ন করল। তিনি তাকে তিনবার তিনবার করে ধৌত করে অজু দেখালেন। এরপর বললেন, অজু এরকমই। যে ব্যক্তি এর চেয়ে বাড়াবে সে খারাপ করল, সীমা লংঘন করল ও জুলুম করল।' (বর্ণনায় আবু দাউদ।)

কিন্তু যদি অঙ্গটি তিনবার ধৌত করার পর পরিষ্কার না হয় তাহলে তিনবারের বেশি ধৌত করা জায়েয হবে। যেমন হাতে চর্বি ইত্যাদি লেগে থাকার ক্ষেত্রে।

অজু পূর্ণ না করার মধ্যে যা গণ্য

ক - পায়ের গোড়ালি ধৌত না করা।

খ- কনুই ধৌত না করা; জামার হাতা সংকীর্ণ হওয়ার কারণে।

গ- কান ও দাড়ির মধ্যবর্তী অংশ ধৌত না করা।

ঘ- বাম হাত ধৌত করার সময় বাম হাতের কব্জি না ধোয়া।

ঙ- শরীরে চর্বি জাতীয় পদার্থ থাকাবস্থায় অজু করা।

চ- আঙ্গুলে নেইল পালিশ থাকাবস্থায় মহিলাদের অজু করা, যা পানি পেছাতে বাধা দেয়।

ছ- স্বাভাবিকভাবে পানি না পৌঁছা সত্ত্বেও পায়ের আঙ্গুলগুলো খেলাল না করা।

৫- ঘাড় মাসেহ করা:

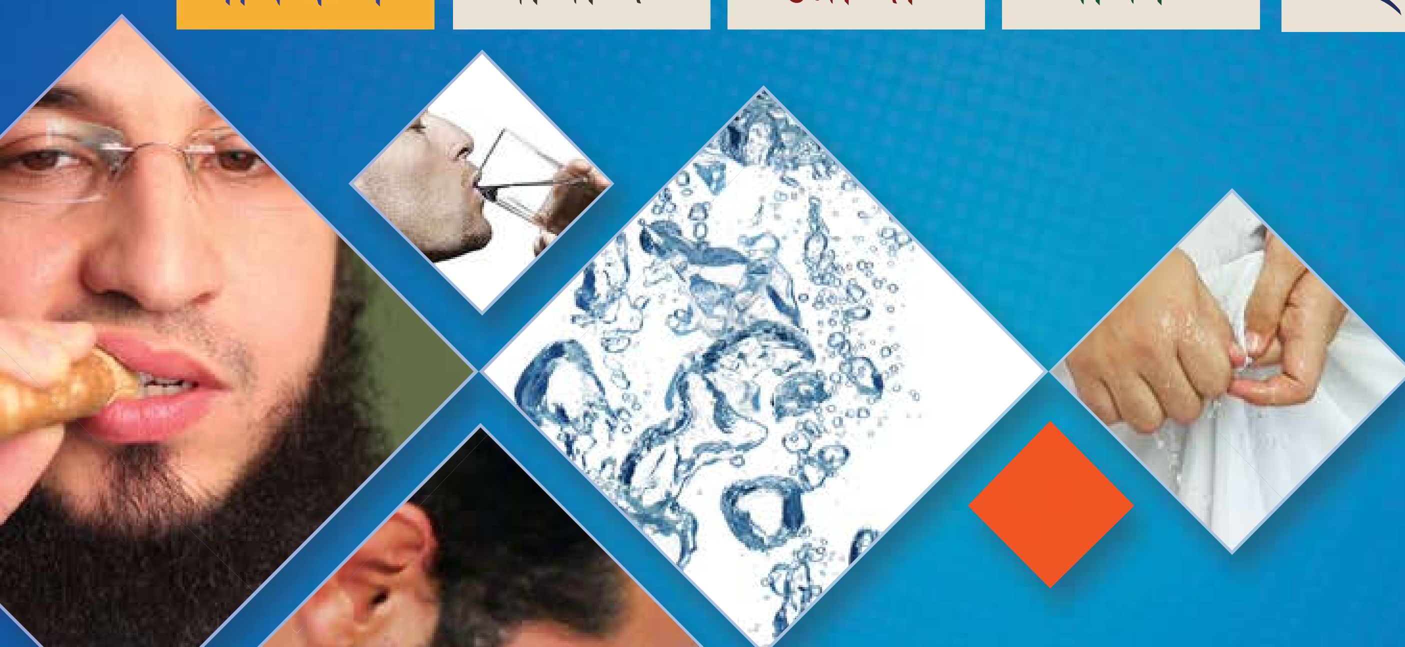
এটা অজুর কোনো বিষয় নয়। যদি তা মাসেহ করা কোনো কারণে প্রয়োজন হয় তাহলে তা অজুর আগে বা পরে করা যেতে পারে।



আলোকচিত্রে ইবাদত

সহজ সরল উপয়ে ইসলামের বিধি-বিধান শেখা

পবিত্রতা | নামাজ | রোজা | যাকাত | হজ্ব





Dr. Abdullah Bahmmam

অনুবাদ

আবদুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান

পর্যালোচনার

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

মোজা, ব্যান্ডেজ ও পট্টির ওপর মাসেহ করার বিধি-বিধান

৮

চামড়ার মোজা, কাপড়ের মোজা, প্লাস্টার, ব্যান্ডেজ, পট্টির ওপর মাসেহ করা



সূচীপত্র

আল-খুফ বা মোজা

চামড়া দ্বারা তৈরি মোজা যা পায়ে পরা হয়।

আল জাওরাব

কাপড় ইত্যাদি দ্বারা তৈরি মোজা যা পায়ে পরা হয়।

চামড়ার মোজা ও কাপড়ের মোজার ওপর মাসেহ করার বিধান

চামড়ার মোজা ও কাপড়ের মোজার ওপর মাসেহ করা বহু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এর একটি হলো আনাস বিন মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত। আনাস ইবনে মালেক রাযি. কে মোজার ওপর মাসেহ করা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে উত্তরে তিনি বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মোজার ওপর মাসেহ করতেন।' (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম।)

চামড়ার মোজা ও কাপড়ের মোজার ওপর মাসেহ করার শর্তাবলী

১ .পরিপূর্ণ পবিত্রতা অর্জনের পর মোজা পরিধান করা। মুগীরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। আমি তার মোজা খুলতে অগ্রসর হলাম। তিনি তখন বললেন, 'রাখো, আমি এ দুটোকে পবিত্রতাবস্থায় প্রবেশ করিয়েছি। অতঃপর তিনি এর ওপর মাসেহ করলেন।'(বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম।)

২. মোজা দু'পায়ের টাখনু পর্যন্ত ঢেকে থাকতে হবে। মোজা যদি টাখনুর নিচে হয় তাহলে মাসেহ করা জায়েয হবে না। তখন তা পা ঢেকেছে বলে ধরা হবে না।

৩. মোজা দুটো পবিত্র বস্তু দ্বারা প্রস্তুত হতে হবে। এমন পুরো হতে হবে যা জুতো ব্যতীতই পায়ে দিয়ে দীর্ঘপথ হাঁটা যায়।

৪. যা ব্যবহার করা জায়েয এমন বস্তু দ্বারা মোজা দুটো প্রস্তুত হতে হবে।

৫. নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মাসেহ করা। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসেহ করার জন্য সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। (মুকীম ব্যক্তির জন্য একদিন একরাত আর মুসাফির ব্যক্তির জন্য তিনদিন) এটা অতিক্রম করা জায়েয হবে না।

৬. ছোট অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জনকালে মোজার ওপর মাসেহ করা চলে, তবে বড় অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জনের সময় মাসেহ চলবে না। সাফওয়ান বিন আসাল রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা যখন মুসাফির অবস্থায় থাকতাম তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মোজার ওপর মাসেহ করতে নির্দেশ দিতেন। পেশাব, পায়খানা আর নিদ্রা

থেকে জাগ্রত হওয়ার পর পবিত্রতা অর্জনকালে আমরা তিনদিন পর্যন্ত মোজা খুলতাম না। তবে জানাবাত বা বড় অপবিত্রতার বিষয়টি ভিন্ন।(বর্ণনায় বুখারী।)

অর্থাৎ জানাবাতগ্রস্ত ব্যক্তি গোসল করার সময় অবশ্যই মোজা খুলে ফেলবে। তারপর আবার পরিধান করবে।



চামড়ার মোজা ও কাপড়ের মোজার ওপর মাসেহ করার পদ্ধতি

উভয় প্রকার মোজার উপরের অংশে ভেজা হাত বুলিয়ে মাসেহ করতে হবে। পায়ের আঙ্গুলের জায়গা থেকে পায়ের নলা পর্যন্ত মাসেহ করতে হবে। ডান হাত দিয়ে ডান পায়ের মোজা ও বাম হাত দিয়ে বাম পায়ের মোজার ওপর একবার মাসেহ করতে হবে।

আর মোজার নিচের অংশে মাসেহ করা হবে না, মোজার পিছনের অংশেও না। আলী রাযি. বলেন, 'যদি দীনের বিষয়গুলো মানুষের বিবেচনানির্ভর হত তাহলে মোজার নীচের অংশ মাসেহ করা অগ্রাধিকার পেত। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি, তিনি মোজার উপরিভাগ মাসেহ করেছেন।'(বর্ণনায় আবু দাউদ)



উভয় হাত দিয়ে মাসেহ করা



মোজার নিম্নদেশ মাসেহ করা



পায়ের গোড়ালি মাসেহ করা

চামড়ার মোজা ও কাপড়ের মোজার ওপর মাসেহ করার মেয়াদ

মুকীম ব্যক্তির জন্য একদিন ও একরাত আর মুসাফির ব্যক্তির জন্য তিনদিন তিনরাত। এর প্রমাণ, আলী রাযি. এর কথা,'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত নির্ধারণ করেছেন আর মুকীমের জন্য একদিন একরাত। '(বর্ণনায় নাসায়ী)



মাসেহ করার সময়সীমা যেভাবে নির্ধারণ করতে হবে

প্রথমবার অজু ভঙ্গ হওয়ার পর মাসেহ করা থেকে মেয়াদ আরম্ভ হবে। যেমন কেউ পবিত্র অবস্থায় মোজা পরল, পরে যখন অজু ভেঙ্গে গেল তখন মাসেহ করল। এই মাসেহ থেকেই একদিন একরাতের (চব্বিশ ঘন্টার) হিসাব শুরু হবে।

এর উদাহরণ, এক ব্যক্তি অজু করল ও দু'পা ধৌত করল এরপর মোজা পরিধান করল এবং ফজরের নামাজ আদায় করল। এরপর সকাল দশটায় অজু ভেঙ্গে গেল। যখন এগারটা বাজল তখন সে চাশতের নামাজের জন্য অজু করল ও মোজার ওপর মাসেহ করল। এ অবস্থায় পরের দিন সকাল এগারটা পর্যন্ত মাসেহ অব্যাহত রাখা তার জন্য অনুমোদিত। এটা হলো মুকীমদের জন্য। আর মুসাফিরের জন্য এভাবে তিনদিন তিনরাত।

মোজার ওপর মাসেহ বাতিলকারী বিষয়সমূহ

১- মাসেহ করার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া।

২- উভয় মোজা অথবা যেকোনো একটি খুলে ফেলা।

৩- বড় অপবিত্রতায় পতিত হওয়া। সাফওয়ান বিন আসাল রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা যখন মুসাফির অবস্থায় থাকতাম তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে বড় অপবিত্রতা (জানাবত) ব্যতীত (পেশাব, পায়খানা ও নিদ্রাজনিত অপবিত্রতার অবস্থায়) তিনদিন তিনরাত পর্যন্ত মোজা না খোলার নির্দেশ দিতেন।' (বর্ণনায় তিরমিযী)



মোজা খুলে ফেললে মাসেহ বাতিল হয়ে যায়



ব্যান্ডেজ, প্লাস্টার ও পট্টির ওপর মাসেহ করা

আলজাবিরা-প্লাস্টার

কাঠ বা জিপসাম যা দিয়ে ভেঙে যাওয়া অংশ বেঁধে রাখা হয়।



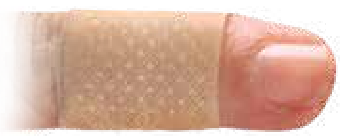
আল ইসাবাহ- ব্যান্ডেজ

কাপড় জাতীয় বস্তু যা দ্বারা পুড়ে যাওয়া বা আহত স্থান পেঁচিয়ে রাখা হয়।



আল লাসূক- পট্টি

আবরণ যা আহত স্থানে চিকিৎসার উদ্দেশে এঁটে দেয়া হয়।



জাবিরার ওপর মাসেহ জায়েয হওয়ার প্রমাণ

জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা সফরে বের হলাম। আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তির মাথায় পাথরের আঘাত লেগে মাথা ফেটে গেল। সে তার সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কি আমাকে তায়াম্মুম করতে অনুমতি দেবে?' তারা বলল, আমরা তোমার জন্য তায়াম্মুমের সুযোগ দেখছি না। তুমি তো পানি ব্যবহারের সামর্থ্য রাখো। এরপর সে গোসল করল, ফলে মৃত্যু বরণ করল। আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলাম, তাঁকে এ ব্যাপারে জানালাম। তিনি বললেন, ওরা তাকে হত্যা করে দিল। আল্লাহ তাদের হত্যা করবেন। তোমরা যখন জান না, তখন কেন প্রশ্ন করলে না? প্রশ্ন করা তো অজ্ঞদের ঔষধ। তার জন্য তো যথেষ্ট ছিল সে তায়াম্মুম করবে এবং জখমের ওপর পট্টি বেঁধে রাখবে আর তার ওপর মাসেহ করবে। এবং নিজের পুরো শরীর ধুয়ে ফেলবে।' (বর্ণনায় আবু দাউদ।)

ব্যান্ডেজ, প্লাস্টার ও পট্টির ওপর মাসেহ করার শর্তাবলী

১ - ব্যান্ডেজ অথবা পট্টির ওপর মাসেহ করার শর্ত হলো, এটা যেন যখমের স্থান ও চিকিৎসার জন্য যতটুকু প্রয়োজন তা অতিক্রম না করে।

২- ব্যান্ডেজ অথবা পট্টির ওপর মাসেহ করার জন্য পবিত্র অবস্থায় তা পরিধান করা শর্ত নয়। এমনিভাবে এর জন্য কোনো মেয়াদও নেই। বরং যতদিন প্রয়োজন ততদিন ছোট বড় নাপাকি থেকে পবিত্রতা অর্জনের সময় তার ওপর মাসেহ করা যাবে। যখন প্রয়োজন থাকবে না তখন তা খুলে ফেলতে হবে আর পবিত্রতা অর্জনের সময় অঙ্গটি ধৌত করতে হবে।

৩- পট্টি ও ব্যান্ডেজ, যা খোলা ও লাগানো সহজ, তার ব্যাপারে কয়েকটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে:

ক) যদি তা খোলা সহজ হয় এবং কোনো ক্ষতি অথবা আরোগ্য লাভ দীর্ঘায়িত হওয়ার আশঙ্কা না থাকে তবে তা খুলে ধৌত করে আবার লাগিয়ে নিতে হবে।

খ) আর যদি খোলা সহজ না হয় এবং তার নীচের অংশ ধৌত করতে যেয়ে ক্ষতি বা আরোগ্য লাভে দীর্ঘায়িত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাহলে আহত অঙ্গ ধৌত করার সময় আহত অংশে লাগানো প্লাস্টার, ব্যান্ডেজ ও পট্টির ওপর মাসেহ করতে হবে।

ব্যান্ডেজ ও পট্টির ওপর মাসেহ করার পদ্ধতি

পবিত্রতা অর্জনে ইচ্ছুক ব্যক্তি, যে অঙ্গের ওপর ব্যান্ডেজ আছে, তার আশপাশ ধৌত করবে তারপর পুরো ব্যান্ডেজ বা পট্টি মাসেহ করবে। যদি ব্যান্ডেজ বা পট্টির কোনো অংশ, ধৌত করা জরুরি নয় এমন অঙ্গ ঢেকে রাখে, তাহলে সে অংশে মাসেহ করার প্রয়োজন নেই।

এর উদাহরণ, এক ব্যক্তির পায়ে ব্যান্ডেজ বাধা হলো, যা তার পায়ের নলার কিছু অংশ ঢেকে ফেলল। এমতাবস্থায় সে শুধু তার পায়ের অংশ মাসেহ করবে, নলার অংশ মাসেহ করবে না।





ক্ষত জাআল ইসাবাহ- ব্যান্ডেজ



ব্যান্ডেজের ওপর মাসেহ করা



আল লাসূক- পট্টি

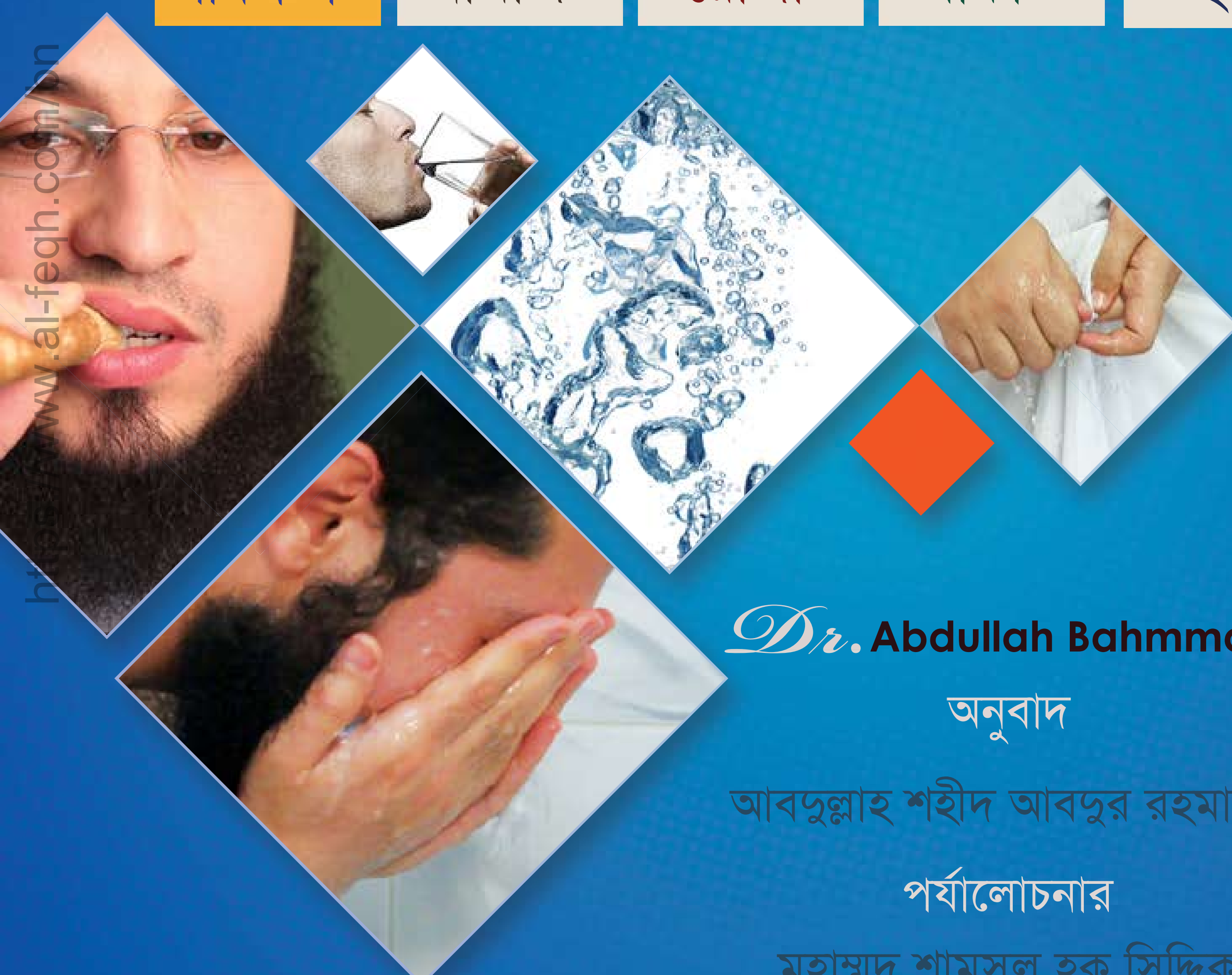


মাসেহ করার সময়সীমা যেভাবে নির্ধারণ করতে হবে

আলোকচিত্রে ইবাদত

সহজ সরল উপয়ে ইসলামের বিধি-বিধান শেখা

পবিত্রতা | নামাজ | রোজা | যাকাত | হজ্ব



Dr. Abdullah Bahmmam

অনুবাদ

আবদুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান

পর্যালোচনার

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

ইসলামে গোসল ফরজ হওয়ার কারণ ও গোসলের মাসায়েল

গোসল



সূচীপত্র

গোসলের আভিধানিক অর্থ

কোনো কিছুর ওপর পানি পূর্ণাঙ্গরূপে বাইয়ে দেয়া।

শরয়ী পরিভাষায় গোসলের অর্থ

আল্লাহ তাআলার ইবাদতের উদ্দেশে সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গরূপে শরীর ধৌত করা।

গোসল ফরজ হওয়ার কারণসমূহ

১-বীর্যপাত

বীর্য হলো: গাড়-সাদা পানি যা যৌন-উত্তেজনাসহ ঠিকরে বের হয়, যারপর শরীর অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। বীর্য গন্ধে অনেকটা পঁচা ডিমের মতো। ইরশাদ হয়েছে : ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾(আর যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তবে ভালোভাবে পবিত্র হও) [সূরা আল মায়েদা:৬] আলী রাযি. বলেছেন, 'তুমি যদি সজোরে পানি নির্গত করো, তবে গোসল করো।' (বর্ণনায় আবু দাউদ)

মাসায়েল

১- যদি কারো স্বপ্নদোষ হয় আর বীর্যপাত না ঘটে, তবে গোসল ফরজ হবে না। যদি ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর বীর্যপাত ঘটে তবে গোসল ফরজ হবে।

২- কেউ যদি বীর্য দেখতে পায় আর স্বপ্নদোষের কথা মনে না থাকে, তবে গোসল ফরজ হবে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,'পানি তো পানির জন্য'(বর্ণনায় মুসলিম) অর্থাৎ বীর্যপাত হলে গোসল ফরজ হবে'।

৩- যদি পুরষাঙ্গে বীর্যের স্থানান্তর অনুভূত হয়, আর বীর্য বের না হয় তবে গোসল ফরজ হবে না।

৪- যদি কারো অসুস্থতার কারণে উত্তেজনা ব্যতীত বীর্যপাত ঘটে তবে গোসল ফরজ হবে না।

৫- যদি গোসল ফরজ হওয়ার পর গোসল করে নেয় এবং গোসলের পর বীর্য বের হয়, তাহলে পুনরায় গোসল করতে হবে না। কেননা এ সময় সাধারণত উত্তেজনা ব্যতীত বীর্য নির্গত হয়। এ অবস্থায় সতর্কতার জন্য অজু করে নেয়াই যথেষ্ট হবে।

৬- যদি ঘুম থেকে জাগার পর আদ্রতা দেখা যায়, এবং কারণ মনে না থাকে, তবে এর তিন অবস্থা হতে পারে:

ক - আদ্রতা যে বীর্য থেকে নয় এ ব্যাপারে আশ্বস্ত হলে গোসল ফরজ হবে না। বরং এ আদ্রতার হুকুম হবে পেশাবের ন্যায়।

খ- বীর্য কি না এ ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হলে যাচাই করে দেখতে হবে। যদি এমন বিষয় মনে করা সম্ভব হয় যা উক্ত আদ্রতা বীর্য থেকে হওয়ার সম্ভাবনাকে পোক্ত করে দেয়, তবে তা বীর্য বলেই গণ্য হবে। আর যদি এমন বিষয় মনে করা সম্ভব হয় যা উক্ত আদ্রতা যে মযী তার সম্ভাবনাকে পোক্ত করে দেয়, তবে তা মযী বলেই গণ্য হবে।

গ - আর যদি কোনো কিছুই মনে করতে না পারা যায়, তাহলে সতর্কতার জন্য গোসল করা জরুরি।

৭- যদি বীর্য দেখা যায় কিন্তু কখন স্বপ্নদোষ হয়েছে তা মনে না থাকে, তাহলে গোসল করতে হবে এবং সর্বশেষ ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর যত নামাজ আদায় করা হয়েছে তা পুনরায় পড়তে হবে।

২–সঙ্গম ঘটলে

পুরষাঙ্গ ও যোনির সম্মিলনকে সঙ্গম বলে। আর এটা ঘটে পুরষাঙ্গের পুরো অগ্রভাগ যোনির অভ্যন্তরে প্রবেশ করার ফলে। এতটুকু হলেই সঙ্গম বলে ধরা হবে এবং বীর্যপাত না ঘটলেও গোসল ফরজ হয়ে যাবে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,‘নারী ও পুরুষের গুপ্তাঙ্গের সম্মিলন ঘটলেই গোসল ফরজ হয়ে যাবে।’(বর্ণনায় তিরমিযী)



৩ – কাফির ব্যক্তি মুসলমান হলে

এর প্রমাণ কায়েস ইবনে আসেম যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে গোসল করার নির্দেশ দেন।(বর্ণনায় আবু দাউদ)

৪ – হায়েয ও নিফাস বন্ধ হলে

আয়েশা রাযি. বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাতিমা বিনতে আবি হুবাইশ রাযি. কে বলেন, ‘হায়েয এলে নামাজ ছেড়ে দাও, আর হায়েয চলে গেলে গোসল করো ও নামাজ পড়ো।’ নিফাস হলো হায়েয এর মতো, এ ব্যাপারে কারো দ্বীমত নেই।(বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

৫ – মৃত্যু ঘটলে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা যায়নাব রাযি. এর মৃত্যুর পর তিনি বলেছেন, ‘তাকে তিনবার গোসল দাও, অথবা পাঁচবার অথবা তারও বেশি যদি তোমরা ভালো মনে করো।’(বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

গোসলের বিবরণ

গোসলের ক্ষেত্রে ফরজ হলো গোসলের নিয়তে সমস্ত শরীর পানি দিয়ে ধোয়া। তা যেভাবেই হোক না কেন। তবে মুস্তাহাব হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোসলের অনুসরণ করা। উম্মুল মুমিনীন মায়মুনা রাযি. বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাবত থেকে গোসলের জন্য পানি রাখলেন। অতঃপর তিনি ডান হাত দিয়ে বাম হাতে দুই অথবা তিনবার পানি ঢাললেন। এরপর তিনি তাঁর গুপ্তাঙ্গ ধৌত করলেন। এরপর তিনি জমিনে অথবা দেয়ালে দুই অথবা তিনবার হাত মারলেন। অতঃপর তিনি কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন। তিনি তাঁর চেহারা ও দুই বাহু ধৌত করলেন। এরপর তিনি মাথায় পানি ঢাললেন। শরীর ধৌত করলেন। তিনি তাঁর জায়গা থেকে সরে গেলেন এবং দু'পা ধৌত করলেন। বর্ণনাকারী বলেন,'এরপর আমি একটি কাপড়ের টুকরা নিয়ে এলাম। অবশ্য তিনি তা চাইলেন না। তিনি তাঁর হাত দিয়েই পানি ঝেড়ে ফেলতে শুরু করলেন।'(বর্ণনায় বুখারী)

সে হিসেবে গোসল করার পদ্ধতি হলো:

১- দুই অথবা তিনবার কব্জি পর্যন্ত দু'হাত ধোয়া।

২- গুপ্তাঙ্গ ধোয়া।

৩- জমিন অথবা দেয়ালে দুই অথবা তিনবার হাত মারা।

৪- নামাজের অজুর ন্যায় অজু করা, তবে মাথা মাসেহ ও পা ধোয়া ব্যতীত।

৫- মাথায় পানি ঢালা।

৬- সমস্ত শরীর ধোয়া।

৭- যেখানে দাঁড়িয়ে গোসল করা হয়েছে সেখান থেকে সরে গিয়ে পা ধোয়া ।











জুনুবী ব্যক্তির ওপর যা হারাম

১- নামাজ

দলিল, আল-কুরআনের আয়াত:

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَـٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْ﴾

{হে মুমিনগণ, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা বুঝতে পার যা তোমরা বল এবং অপবিত্র অবস্থায়ও না, যতক্ষণ না তোমরা গোসল কর, তবে যদি তোমরা পথ অতিক্রমকারী হও।} [আন-নিসা:৪৩]



নামাজ

২- বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করা

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'বায়তুল্লাহর তাওয়াফ হলো নামাজতুল্য'। (বর্ণনায় নাসায়ী)



বায়তুল্লাহর তাওয়াফ

৩- কুরআন স্পর্শ করা।

এর দলিল, আল কুরআনের আয়াত,

﴿لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلۡمُطَهَّرُونَ﴾ {কেউ তা স্পর্শ করবে না পবিত্রগণ ছাড়া।} [সূরা আল ওয়াকিয়া:৭৯], হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'পবিত্রতা ব্যতীত কেউ কুরআন স্পর্শ করবে না'।(হাদীসটি ইমাম মালিক তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।)



কোরআান স্পর্শ করা

৪- কুরআন পড়া

আলী রাযি. বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইস্তেন্জা সেরে বের হয়ে আসতেন, তিনি আমাদেরকে কুরআন পড়ে শোনাতেন, আমাদের সাথে গোশত খেতেন, জানাবত ব্যতীত কোনো কিছু তাঁকে কুরআন থেকে বারণ করত না'। (বর্ণনায় তিরমিযী)



কোরআান পড়া

৫- মসজিদে অবস্থান করা, তবে যদি হেঁটে অতিক্রম করে যাওয়া হয় তার কথা ভিন্ন

ইরশাদ হয়েছে:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْ﴾

{হে মুমিনগণ, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা বুঝতে পার যা তোমরা বল এবং অপবিত্র অবস্থায়ও না, যতক্ষণ না তোমরা গোসল কর।} [সূরা আন-নিসা:৪৩]



মসজিদে অবস্থান করা

মুস্তাহাব গোসল

১- জুমার জন্য গোসল করা মুস্তাহাব। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, {'যে ব্যক্তি জুমার জন্য অজু করল সে এর দ্বারাই নেয়ামত পেয়ে গেল, আর যে ব্যক্তি গোসল করল, তবে গোসলই উত্তম।'} [বর্ণনায় আবু দাউদ]

২- হজ্ব ও উমরার জন্য গোসল করা। যায়েদ ইবনে ছাবেত রাযি. থেকে বর্ণিত, 'তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইহরামের উদ্দেশে কাপড় পরিত্যাগ করতে ও গোসল করতে দেখেছেন।' (বর্ণনায় তিরমিযী)

৩- মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার পর গোসল করা। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তিকে গোসল করাল সে যেন গোসল করে।'(বর্ণনায় ইবনে মাজাহ)

৪- প্রতিবার সঙ্গমের পর গোসল করা। আবু রাফে রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের কাছে গমন করলেন, এবং প্রত্যেকের কাছেই গোসল করলেন। বর্ণনাকারী বলেন,'আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, একবার গোসল করলেই কি হয় না? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'এটাই উত্তম, অধিক ভালো ও পবিত্রতা'।(বর্ণনায় আবু দাউদ)

যা উচিত নয়

১- জানাবতের গোসল এতটুকু দেরিতে করা যে নামাজের ওয়াক্ত চলে যায়।

২- নারীর মাসিক থেকে পবিত্র হওয়ার পর পরবর্তী ফরজ নামাজ ছেড়ে দেয়া। যদি কোনো নারী যোহরের নামাজের শেষ ওয়াক্তে পবিত্র হয় এবং এক রাকাত পড়া যাবে এমন সময় বাকী থাকে তবে তার ওপর যোহরের নামাজ ফরজ বলে গণ্য হবে এবং গোসল করে যোহরের নামাজ পড়তে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে এক রাকাত নামাজ পেল সে ফজরের নামাজ পেল। আর যে ব্যক্তি সুর্যাস্তের পূর্বে এক রাকাত আসরের নামাজ পেল সে আসরের নামাজ পেল'। (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)



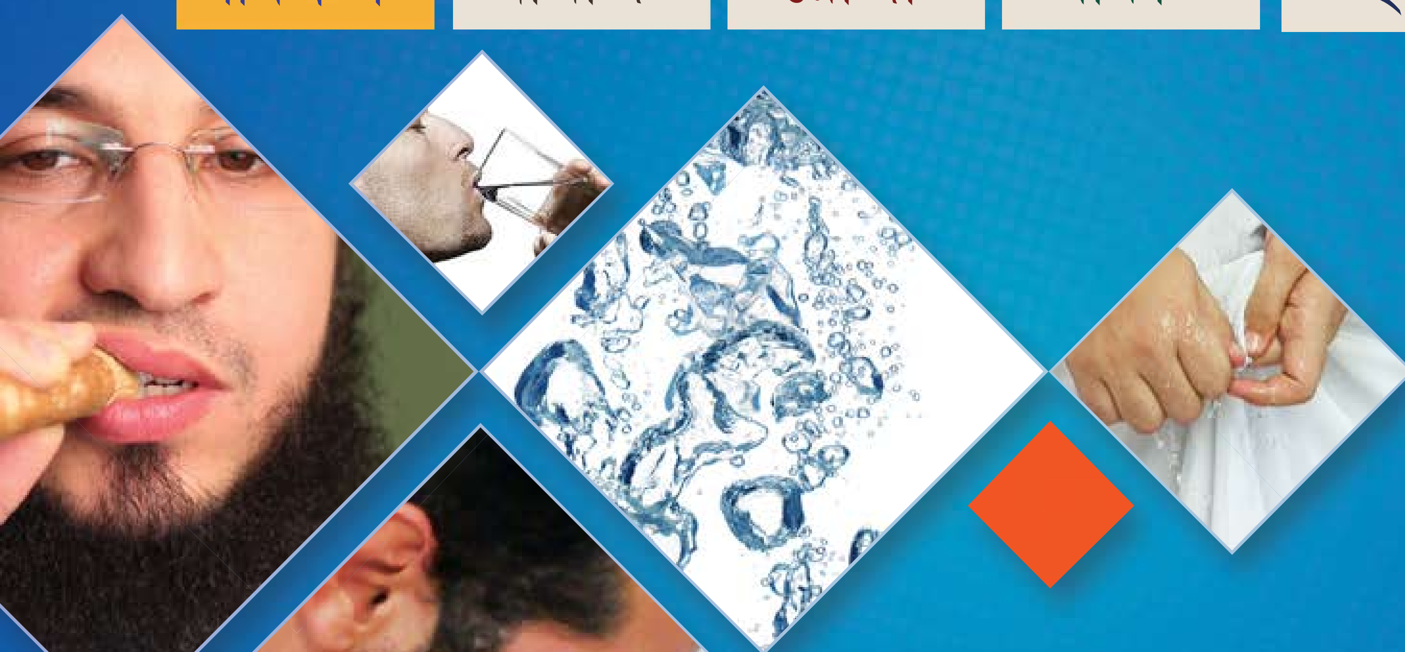




আলোকচিত্রে ইবাদত

সহজ সরল উপয়ে ইসলামের বিধি-বিধান শেখা

পবিত্রতা | নামাজ | রোজা | যাকাত | হজ্ব





Dr. Abdullah Bahmmam

অনুবাদ

আবদুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান

পর্যালোচনার

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

তায়াম্মুম

১০ তায়াম্মুম

সূচীপত্র

আভিধানিক অর্থে তায়াম্মুম

কোনো বিষয়ের প্রতি ধাবিত হওয়া ও তা করার ইচ্ছা করা

শরয়ী পরিভাষায় তায়াম্মুম

পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশে চেহারা ও দু'হাত পবিত্র মাটি দিয়ে মাসেহ করা।

তায়াম্মুমের হুকুম

পানির অনুপস্থিতে অথবা পানি ব্যবহার করা অসম্ভব হলে যেসব বিষয়ের জন্য পবিত্রতা ফরজ সেসবের জন্য তায়াম্মুম করা ফরজ। আর যেসবের জন্য পবিত্রতা মুস্তাহাব সেসবের জন্য তায়াম্মুম করা মুস্তাহাব, যেমন কুরআন তিলাওয়াত করা।

তায়াম্মুম শরীয়তভুক্ত হওয়ার দলিল

১- আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ﴾

{অতঃপর পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করো। সুতরাং তোমাদের মুখ ও হাত তা দ্বারা মাসেহ করো।} [সূরা আল মায়েদা:৬]

২- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস দেয়া হয়েছে যা আমার পূর্বে কাউকে দেয়া হয়নি: একমাস হেঁটে আসার দূরত্ব পর্যন্ত আমার ভীতি বিস্তৃত করে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। আর সমস্ত জমিন আমার জন্য মসজিদ ও পবিত্র করে দেয়া হয়েছে। অতঃপর আমার উম্মতের কোনো ব্যক্তির যখন নামাজের সময় হবে তখন সে যেন তা পড়ে নেয়।'(বর্ণনায় বুখারী)

তায়াম্মুম শরীয়তভুক্ত হওয়ার হিকমত

১- উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য সহজ করা

২- যেসব অবস্থায় পানি ব্যবহারের ফলে ক্ষতির আশঙ্কা থাকে তা দূর করা, যেমন অসুস্থ হয়ে পড়া, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা থাকা ইত্যাদি।

৩- ইবাদতের সাথে সম্পর্ক অব্যাহত রাখা, পানি না থাকার কারণে ইবাদত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না যাওয়া।

তায়াম্মুম করা কখন বৈধ?

১- পানির অনুপস্থিতিতে

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟﴾ {অতঃপর পানি না পাও, তবে তায়াম্মুম করো।}

২- পানি থাকা সত্ত্বেও তা ব্যবহার করতে অপারগ হলে

যেমন অসুস্থ অথবা বৃদ্ধ ব্যক্তি যে নড়াচড়া করতে পারে না এবং তার কাছে এমন ব্যক্তিও নেই যে তাকে অজু করার ব্যাপারে সাহায্য করবে।



বয়োবৃদ্ধ   অসুস্থ ব্যক্তি

৩ - পানি ব্যবহার করার ফলে ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকলে

যেমন :

ক - অসুস্থ ব্যক্তি যদি পানি ব্যবহার করে তবে তার অসুস্থতা বেড়ে যাবে।

খ - প্রচন্ড ঠান্ডায় যদি পানি গরম করার মতো কিছু না থাকে এবং পানি ব্যবহার করলে অসুস্থতা বেড়ে যাবে এ ধারণার পাল্লা ভারি থাকে, এ অবস্থায় তায়াম্মুম করার অনুমতি রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক, প্রচন্ড ঠান্ডা থাকার কারণে তায়াম্মুম করে নামাজের ইমামতি করার পর, আমর বিন আস রাযি. এর কাজকে নাকচ করে না দেয়া এ ক্ষেত্রে প্রমাণ। (বর্ণনায় আবু দাউদ)

গ - কোনো ব্যক্তি যদি পানি থেকে দূরে কোথাও অবস্থান করে এবং তার সাথে পান করার মতো সামান্য পানি থাকে আর অন্য পানি হাজির করতে অপরাগ হয়।

তায়াম্মুমের বর্ণনা

৪. মাটিতে একবার উভয় হাত মারবে

৫. এরপর ধুলা হালকা করার জন্য দু'হাতে ফুঁ দেবে।

৬. এরপর দু'হাত দিয়ে চেহারা মাসেহ করবে।

৭. এরপর আবার মাটিতে দু'হাত মারবে।

৮. এরপর ধুলা হালকা করার জন্য দু'হাতে ফুঁ দেবে।

৯. এরপর বাম হাত ডান হাতের উপরের অংশে কনুই পর্যন্ত বুলাবে।এবং কনুই থেকে নিচের অংশে কব্জি পর্যন্ত বুলাবে। অতঃপর একই কায়দায় ডান হাত দিয়ে বাম হাত বুলাবে।

১০. উল্লেখিত পদ্ধতিতে তায়াম্মুম করার দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তায়াম্মুম হলো জমিনে দু'বার হাত মারা। একবার চেহারার জন্য, অন্যবার কনুই পর্যন্ত দু'হাতের জন্য'।(বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম) [মুস্তাদরাক আলাস সাহি হাইন]

তায়াম্মুমের ফরজসমূহ

১. নিয়ত করা।

২. চেহারা মাসেহ করা।

৩. দু'হাত মাসেহ করা।

ইমামদের কেউ কেউ আরো কয়েকটি বিষয় ফরজ বলে গণ্য করেছেন। আর তা হলো :

৪. ধারাবাহিকতা রক্ষা করা। অর্থাৎ প্রথমে চেহারা ও পরে দু'হাত মাসেহ করা।

৫. মুয়ালাত তথা অবিচ্ছিন্নতা বজায় রাখা। অর্থাৎ চেহারা মাসেহ করার পর বিলম্ব না করে হাত মাসেহ করা।

যেসব কারণে তায়াম্মুম বাতিল হয়ে যায়

১. পানি বর্তমান থাকা।

২. অজু ভঙ্গকারী কোনো কিছু সংঘটিত হওয়া, যেমন বায়ু বের হওয়া।

৪. গোসল ফরজ হয় এমন বিষয় সংঘটিত হওয়া, যেমন স্বপ্নদোষ।

৫. যেসব ওজরের কারণে তায়াম্মুম করা শরীয়তসিদ্ধ সেসব কারণ দূর হয়ে যাওয়া। যেমন অসুস্থতা ইত্যাদি।



পানি পাওয়া গেল না



মাটি পাওয়া গেল না



ধুলোবিশিষ্ট কার্পেট থেকে তায়াম্মুম করা বৈধ



তায়াম্মুম

মাসায়েল

১. পানি ব্যবহারে অক্ষম হলে তায়াম্মুম করে নামাজ পড়া পেশাব পায়খানার চাপের মুখে অজু রক্ষা করে নামাজ পড়ার চেয়ে অনেক উত্তম।

২. দেয়াল অথবা কার্পেটের ওপর ধুলোবালি থাকলে সেখানে হাত মেরে তায়াম্মুম করা বৈধ হবে।

৩. তায়াম্মুমকারী তায়াম্মুম ভঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত যত ইচ্ছা ফরজ ও নফল নামাজ আদায় করতে পারে।

৪. অজুকারী তায়াম্মুমকারীর পেছনে নামাজে ইক্তেদা করতে পারে; কেননা আমর ইবনে আস রাযি.যখন প্রচন্ড ঠান্ডার কারণে তায়াম্মুম করে তাঁর সাথীদের ইমামতি করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা নাকচ করে দেননি। (বর্ণনায় আবু দাউদ)

৪. যে ব্যক্তি তায়াম্মুম করে নামাজ পড়ল অতঃপর সময় চলে যাওয়ার পূর্বেই পানি পেল, সে নামাজ পুনরায় পড়বে না। আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘দুই ব্যক্তি সফরে বের হলো। পথিমধ্যে নামাজের ওয়াক্ত হলো তবে তাদের সাথে কোনো পানি ছিল না। অতঃপর তারা পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করল। নামাজ পড়ল। এরপর নামাজের সময় শেষ হওয়ার পূর্বেই পানি পেয়ে গেল। দু’জনের একজন অজু করে পুনরায় নামাজ আদায় করল। পক্ষান্তরে অন্যজন করল না। এরপর উভয়েই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এল। ঘটনার বর্ণনা দিল। যে ব্যক্তি নামাজ পুনরায় পড়েনি, তাকে তিনি বললেন,‘তুমি সুন্নত অনুযায়ী আমল করেছ এবং তোমার নামাজ শুদ্ধ হয়েছে। আর যে অজু করে পুনরায় নামাজ পড়েছে তাকে তিনি বললেন, ‘তোমার ছাওয়াব দ্বিগুণ হয়েছে।’(বর্ণনায় আবু দাউদ)

৪. যে ব্যক্তি নামাজের পূর্বে বা মাঝখানে পানি পেল তার উচিত হবে পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,‘পবিত্র মাটি মুসলমানের পবিত্রতা অর্জনের বস্তু। যদিও সে দশ বছর পর্যন্ত পানি না পায়। আর যদি পানি পায় তবে সে যেন তা তার চামড়ায় স্পর্শ করায়। কেননা এটা তার জন্য উত্তম।’

৫. মুসলমানকে কোনো কিছুই নামাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে না, মুসলমান নামাজকে সুনির্দিষ্ট সময় থেকে পিছিয়েও দেয় না। সে হিসেবে যদি কেউ পানি ব্যবহার করতে অপারগ হয়, অথবা পানি না পায়, তাহলে সে তায়াম্মুম করে নেবে। আর যদি তায়াম্মুম করতেও অপারগ হয় তবে পবিত্রতা ব্যতীতই নামাজ পড়ে নেবে।

৬. যে পানি ও মাটি কোনোটাই পাবে না সে পবিত্রতা ব্যতীতই সময়মতো নামাজ আদায় করে নেবে। এবং তা আর পুনরায় আদায় করতে হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿فَاتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ {অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর।} [আত-তাগাবুন:১৬]

তায়াম্মুম শেষ সময় পর্যন্ত পিছিয়ে দেয়া জায়েয আছে যদি পানি পাওয়ার আশা থাকে। আর যদি পানি পাওয়ার আদৌ কোনো আশা না থাকে তাহলে নামাজের সময় আসার পরপরই নামাজ আদায় করা উত্তম হবে। কেননা উত্তম হলো সময়মতো নামাজ পড়ে নেয়া।

৭. যদি কেউ নামাজের সময় চলে যাওয়ার আশঙ্কা করে, অতঃপর পানি থাকা সত্ত্বেও তায়াম্মুম করে নামাজ পড়ে নেয় তবে তা জায়েয হবে না। বরং এ অবস্থায় আবশ্যিক হবে অজু করা যদিও নামাজের ওয়াক্ত চলে যায়।

বিজ্ঞান যা বলে

জমিনের মাটি তার পরমাণুগুলোতে পবিত্রতাকারী পদার্থ বহন করে। এ পদার্থ সকল প্রকার জার্ম ধ্বংস করে দিতে সক্ষম। যেকোনো মাইক্রোব অথবা ভাইরাস ধ্বংস করে দিতে সক্ষম।

চেহারা মাসেহ করা



মাটিতে দু'হাত মারা



ফুঁ দিয়ে হাত থেকে মাটি সরানো



চেহারা মাসেহ করা



বাম হাত দিয়ে ডান হাত মাসেহ করা

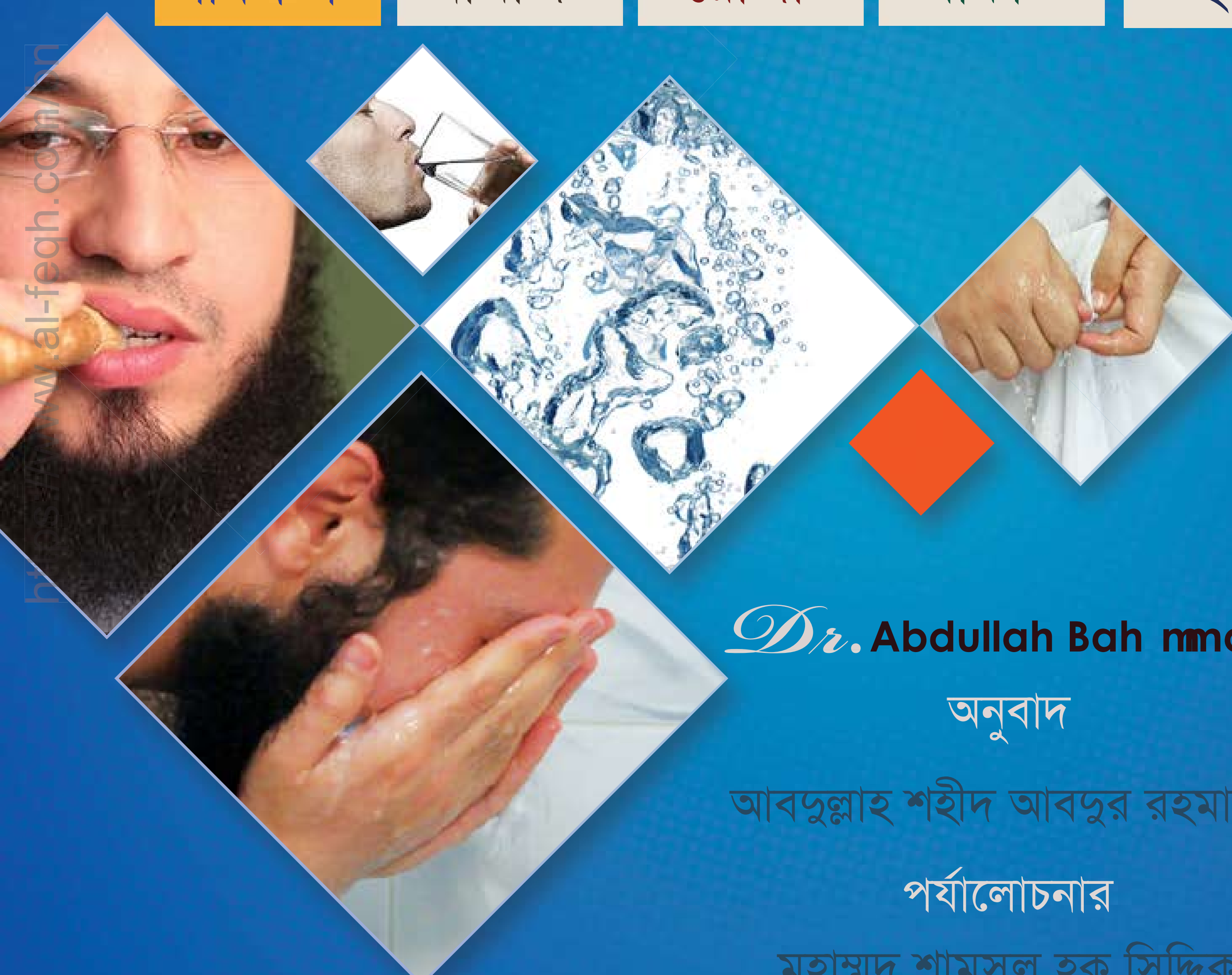


ডান হাত দিয়ে বাম হাত মাসেহ করা

আলোকচিত্রে ইবাদত

সহজ সরল উপয়ে ইসলামের বিধি-বিধান শেখা

পবিত্রতা | নামাজ | রোজা | যাকাত | হজ্ব



Dr. Abdullah Bah mmam

অনুবাদ

আবদুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান

পর্যালোচনার

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

যাকাতের হকদার ও যাকাত প্রদান প্রসঙ্গ

১১

হায়েয, ইস্তেহাযা ও নিফাস

সূচীপত্র



হায়েয

আভিধানিক অর্থে হায়েয

কোনো কিছু প্রবাহিত হওয়া

শরীয়তের পরিভাষায় হায়েয

নারীর সুস্থ জরায়ু থেকে সুনির্দিষ্ট সময়ে, কোনো কারণ ব্যতীতই যে রক্তস্রাব বের হয় তাকে হায়েয বলে।

হায়েযের রক্তস্রাবের ধরণ

কালো, যেন তা পুড়ে-যাওয়া কৃষ্ণ কোনো পদার্থ, কষ্টদায়ক, দুর্গন্ধযুক্ত, এবং এ সময় নারী প্রচন্ড তাপ অনুভব করে।

হায়েয শুরু হওয়ার বয়স

হায়েয শুরু হওয়ার সুনির্দিষ্ট কোনো বয়স নেই। নারীর প্রকৃতি ও পরিবেশ অনুযায়ী তা ভিন্ন হয়ে থাকে। তাই নারী যখন হায়েযের স্রাব দেখে তখন সেটাকেই হায়েয ধরা হবে।

হায়েযের সময়সীমা

হায়েযের সুনির্দিষ্ট কোনো সময়সীমা নেই। নারীদের কারও তিনদিন, আবার কারও চারদিন হায়েয হয়ে থাকে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে হায়েয ছয় অথবা সাতদিন হয়ে থাকে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হামনা বিনতে জাহাশকে বলেছেন, যার অনেক দিন হায়েয হতো, 'তুমি আল্লাহর ইলম অনুযায়ী ছয়দিন অথবা সাতদিন হায়েয গণনা করো, অতঃপর গোসল করো।'(বর্ণনায় আবু দাউদ)



মাসায়েল

১. মূলত গর্ভবতী নারীর হায়েয হয় না। তাই যদি কোনো নারী প্রসবের অল্প কিছু সময় পূর্বে রক্ত দেখে এবং জরায়ুতে প্রসবের ব্যাথা অনুভব হয়, তবে তা নিফাসের রক্ত। আর যদি প্রসবের ব্যাথা অনুভূত না হয় এবং তা বেশ কিছু দিন পূর্বে হয়, তবে তা হায়েযের রক্ত বলে গণ্য হবে।

২. কোনো নারীর নির্ধারিত সময়ের পূর্বে বা পরে যদি হায়েয আসে, যেমন মাসের শুরুতে হায়েয আসার কথা কিন্তু তার পরিবর্তে হায়েয এলো মাসের শেষে। অথবা সুনির্দিষ্ট সময়ের কম অথবা বেশি হলো, যেমন সাধারণত ছয়দিন হায়েয হয়, তবে এবার হলো সাতদিন। এরূপ হলে বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া হবে না। বরং যখন হায়েযের রক্ত দেখা যাবে সেটাকেই হায়েয মনে করা হবে। আর যখন পবিত্রতা দেখা যাবে তখন সেটাকে পবিত্রতা মনে করতে হবে।

৩. নারীর পবিত্র হওয়া বুঝা যাবে সাদা স্রাব নির্গত হওয়ার মাধ্যমে। যদি সাদা স্রাব নির্গত না হয়, তাহলে শুষ্কতা পবিত্রতার আলামত বলে ধরা হবে। যেমন, যদি সাদা তুলা নারীর গুপ্তাঙ্গে রাখা হয় আর তা শুষ্কাবস্থায় বের হয়ে আসে, তবে তা পবিত্রতার আলামত বলে ধরা হবে।



পবিত্রতার আলামত



হলুদ বর্ণের আকৃতি



হলুদ ও কালোর মাঝামাঝি বর্ণের আকৃতি

হায়েযের আহকাম

সুফরা
হলুদ রঙ্গের স্রাব।

কুদরা
হলুদ ও কালো রঙ্গের মাঝামাঝি রঙ্গের স্রাব।

১ - কুদরা ও সুফরার হুকুম

যদি কোনো নারী হলুদ রঙ্গের স্রাব দেখে, অথবা হলুদ ও কালোর মাঝামাঝি রঙ্গের রক্ত দেখে অথবা শুধু আদ্রতা দেখে তবে তার দু'অবস্থা হতে পারে:



১ – নারী হয়তো তা হায়েযের সময়সীমার মধ্যে অথবা পবিত্রতা অর্জনের সামান্য পূর্বে দেখবে

এ অবস্থায় তা হায়েয বলে গণ্য হবে; এর প্রমাণ আয়েশা রাযি. এর হাদীস,'নারীরা তাঁর কাছে ব্যবহৃত তুলা পাঠাত যাতে হলুদ বর্ণের রক্ত থাকত, অতঃপর তিনি বলতেন, 'তাড়াহুড়া করো না যতক্ষণ না সাদা স্রাব দেখ। এর দ্বারা তিনি হায়েয থেকে পবিত্রতাকে বুঝিয়েছেন।'(বর্ণনায় ইমাম মালিক)

২ – নারী হয়তো তা পবিত্র অবস্থায় দেখবে

এ অবস্থায় তা হিসাবে আনা হবে না। এরূপ স্রাব এলে অজু ও গোসল কোনোটাই ফরজ হবে না। উম্মে আতিয়া রাযি. বলেন, 'আমরা পবিত্রতা অর্জনের পর কুদরা ও সুফরাকে হিসাবে আনতাম না।'(বর্ণনায় আবু দাউদ)

২ – ভেঙ্গে ভেঙ্গে হায়েয আসার হুকুম

নারী যদি একদিন রক্ত দেখে, অন্যদিন না দেখে, তবে তার দু'অবস্থা হতে পারে:

১ – অবস্থা সবসময় থাকা

তাহলে তা ইস্তিহাযার স্রাব বলে ধরা হবে।

২ – অথবা কেটে কেটে আসা

অর্থাৎ কিছু সময় আসা আবার কিছু সময় বন্ধ থাকা। এরূপ হলে তার হুকুম হবে নিম্নরূপ:

ক - যদি পুরো একদিনের কম হায়েযের স্রাব না আসে তবে তা হায়েযের মধ্যেই হিসাব করা হবে।

খ - যদি পবিত্রতার সময় নারী এমন জিনিস দেখে যা পবিত্রতাকে নির্দেশ করে যেমন সাদা স্রাব দেখল, তাহলে এ সময়টা পবিত্রতার মধ্যে ধরা হবে। চাই তা কম হোক বা বেশি হোক। অথবা তা একদিনের কম বা বেশি হোক।

ইস্তিহাযা

ইস্তিহাযা

স্ত্রী অঙ্গ থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে রক্ত প্রবাহিত হওয়া, অথবা কিছু সময়ের জন্য থেমে আবার প্রবাহিত হওয়া।

হায়েয ও ইস্তিহাযার রক্তের মধ্যে পার্থক্য

হায়েযের রক্ত	ইস্তিহাযার রক্ত
গাড় কালো	হালকা লাল
এর রয়েছে পচা দুর্গন্ধ	এর কোনো গন্ধ নেই
জমাট বাঁধে না	জমাট বেঁধে যায়
জরায়ুর সর্বশেষ প্রান্ত থেকে বের হয়	জরায়ুর মুখে অবস্থিত একটি রগ থেকে বের হয়
স্বাভাবিক ও সুস্থাবস্থার রক্ত	কোনো সমস্যা ও অসুস্থতাজনিত রক্ত
যা সুনির্দিষ্ট সময় নির্গত হয়	যা সুযার কোনো সুনির্দিষ্ট সময় নেই

প্রথম অবস্থা: ইস্তিহাযার পূর্বে নারীর সুনির্দিষ্ট সময়ে ঋতুস্রাবের অভ্যাস থাকা

এই প্রকৃতির নারী তার ঋতুস্রাবের সুনির্দিষ্ট সময়কে হায়েয হিসেবে বিবেচনা করবে, এবং মাসের বাকি দিনগুলোকে ইস্তিহাযা হিসেবে ধরবে। আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, ফাতেমা বিনতে আবি হুবাইশ রাযি. বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, 'আমি পবিত্র হই না। অতঃপর আমি কি নামাজ পরিত্যাগ করব?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, 'না, ওটা হলো শরীরের রক্ত নালী হতে নিসৃত রক্ত সাদৃশ। তবে তোমার যে কয়দিন ঋতুস্রাব হওয়ার অভ্যাস ছিল সে কয়দিন নামাজ ছেড়ে দাও। এরপর গোসল করো ও নামাজ পড়ো।'(বর্ণনায় বুখারী)

দ্বিতীয় অবস্থা : ঋতুস্রাবের জানা কোনো অভ্যাস না থাকা। তবে হায়েয ও ইস্তিহাযার রক্তের মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম হওয়া।

এই প্রকৃতির নারী তার পার্থক্য করার ভিত্তিতে আমল করবে। ফাতেমা বিনতে আবি হুবাইশ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি ইস্তিহাযাগ্রস্তা হতেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন, 'যদি হায়েযের রক্ত হয় তবে তা পরিচিত কালো রক্ত হবে। যদি এরূপ হয় তবে নামাজ পড়া থেকে বিরত হও। আর যদি এর অন্যথা হয়, তবে অজু করো ও নামাজ পড়ো; কেননা তা শরীরের রক্ত নালী হতে নিসৃত রক্ত সাদৃশ।' (বর্ণনায় আবু দাউদ)

তৃতীয় অবস্থা: সুনির্দিষ্ট কোনো অভ্যাস না থাকা এবং পার্থক্য করতেও অক্ষম হওয়া।

এ প্রকৃতির নারী অধিকাংশ নারীদের অভ্যাস মুতাবেক আমল করবে। অতঃপর প্রতিমাসে ছয় অথবা সাতদিন হায়েয হিসাব করবে। স্রাব শুরু হওয়ার প্রথমদিন থেকে হিসাব করবে। আর মাসের অবশিষ্ট দিনগুলো ইস্তিহাযা হিসেবে ধরবে। এর প্রমাণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হামনা বিনতে জাহাশ রাযি. কে বলেছেন, 'তুমি আল্লাহর ইলম অনুযায়ী ছয় অথবা সাতদিন হায়েয হিসাব করো, অতঃপর গোসল করো। এরপর যখন দেখবে যে তুমি পবিত্র হয়েছ, তখন তেইশ অথবা চব্বিশদিন নামাজ পড়ো ও রোজা রাখো। এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। প্রতি মাসেই তুমি অনুরূপ করো, অন্যান্য নারীদের মতো অর্থাৎ তাদের হায়েয ও পবিত্রতার সময়ের মতো।'(বর্ণনায় আবু দাউদ)

চতুর্থ অবস্থা : নারীর সুনির্দিষ্ট সময়ে ঋতুস্রাব আসার অভ্যাস থাকা এবং একই সাথে পার্থক্য করতে সক্ষম হওয়া।

এ অবস্থায় অভ্যাসটাকে হিসেবে আনা হবে, পার্থক্য করাটাকে নয়; কেননা অভ্যাসটাই নারীর জন্যে অধিক নিয়মানুবর্তী। তবে যদি নারী ভুলে যায় তার অভ্যাস কি ছিল, এমতাবস্থায় পার্থক্যকরণের ভিত্তির ওপর আমল করা হবে।

মাসায়েল

১. যদি হায়েয সংঘটিত হওয়ার সময় সম্পর্কে নারীর জানা থাকে, তবে কয়দিন হায়েয হয় তা ভুলে যায়, এমতাবস্থায় অধিকাংশ নারীদের অভ্যাস অনুযায়ী সময় হিসাব করতে হবে।

২. কয়দিন হায়েয হয় যদি তা জানা থাকে, তবে তা কখন হয়, মাসের শুরুতে না শেষে তা মনে না থাকে, তাহলে হায়েযের দিনগুলো মাসের শুরুতে হিসাব করবে। যদি মাসের মধ্যখানে হায়েয আসত বলে মনে করতে পারে, কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে কবে শুরু হত তা বলতে না পারে, তাহলে মাসের মধ্যখানের প্রথমাংশে হায়েযের সময় হিসাব করবে। কেননা মাসের মাঝখান থেকে হিসাব করা, সময় নিয়ন্ত্রণের জন্য, নারীর পক্ষে সহজ।

যদি হায়েযের সময় চলে যায়, আর নারী ইস্তিহাযাগ্রস্ত থাকে তবে নামাজ রোজা পালন করে যাবে। অজুর পর যদি রক্ত আসে তবে তাতে কোনো ক্ষতি হবে না; কেননা এটাকে ওজর হিসাবে ধরা হবে। এ ক্ষেত্রে নারীর পবিত্রতা অর্জন তিনভাবে হতে পারে:

ক - নামাজের সময় আসার পর প্রতি নামাজের জন্য অজু করবে। এর প্রমাণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাতেমা বিনতে আবি হুবাইশকে বলেছেন,'অতঃপর তুমি প্রত্যেক নামাজের জন্য অজু করো ও নামাজ আদায় করে নাও। (বর্ণনায় আবু দাউদ)

খ - যোহরের নামাজ একেবারে শেষ ওয়াক্তে পিছিয়ে দেবে। অতঃপর গোসল করে যোহর ও আসর একসাথে আদায় করে নেবে। মাগরিব ও এশা একইরূপে আদায় করবে। এর দলিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হামনা বিনতে জাহাশ রাযি. কে বলেছেন, 'তুমি যদি পার যোহরের নামাজ পিছিয়ে দিতে ও আসরের নামাজ সময় শুরু হওয়ার সাথে সাথে পড়তে তবে গোসল করে উভয় নামাজ একসাথে জমা করে পড়ে নেবে। অর্থাৎ যোহর ও আসর। আর যদি পার মাগরিব পিছিয়ে দিতে ও এশা প্রথম ওয়াক্তে পড়তে তাহলে গোসল করে দুই নামাজ একত্রে পড়তে পারলে পড়ে নেবে। ফজরের সময় গোসল করে ফজর পড়ে নেবে। আর যদি রোজা রাখতে সক্ষম হও তবে রোজা রাখবে।'(বর্ণনায় আবু দাউদ)

গ- প্রত্যেক নামাজের জন্য আলাদাভাবে গোসল করবে; এক বর্ণনায় এসেছে, উম্মে হাবিবা রাযি. সাত বছর পর্যন্ত ইস্তিহাযাগ্রস্ত অবস্থায় ছিলেন। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে গোসল করতে নির্দেশ দেন। অতঃপর তিনি প্রতি নামাজের জন্য গোসল করতেন।(বর্ণনায় বুখারী)

৩. যদি কোনো কারণে নারীর রক্তক্ষরণ ঘটে, যেমন জরায়ুতে অস্ত্রপাচার করা হলো, যার ফলে রক্তপাত হলো, এর দু'অবস্থা হতে পারে:

ক - হায়েয আসবে না বলে নিশ্চিত জ্ঞান থাকা। এমতাবস্থায় এটাকে ইস্তিহাযা বলে ধরা হবে না। এ কারণে কোনো ওয়াক্ত নামাজ থেকে বিরত হওয়া যাবে না। এ সময় নির্গত রক্ত অসুস্থতাজনিত কারণে নির্গত রক্ত বলে ধরা হবে। এ অবস্থায় প্রতি ওয়াক্ত নামাজের জন্য অজু করতে হবে।

৪. হায়েয হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে জানা থাকা। এ অবস্থায় নির্গত রক্তের হুকুম হবে ইস্তিহাযার মতো।

৫. ইস্তিহাযাগ্রস্ত স্ত্রীর সাথে দৈহিক মিলন বৈধ; কেননা শরীয়তে এ ব্যাপারে কোনো নিষেধাজ্ঞা আসেনি।

নিফাস

নিফাস

নারীর জরায়ু থেকে সন্তান প্রসবের কারণে যে রক্ত বের হয়।

নিফাসের সময়সীমা

নিফাসের সর্বনিম্ন সুনির্দিষ্ট সময় বলতে কিছু নেই। তবে সর্বোচ্চ সময় হলো চল্লিশদিন। তবে যদি নারী এর পূর্বে পবিত্রতা দেখে তবে গোসল করবে ও নামাজ আদায় করবে।

নিফাসের আহকাম

১- প্রসবের পর যদি রক্ত দেখা না যায় - এরূপ অবশ্য খুব কমই ঘটে থাকে -তাহলে অজু করে নামাজ পড়ে নিতে হবে। এ অবস্থায় গোসল করতে হবে না।

২- যদি রক্তস্রাব চল্লিশদিন অতিক্রম করে যায় আর নারীর চল্লিশদিন পর নিফাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার অভ্যাস থাকে, অথবা অতি দ্রুত বন্ধ হয়ে যাওয়ার আলামত প্রকাশ পায়, তাহলে বন্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। যদি বন্ধ না হয় তাহলে তা ইস্তিহাযা বলে গণ্য হবে। এবং এ ক্ষেত্রে ইস্তিহাযার সকল হুকুম বর্তাবে।

৩- আর যদি চল্লিশদিনের পূর্বেই পবিত্র হয়ে যায়, কিন্তু চল্লিশদিন শেষ হওয়ার আগে আবার ফিরে আসে, তাহলে এ ক্ষেত্রে দেখতে হবে :

ক - যদি জানা যায় যে তা নিফাসের রক্ত, তাহলে তা নিফাস বলেই গণ্য হবে।

খ - আর যদি জানা যায় তা নিফাসের রক্ত না তবে নারীর এ অবস্থাকে পবিত্রাবস্থা বলে ধরা হবে।

৪- দৃশ্যমান অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গসম্পন্ন মানব সন্তান প্রসবের পর যে রক্তস্রাব বের হয় তাকে নিফাস বলে। আর যদি এমন সন্তান প্রসব হয় যার অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গ দৃশ্যমান নয়, তাহলে এর কয়েকটি অবস্থা হতে পারে:

ক - হয়তো গর্ভ শুরু হওয়ার প্রথম চল্লিশদিনের পূর্বেই গর্ভপাত হবে।যদি এরূপ হয় তবে তা পচা রক্ত বলে ধরা হবে। এমতাবস্থায় নারী নামাজ পড়বে ও রোজা রাখবে।

খ - অথবা আশিদিন পর গর্ভপাত ঘটবে। তাহলে এটাকে নিফাসের রক্ত বলে ধরা হবে।

গ- আর যদি চল্লিশদিন থেকে আশিদিনের মধ্যে গর্ভপাত ঘটে তবে দেখতে হবে, অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গের আলামত প্রকাশ পেয়েছে কি না, যদি আলামত প্রকাশ পেয়ে থাকে তবে তা নিফাসের রক্ত বলে ধরা হবে। অন্যথায় তা পচা রক্ত বলে ধরা হবে।

হায়েয ও নিফাসের কারণে যা কিছু হারাম হয়ে যায়

১ - স্বামী-স্ত্রীর মিলন

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾﴾

{আর তারা তোমাকে ঋতুস্রাব সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, তা কষ্ট। সুতরাং তোমরা ঋতুস্রাবকালে স্ত্রীদের থেকে দূরে থাক এবং তারা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। অতঃপর যখন তারা পবিত্র হবে তখন তাদের নিকট আস, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারীদেরকে ভালবাসেন এবং ভালবাসেন অধিক পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে।} [সূরা আল বাকারাহ: ২২২]

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত আয়াত নাযিল হলে বলেছেন, 'তোমরা সবকিছু করো, কেবল স্বামী-স্ত্রীর মিলন ব্যতীত।'(বর্ণনায় মুসলিম)

মাসায়েল

১- হায়েয অবস্থায় যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হলো সে গুনাহগার। এ ব্যক্তির ওপর কাফফরা দেয়া ওয়াজিব। স্ত্রীর ওপরও কাফফারা ওয়াজিব হবে যদি মিলনের সময় স্ত্রী সম্মত থাকে।

আর এই ক্ষেত্রে কাফফারা হলো, এক দিনার অথবা অর্ধ দিনার পরিমাণ স্বর্ণ দান করা। ইবনে আব্বাস রাযি. এর বর্ণনা অনুযায়ী যে ব্যক্তি হায়েয অবস্থায় স্ত্রীর সাথে মিলিত হলো তার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'এক দিনার বা অর্ধ দিনার পরিমাণ সদকা করবে।'(বর্ণনায় মুসলিম)

একদিনার হলো ৪.২৫ গ্রাম স্বর্ণ ।

২- যদি হায়েয থেকে স্ত্রী পবিত্র হয় তবে তার সাথে মিলিত হবে না যতক্ষণ না সে গোসল করে নেয়। ইরশাদ হয়েছে: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ﴾

{'তোমরা ঋতুস্রাবকালে স্ত্রীদের থেকে দূরে থাক এবং তারা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হয়ো না।'} [সূরা আল বাকারা:২২২] এখানে ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হওয়াকে বুঝানো হয়েছে। এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ﴾

{অতঃপর যখন তারা (গোসল করে) পবিত্র হবে তখন তাদের নিকট আস, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন।}

২- নামাজ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,'তোমার যখন হায়েয আসবে তখন নামাজ ছেড়ে দাও, আর যখন হায়েয চলে যাবে তখন রক্ত ধৌত করতে গোসল করো এবং নামাজ আদায় করো।'(বর্ণনায় আবু দাউদ)

মাসায়েল

১- নারী যখন পবিত্র হবে তখন হায়েয অবস্থায় যেসব নামাজ চলে গিয়েছে তা আদায় করতে হবে না। এর প্রমাণ আয়েশা রাযি. কে, হায়েযগ্রস্ত নারী নামাজ রোজা আদায় করবে কি না, এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন,'এ বিষয়টি আমাদের স্পর্শ করত। অতঃপর আমাদেরকে রোজা কাজা করার নির্দেশ দেয়া হত, তবে নামাজ কাজা করার নির্দেশ দেয়া হত না।' (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

২- পবিত্র হওয়ার পর যদি পূর্ণাঙ্গ এক রাকাত নামাজ পড়া যাবে এমন সময় থাকে তবে তার ওপর ওই ওয়াক্তের নামাজ ফরজ হবে। হোক তা নামাজের সময় আসার প্রথম অংশে অথবা শেষাংশে। যদি পূর্ণাঙ্গ এক রাকাত নামাজ পড়ার মতো সময় না থাকে, তবে নামাজ পড়া ফরজ হবে না। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি এক রাকাত নামাজ পেল সে পুরো নামাজই পেল।' (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

৩- রোজা

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যখন নারীর হায়েয আসে তখন সে কি নামাজ রোজা ছেড়ে দেয় না? উত্তরে তারা বলল,' জী'।(বর্ণনায় বুখারী)

মাসআলা

হায়েযগ্রস্ত নারী যদি সুবহে সাদেকের পূর্বে পবিত্রতা অর্জন করে অতঃপর রোজা রাখে, তবে তার রোজা জায়েয হবে, এমনকি যদি সুবহে সাদেকের পর গোসল করে তবুও।

৪- কুরআন স্পর্শ করা

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلۡمُطَهَّرُونَ ٧٩﴾ {কেউ তা স্পর্শ করবেনা পবিত্রগন ছাড়া,} [সূরা আল ওয়াকিয়া:৭৯]

৫- পবিত্র কাবার তাওয়াফ করা

এর যখন ঋতুস্রাব এল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন,'হাজ্বী যা করে তা করে যাও, তবে তুমি পবিত্র হওয়ার পূর্বে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করো না'। হাদীসটি ইমাম মালিক তার মুয়াত্তায় উল্লেখ করেছেন) ইবনে আব্বাস রাযি. বলেছেন,'লোকদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে তাদের সর্বশেষ কর্ম যেন হয় বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করা। তবে তিনি হায়েযগ্রস্ত নারীর জন্য এ ব্যাপারে ছাড় দিয়েছেন।(বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

৬- মসজিদে অবস্থান করা তবে যদি তা কেবল অতিক্রম করার জন্য হয়

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْ﴾ {হে মুমিনগণ, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা বুঝতে পার যা তোমরা বল এবং অপবিত্র অবস্থায়ও না, যতক্ষণ না তোমরা গোসল কর তবে যদি তোমরা পথ অতিক্রমকারী হও।} [আন নিসা:৪৩] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমি হায়েযগ্রস্ত নারী ও জুনুবির জন্য মসজিদ অবৈধ করিছি।' (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

মাসায়েল

১- হায়েযগ্রস্ত নারী যদি ন্যাপকিন বেঁধে রাখে এবং মসজিদ অপবিত্র হওয়ার ভয় না থাকে তবে মসজিদের ভেতর দিয়ে অতিক্রম করায় কোনো সমস্যা হবে না। এর প্রমাণ আল্লাহ তাআলার বাণী, {তবে যদি তোমরা পথ অতিক্রমকারী হও} [আন নিসা:৪৩]

২- হায়েযগ্রস্ত নারী ঈদের নামাজ পড়ার স্থল থেকে দূরে অবস্থান করবে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,'হায়েযগ্রস্ত নারীরা ঈদের নামাজ পড়ার স্থল বর্জন করবে।'(বর্ণনায় আবু দাউদ)

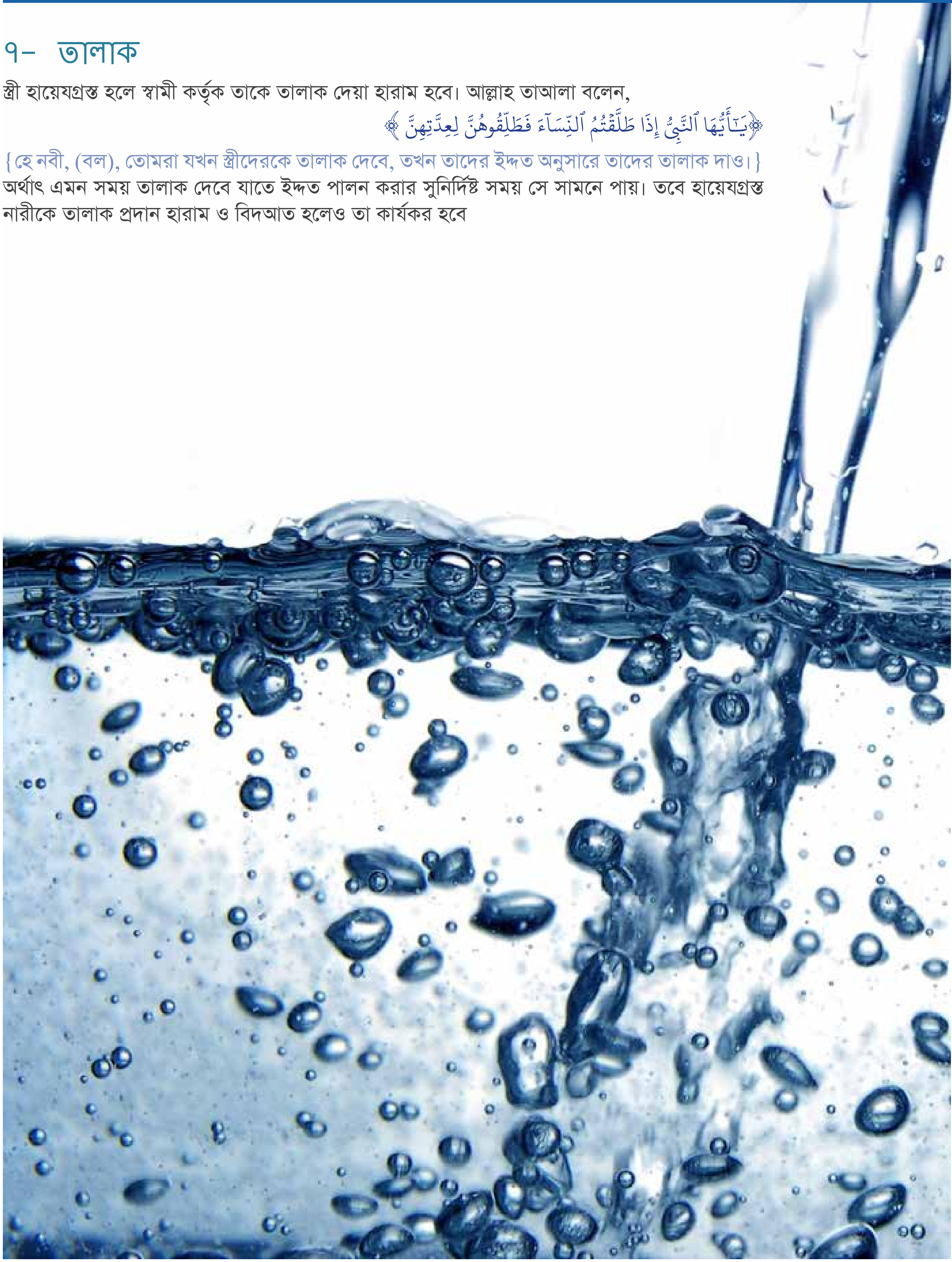
৭- তালাক

স্ত্রী হায়েযগ্রস্ত হলে স্বামী কর্তৃক তাকে তালাক দেয়া হারাম হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾

{হে নবী, (বল), তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দেবে, তখন তাদের ইদ্দত অনুসারে তাদের তালাক দাও।}

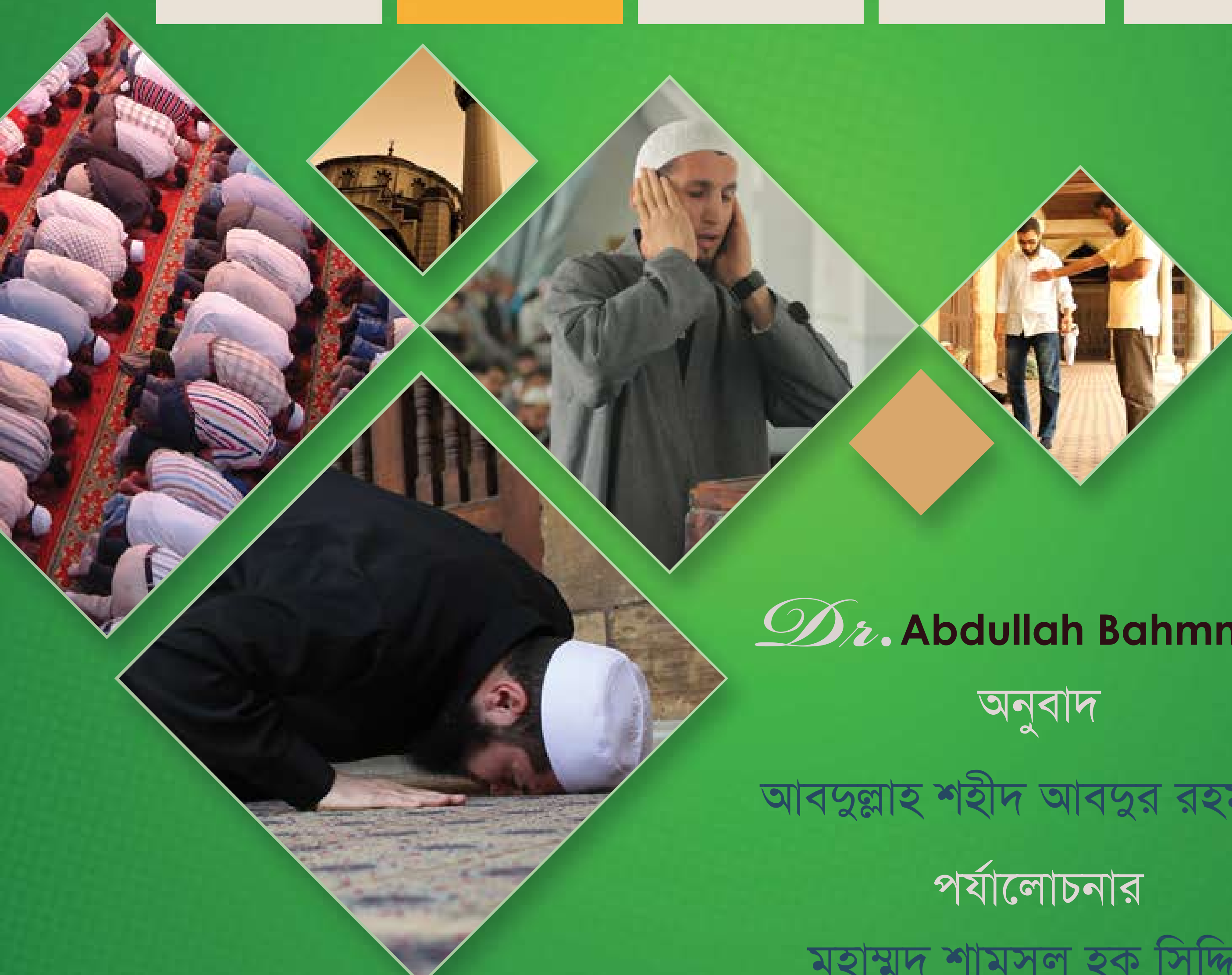
অর্থাৎ এমন সময় তালাক দেবে যাতে ইদ্দত পালন করার সুনির্দিষ্ট সময় সে সামনে পায়। তবে হায়েযগ্রস্ত নারীকে তালাক প্রদান হারাম ও বিদআত হলেও তা কার্যকর হবে



আলোকচিত্রে ইবাদত

সহজ সরল উপয়ে ইসলামের বিধি-বিধান শেখা

পবিত্রতা	নামাজ	রোজা	যাকাত	হজ্ব



Dr. Abdullah Bahmmam

অনুবাদ

আবদুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান

পর্যালোচনার

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

নামাজ বা সালাতের অবস্থান ও পরিত্যাগকারীর হুকুম



১

সালাতের অবস্থান ও হুকুম

সূচীপত্র

আভিধানিক অর্থে সালাত

দুআ

শরয়ী পরিভাষায় সালাত

সুনির্দিষ্ট বাক্যমালা ও কর্মের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করা, যা শুরু হয় তাকবিরের মাধ্যমে ও শেষ হয় সালামের মাধ্যমে।

ইসলামে সালাতের অবস্থান

সালাত ইসলামের দ্বিতীয় রুকন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, «ইসলাম পাঁচটি বিষয়ের ওপর নির্মিত হয়েছে: «এ সাক্ষী দেয়া যে আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। এবং সালাত আদায় করা...। (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম) নামাজ সর্বোত্তম আমল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,«সর্বোত্তম আমল হলো ওয়াক্তের শুরুতে নামাজ আদায় করা।» (বর্ণনায় তিরমিযী)

নামাজ ইসলাম ও কুফরের মাঝে পার্থক্যকারী। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, «ব্যক্তির মাঝে ও কুফর-শিরকের পার্থক্য হলো নামাজ ছেড়ে দেয়া।» (বর্ণনায় মুসলিম)

নামাজ ইসলামের খুঁটি। «তাওহীদের পর নামাজের ওপরই নির্মিত হয় ইসলামি জীবনধারা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, «এ-বিষয়ের মস্তক হলো ইসলাম এবং খুঁটি হলো নামাজ।» (বর্ণনায় আহমদ)

নামাজের ফজিলত

১- নামাজ, নামাজীর জন্য নূরস্বরূপ,«রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,«নামাজ হলো নূর।» (বর্ণনায় মুসলিম)

২- নামাজ গুনাহের কাফ্ফারা। ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيۡلِۚ إِنَّ ٱلۡحَسَنَٰتِ يُذۡهِبۡنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِۚ ذَٰلِكَ ذِكۡرَىٰ لِلذَّٰكِرِينَ ١١٤﴾

{আর তুমি নামাজ আদায় করো দিবসের দু»প্রান্তে এবং রাতের প্রথম অংশে। নিশ্চয়ই ভালকাজ মন্দকাজকে মিটিয়ে দেয়। এটি উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য উপদেশ।} [সূরা হুদ:১১৪]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, «তোমাদের কি মনে হয়, যদি কারো দরজার কাছে নদী থাকে যাতে সে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে, তাহলে কি তার শরীরে কোনো ময়লা থাকবে? তারা বলল, «তার গায়ে কোনো ময়লা থাকবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: পাঁচ ওয়াক্ত নামাজও একই রকম। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা পাপসমূহ মুছে দেন।» (বর্ণনায় তিরমিযী) (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

৩- নামাজ জান্নাতে প্রবেশের কারণ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রবীয়া ইবনে কাআবকে বলেছেন - যিনি জান্নাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথী হওয়ার আগ্রহ ব্যক্ত করেছে- তিনি তাকে বলেছেন,«তাহলে বেশি বেশি সিজদার মাধ্যমে তুমি আমাকে তোমার ব্যাপারে সাহায্য কর।» (বর্ণনায় তিরমিযী) (বর্ণনায় মুসলিম)

নামাজের হুকুম

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা অনুযায়ী ফরয।

১-কুরআন : আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ﴾

{আর তোমরা নামাজ আদায় করো, যাকাত দাও ও রুকুকারীদের সাথে রুকু করো} [সূরা আল বাকারা:৪৩]

২-সুন্নাহ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, «ইসলাম পাঁচটি বিষয়ের উপর নির্মিত: «এ সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। এবং সালাত আদায় করা, যাকাত প্রদান করা, বায়তুল্লাহর হজ্ব করা এবং রমজানের রোজা রাখা।» (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে তিনি বললেন,«প্রতিদিন পাঁচ নামাজ। প«রশ্নকারী বললেন,«এগুলোর বাইরে কি কোনো নামাজ আমার ওপর ফরয রয়েছে?? তিনি বললেন: না, তবে যদি নফল হিসেবে আদায় কর।» (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)



৩. ইজমা : রাত ও দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরয হওয়ার ব্যাপারে উম্মতে মুহাম্মদী ইজমা তথা ঐকমত্য পোষণ করেছে।

কার ওপর নামাজ ফরয?

প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন মুসলিম নারী-পুরুষের ওপর নামাজ ফরয।

বাচ্চাদের নামাজ

বাচ্চার বয়স সাত বছর হলে নামাজ পড়তে বলা হবে। উদ্দেশ্য হলো নামাজের অভ্যাস গড়ে তোলা। আর যখন দশ বছর বয়সে উপনীত হবে তখন প্রয়োজনে মৃদুভাবে প্রহারও করা হবে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,« তোমাদের বাচ্চাদের বয়স সাত বছর হলে তাদেরকে নামাজের নির্দেশ দাও, আর নামাজের ব্যাপারে তাদেরকে প্রহার করো যখন তারা দশ বছর বয়সে উপনীত হয়।(বর্ণনায় আবু দাউদ)

নামাজ পরিত্যাগকারীর হুকুম

১- যে ব্যক্তি নামাজ ফরয হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে নামাজপরিত্যাগ করে

এ-প্রকৃতির ব্যক্তি অজ্ঞ হলে তাকে শেখানো হবে। এদতসত্ত্বেও যদি সে অস্বীকার করে চলে তবে সে কাফের বলে গণ্য হবে। সে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুসলমানদের ইজমাকে অস্বীকারকারী বলে সাব্যস্ত হবে।

২- অলসতাবশত নামাজ পরিত্যাগকারী

অলসতাবশত ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ পরিত্যাগকারী ব্যক্তি কাফের। এ-ক্ষেত্রে মুসলিম সরকারের দায়িত্ব হবে এরূপ ব্যক্তিকে নামাজের প্রতি আহবান জানানো এবং তাকে তাওবা করতে বলা। যদি সে তাওবা করে তো ভালো, অন্যথায় তাকে মুরতাদ হিসেবে মৃত্যুদন্ড দেয়ার নির্দেশ রয়েছে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, «আমাদের মাঝে ও তাদের মাঝে যে অঙ্গীকার তা হলো নামাজ। অতঃপর যে ব্যক্তি নামাজ পরিত্যাগ করল সে কাফের

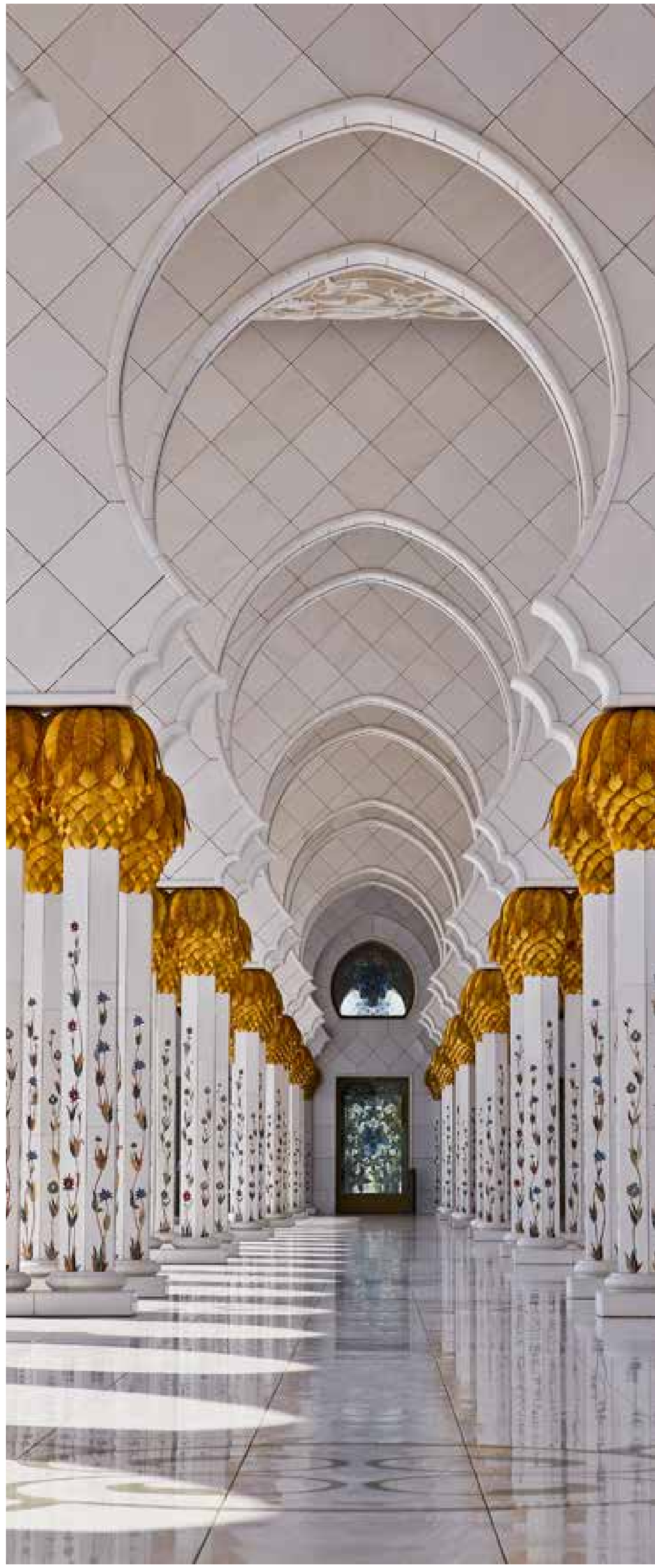
হয়ে গেল।« তিনি আরো বলেছেন, «কোনো ব্যক্তির ও কুফর-শিরকের মাঝে পার্থক্য হলো নামাজ পরিত্যাগ করা।» (বর্ণনায় মুসলিম)





নামাজ কাযা করা

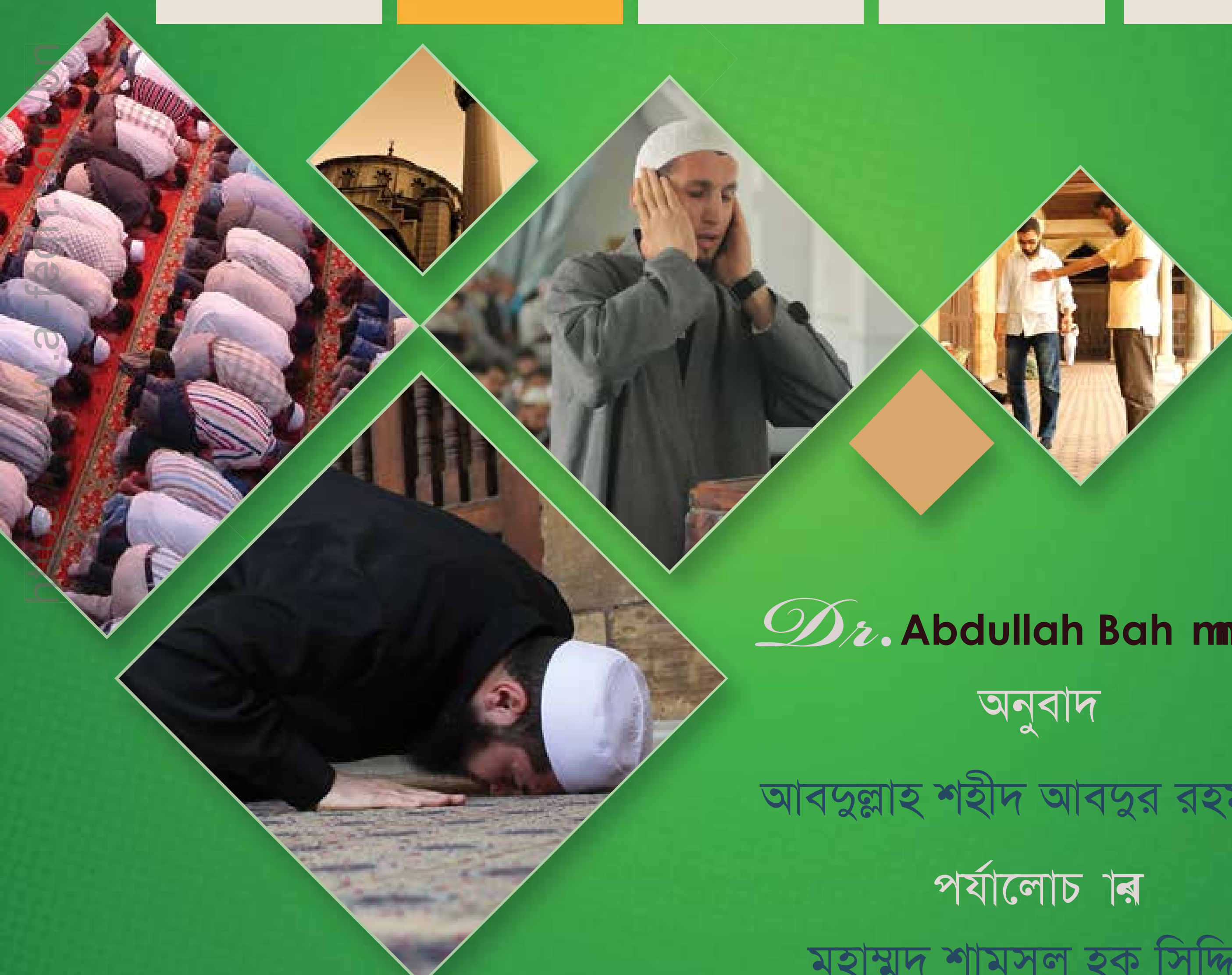
কাফের ব্যক্তি মুসলমান হলে তার অতীতের নামাজগুলো কাযা করতে হবে না। কেননা ইসলাম গ্রহণের অর্থ পূর্বের সকল গুনাহ মাফ হয়ে যাওয়া।



আলোকচিত্রে ইবাদত

সহজ সরল উপয়ে ইসলামের বিধি-বিধান শেখা

পবিত্রতা	নামাজ	রোজা	যাকাত	হজ্ব



Dr. Abdullah Bahmmam

অনুবাদ

আবদুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান

পর্যালোচনায়

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

আযান ও ইকামত



২

আযান ও ইকামত

সূচীপত্র

আযান
বিশেষ যিকরের মাধ্যমে নামাজের সময় হয়েছে বলে ঘোষণা দেয়া।

ইকামত
বিশেষ যিকরের মাধ্যমে নামাজ দাঁড়িয়েছে বলে ঘোষণা দেয়া।

আযান ও ইকামতের হুকুম

১- জামাতের সাথে নামাজজ আদায়ের ক্ষেত্রে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্য আযান ইকামত সুন্নতে মুআক্কাদা, নামাজ আদায়কারী মুসাফির হোক বা মুকিম; কেননা আযান ও ইকামত ইসলামের শাআয়ের বা নিদর্শনমালার মধ্যে দুটি নিদর্শন, তাই এ-দুটোকে বন্ধ করা বৈধ হবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, «যখন নামাজের সময় হবে তখন তোমাদের মধ্যে একজন যেন তোমাদের জন্য আযান দেয়। আর তোমাদের মধ্যে বয়সে যে বড় সে যেন ইমামতি করে।» (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

২- জামাত ব্যতীত একা নামাজ পড়ার ক্ষেত্রে আযান-ইকামত সুন্নত। উকবা ইবনে আমের রাযি. বলেন, «আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,«আল্লাহ তাআলা ওই মেষের রাখালকে দেখে আশ্চর্য হন যে পাহাড়ের চূড়ার একটি টিলায় নামাজের জন্য আযান দেয় ও নামাজ পড়ে। (এ-দৃশ্য দেখে আল্লাহ তাআলা বলেন, «তোমরা আমার এই বান্দার দিকে চেয়ে দেখ, সে আযান দেয়, নামাজ কায়েম করে এবং আমাকে ভয় পায়। আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম ও তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালাম।»। (বর্ণনায় নাসায়ী)

আযানের হিকমত

১- নামাজের ওয়াক্ত হয়েছে বলে ঘোষণা এবং নামাজ অনুষ্ঠানের স্থান বিষয়ে জানান দেয়া।

২- জামাতের সাথে নামাজ আদায়ের ব্যাপারে উৎসাহ দেয়া।

৩- যারা গাফেল তাদেরকে সজাগ করা এবং যারা ভুলে যায় তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া।

আযান কখন শরীয়তভুক্ত হয়েছে ও তার কারণ কি?

«আযান প্রথম হিজরীতে শরীয়তভুক্ত হয়েছে। আর এর কারণ হলো : নামাজের ওয়াক্ত প্রবেশ করেছে এ ব্যাপারে কোনো আলামত নির্ধারণের প্রয়োজন দেখা দিলে মুসলমানগণ পরস্পরে পরামর্শ করলেন। যখন রাত হলো, আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ স্বপ্নে দেখলেন যে, একব্যক্তি ঘন্টা বহন করে আছে। তিনি লোকটিকে বললেন, «তুমি কি এ ঘন্টাটি বিক্রি করবে?» লোকটি বলল, «তুমি এটা দিয়ে কি করবে?» আবদুল্লাহ বললেন, «নামাজের প্রতি আহবান জানাব।» লোকটি বলল,«আমি কি তোমাকে এর থেকেও উত্তম বিষয়ের কথা বলব না?» আবদুল্লাহ বললেন,«হ্বি বলবেন।» অতঃপর লোকটি তাকে আযান শেখালেন এরপর ইকামত শেখালেন। আবদুল্লাহ বলেন,«যখন সকাল হলো, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলাম, স্বপ্ন বিষয়ে তাঁকে খবর দিলাম। শুনে তিনি বললেন,«এটা সত্য স্বপ্ন। তুমি বেলালের সাথে দাঁড়াও, তাঁকে এ-দায়িত্ব অর্পন করো, কেননা সে তোমার চাইতে অধিক সুন্দর আওয়াজের অধিকারী।» (বর্ণনায় আবু দাউদ)

আযানের ফজিলত

১- আযানের আওয়াজ যাদের কাছে পৌঁছবে তাদের প্রত্যেকেই কিয়ামতের ময়দানে মুয়াজ্জিনের পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, «মুয়াজ্জিনের আওয়াজ যার কাছেই পৌঁছবে, হোক সে মানুষ, জিন অথবা অন্যকোনো জিনিস, সে কিয়ামতের ময়দানে মুয়াজ্জিনের পক্ষে সাক্ষ্য দেবে।» (বর্ণনায় বুখারী)

২- মানুষ যদি জানত এর মধ্যে কি ফজিলত রয়েছে, তবে তারা অবশ্যই এর জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হত। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, «মানুষ যদি জানত আযান ও প্রথম কাতারের মধ্যে কি ফজিলত রয়েছে আর তারা লটারির আশ্রয় নেয়া ছাড়া তা পেত না, তবে তারা এর জন্য অবশ্যই লটারির আশ্রয় নিত।» (বর্ণনায় বুখারী)



আযান বিশুদ্ধ হওয়ার শর্ত

১-আযানদাতাকে মুসলমান, পুরুষ ও সজ্ঞানব্যক্তি হতে হবে।

২-আযানের শব্দমালায় তরতীব তথা ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে।

৩- আযানের শব্দমালার উচ্চারণে নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখতে হবে, অর্থাৎ একবাক্য উচ্চারণের পর অন্যবাক্য উচ্চারণে অতিরিক্ত দেরি করা যাবে না।

৪- নামাযের ওয়াক্ত প্রবেশের পর আযান দিতে হবে।

আযানের সুন্নত

১- কেবলামুখী হয়ে আযান দেয়া।

২- ছোট-বড় উভয় নাপাকি থেকে আযানদাতাকে পবিত্র থাকা।

৩- হাইয়া আলাস্সালাহ ও হাইয়া আলাল ফালাহ বলার সময় ডানে ও বামে ফেরা।

৫- মুয়াযি্যনের দুই কানে দুই তর্জনী আঙ্গুল রাখা।

৬- মুয়াযি্যনকে সুন্দর আওয়াজসম্পন্ন হওয়া।

৭- সুর দিয়ে ধীরস্থিরতাসহ আযান দেয়া।

আযান ও ইকামত প্রদানের পদ্ধতি

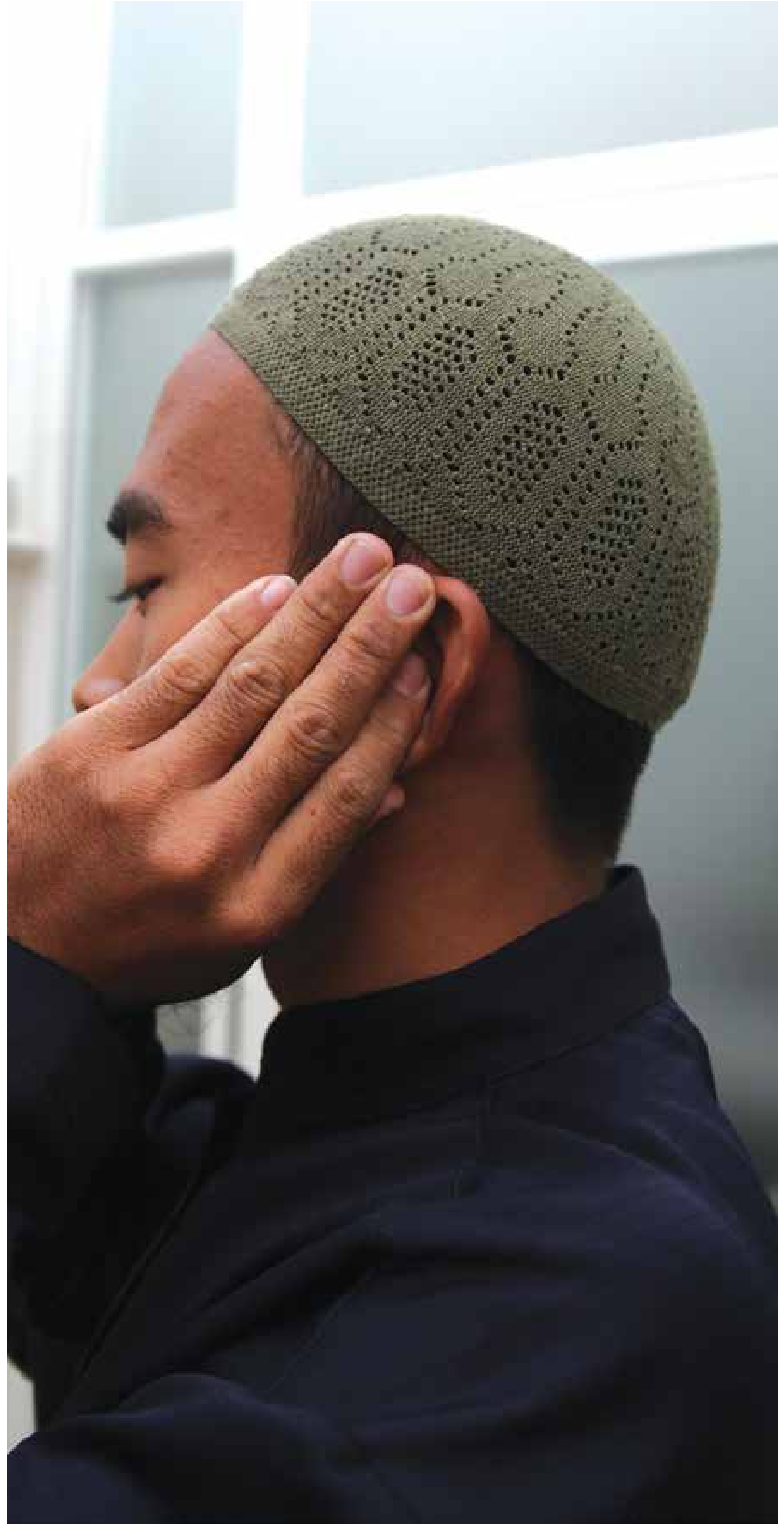
আযান প্রদানের পদ্ধতি :

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حَيَّ على الصلاة، حَيَّ على الصلاة، حَيَّ على الفلاح، حَيَّ على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله

(বর্ণনায় মুসলিম)

ইকামত প্রদানের পদ্ধতি :

الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة، حَيَّ على الفلاح، حَيَّ على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله



আযান শ্রবণকারীর ক্ষেত্রে যা মুস্তাহাব

১- মুয়াজ্জিন যা বলে তা বলা, তবে হাইয়া আলাস্সালাহ এবং হাইয়া আলাল ফালাহ বলার সময় لا حَوْل ولا قُوَّة إِلا بالله বলা। (বর্ণনায় বুখারী)

২- আযানের পর বলা :

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِمُحَمَّد صلى الله عليه وسلمٍ رَسُولًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا.

«আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তাঁর কোনো শরীক নেই। আর মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। রব হিসেবে আল্লাহর প্রতি, রাসূল হিসেবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি এবং দীন হিসেবে ইসলামের প্রতি আমি সন্তুষ্টচিত্ত।» (বর্ণনায় মুসলিম)

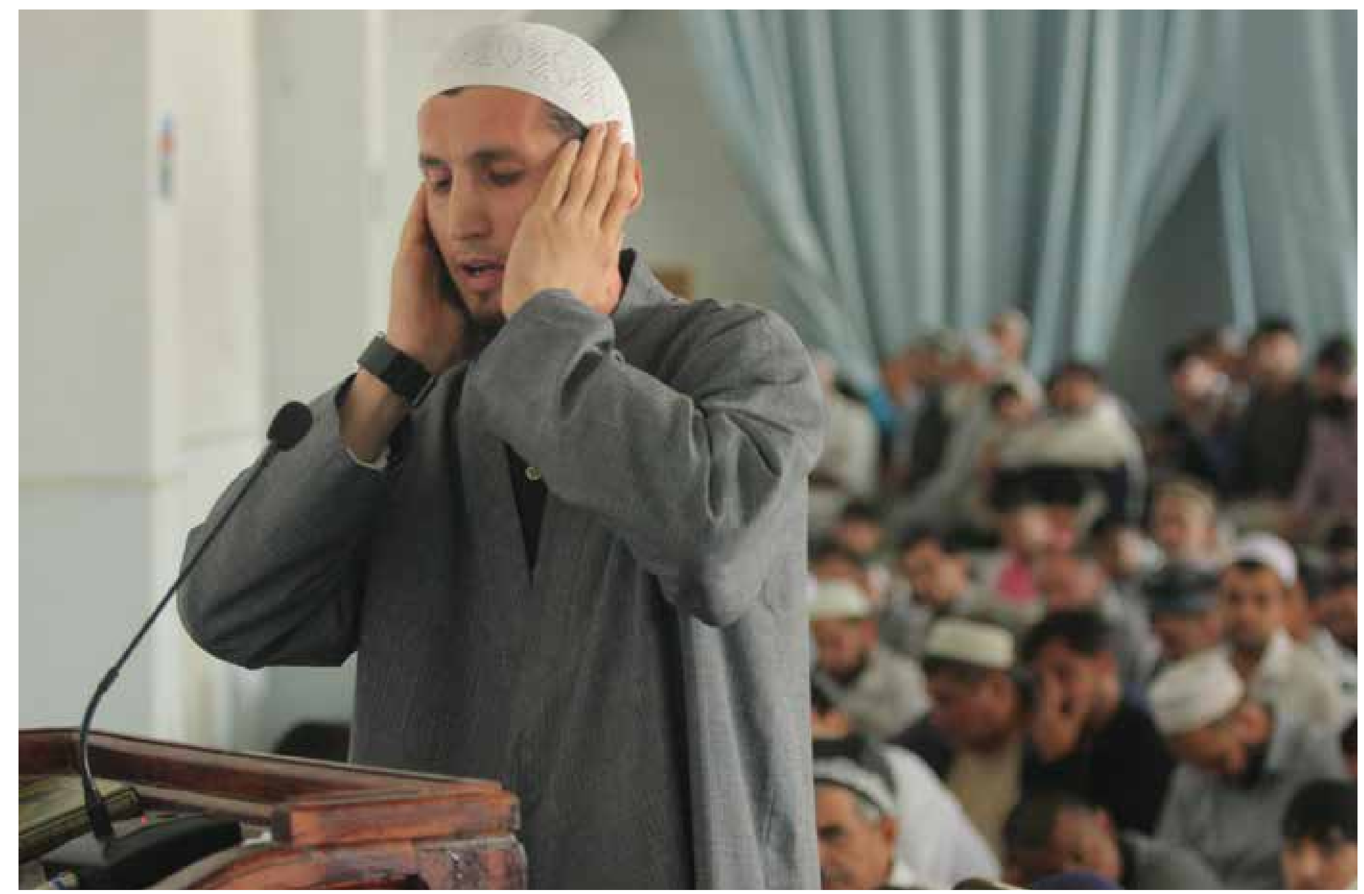
৩- আযানের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দরুদ পড়া। এরপর বলা :

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ.

«হে আল্লাহ, যিনি এই পরিপূর্ণ আহবান এবং কায়েমতব্য নামাজের রব! আপনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ওয়াসিলা তথা জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান ও মর্যাদা দান করুন এবং আপনি তাঁকে প্রেরণ করুন প্রশংসিত স্থানে যার ওয়াদা আপনি তাঁকে দিয়েছেন।» (বর্ণনায় আবু দাউদ)

৪- আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে নিজের জন্য দুআ করা; কেননা এসময় দুআ ফিরিয়ে দেয়া হয় না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ের দুআ ফিরিয়ে দেয়া হয় না।» (বর্ণনায় আহমদ)



আযান ও ইকমতের কিছু আহকাম

১. দুই নামাজ একসাথে জমা করে পড়লে আযান হবে একটা আর ইকামত হবে প্রতি নামাজের জন্য আলাদা আলাদা।

২. ইকামতের পর যদি নামাজ শুরু হতে দেরি হয় তবে পুনরায় ইকামত দেয়ার প্রয়োজন নেই।

৩. মুয়াযিনের উচিত আযানের শব্দমালা উচ্চারণে ভুল না করা। যেমন :

- «আল্লাহু আকবার»এর জায়গায় (آلله أكبر؟)«আ-আল্লাহু আকবার» বলা। যার অর্থ হবে, «আল্লাহ কি সবচেয়ে বড়?»
- الله أكبار তথা কে লম্বা করে উচ্চারণ করা।
- الله وأكبر (আল্লাহু ওয়াকবার) বলা।

৪. নামাজের ইকামত হয়ে গেলে কোনো নফল নামাজ শুরু করা বৈধ নয়। আর যদি ইতঃমধ্যেই নফল নামাজ শুরু করে দিয়ে থাকে তাহলে যদি সামান্য অংশ বাকি থাকে তবে পরিপূর্ণ করে নেবে। এর অন্যথা হলে সালাম ব্যতীতই নামাজ ছেড়ে দিয়ে ইমামের সাথে ফরয নামাজে ইকতেদা করবে।

৫. ভালো-মন্দ যাচাই করতে পারে এমন শিশুর আযান শুদ্ধ হবে।

৬- ঘুম অথবা ভুলে যাওয়ার কারণে কাযা হয়ে যাওয়া নামাজ আদায়ের জন্য আযান-ইকামত শুদ্ধ। একবার সাহাবায়ে কেরাম নিদ্রারত অবস্থায় সূর্য ওঠে গেলে «রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিলাল রাযি. কে আযান দিতে বলেন। এরপর সবাই অজু করেন ও দু»রাকাত ফজরের সুন্নত আদায় করেন। এরপর তিনি বিলাল রাযি. কে ইকামত দেয়ার নির্দেশ দেন এবং সাহাবায়ে কেরামদেরকে নিয়ে ফজরের ফরয নামাজ আদায় করেন।» (বর্ণনায় আবু দাউদ)



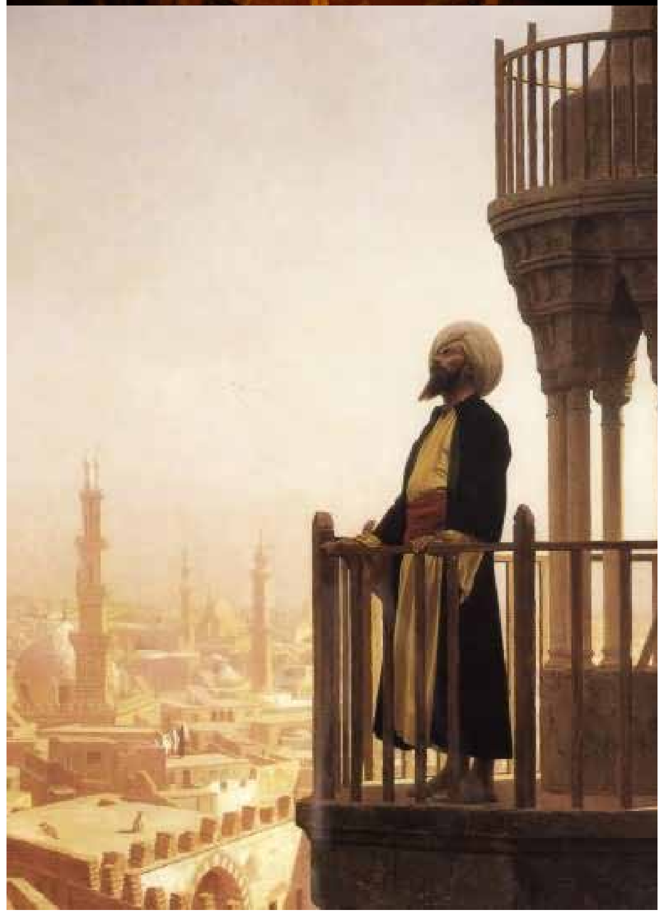
> ### যা উচিত নয়
>
> ১- এমনভাবে অতিরিক্ত সুর সংযোজন অথবা গানের সুরে আযান দেয়া উচিত নয় যার ফলে অক্ষর ও জের-যবর-পেশ ইত্যাদিতে কমবেশ হয়ে যায়।
>
> ২- আযানের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর উঁচু স্বরে দরুদ পড়া।
>
> ৩- «কাদ কামিতিস্সালাত» শোনার সময় «আকামাহাল্লাহু ওয়া আদামা» (আল্লাহ তা কায়েম দায়েম রাখুন) বলা উচিত নয়। বরং এ-ক্ষেত্রে সরাসরি «কাদকাতিস্সালাত»-ই বলতে হবে।

৭- যে ব্যক্তি আযানের সময় মসজিদে থাকবে সে আযানের পর ওযর ব্যতীত মসজিদ থেকে বের হবে না। আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, «রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে এই বলে নির্দেশ দিয়েছেন যে, যখন তোমরা মসজিদে থাকবে আর নামাজের আযান দেয়া হবে, তখন তোমাদের কেউ যেন নামাজ আদায় না করে মসজিদ থেকে বের না হয়।» (বর্ণনায় আহমদ) ফজরের আযান

১- ফজরের আযানের সাথে, (الصلاة خيرمن النوم)দুইবার বলতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,«...যদি ফজরের নামাজ হয়, তবে (আযানের সময়) বলবে

২- الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ





আলোকচিত্রে ইবাদত

সহজ সরল উপয়ে ইসলামের বিধি-বিধান শেখা

পবিত্রতা | নামাজ | রোজা | যাকাত | হজ্ব





Dr. Abdullah Bahmmam

অনুবাদ

আবদুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান

পর্যালোচনায়

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

নামাজ শুদ্ধ হওয়ার শর্ত

৩ নামাজ শুদ্ধ হওয়ার শর্ত

সূচীপত্র

প্রথমত: নামাজের ওয়াক্ত হওয়া

ফরয নামাজের সুনির্দিষ্ট সময় রয়েছে, যার আগে বা পরে নামাজ আদায় করলে তা শুদ্ধ হয় না। ইরশাদ হয়েছে :

﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا﴾

{নিশ্চয় নামাজ মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরয।} [সূরা আন-নিসা:১০৩]

নামাজের সময়

১. ফজরের নামাজের সময় :

সুবেহ সাদেক- র্অথাৎ পূর্বদিগন্তে যে শুভ্রতা দেখা যায়- থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত।

২. যোহরের সময় :

সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে প্রতিটি জিনিসের ছায়া তার দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত।

৩. আসরের সময় :

যোহরের সময় শেষ হওয়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

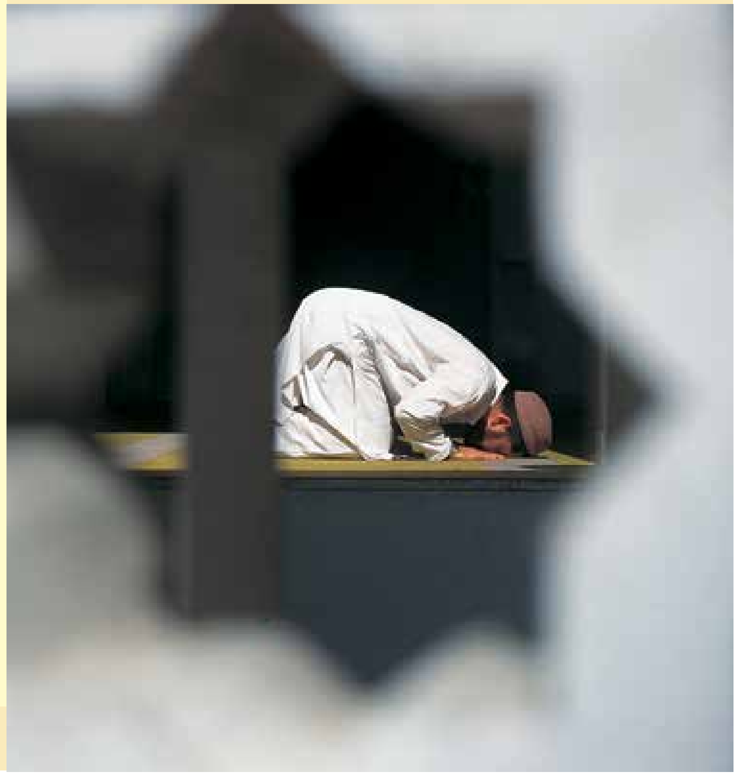
৪. মাগরিবের সময় :

সূর্য অস্ত যাওয়ার পর থেকে শফকে আহমার শেষ হওয়া পর্যন্ত। শফকে আহমার হলো সূর্যাস্ত যাওয়ার সময় পশ্চিমাকাশে যে লাল আভা থাকে তা।

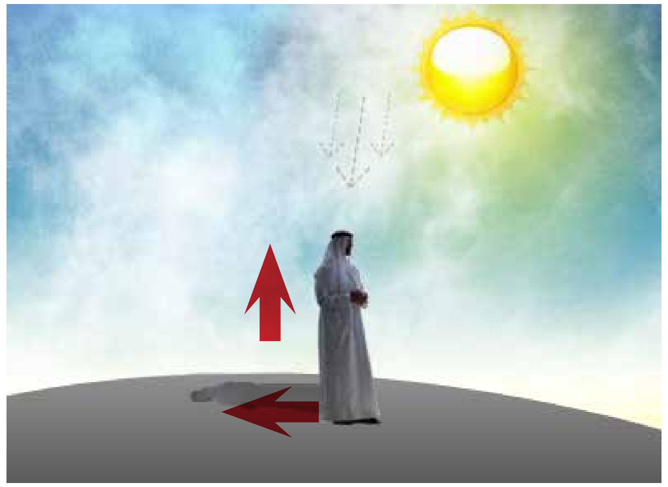
৫. এশার সময়:

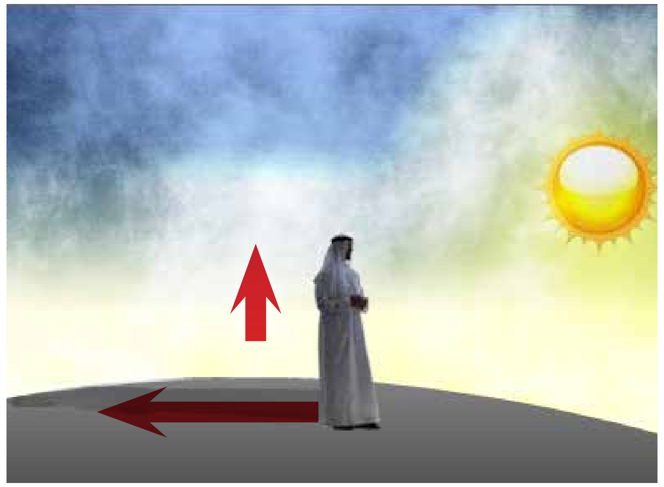
মাগরিবের সময় শেষ হওয়ার পর থেকে সুবেহ সাদেক উদয় হওয়া পর্যন্ত। ইমামদের কারো কারো কাছে মধ্য রাতে এশার সময় শেষ হয়ে যায়। তাদের দলিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস,«এশার নামাজের সময় মধ্যরাত পর্যন্ত।» (বর্ণনায় মুসলিম)

বর্তমানযুগে ক্যালেন্ডারের মাধ্যমে নামাজের সময় খুব সহজেই নির্ণয় করা সম্ভব।




ফজরের নামাজ


যোহরের নামাজ


আসরের নামাজ


মাগরিবের নামাজ


এশার নামাজ

“

কিছু ফায়েদা

- যে ব্যক্তি নামাজের ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পূর্বে মাত্র এক রাকাত নামাজ পেল সে ওই নামাজ পেয়ে গেল। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, «যে ব্যক্তি নামাজের এক রাকাত পেল সে ওই নামাজ পেয়ে গেল।» (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)
- যদি কারও ঘুমের কারণে নামাজ ছুটে গিয়ে থাকে অথবা মনে না থাকার কারণে নামাজ ছুটে গিয়ে থাকে, তবে জাগ্রত হওয়া ও মনে পড়ার সাথে সাথে তা আদায় করে নিতে হবে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, «যে ব্যক্তি কোনো নামাজ ভুলে গেল, স্মরণ হলে সে যেন তা আদায় করে নেয়।

«আর এটাই হলো তার কাফ্ফারা।» (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

”

দ্বিতীয়ত: অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জন

ছোট অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জন:

আর এটা সম্পন্ন হয় অজুর মাধ্যমে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, «যখন কারও অজু থাকে না, আল্লাহ তার নামাজ কবুল করেন না যতক্ষণ না সে অজু করে নেয়।» (বর্ণনায় বুখারী)

বড় অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জন:

আর এটা সম্পন্ন হয় গোসলের মাধ্যমে। আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَإِن كُنتُمۡ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُواْۚ﴾

{আর যদি তোমরা জুনুবী হও তবে পবিত্রতা অর্জন করো।} [সূরা আল মায়িদা:৬]

নামাজরত অবস্থায় যার অজু নেই বলে স্মরণ হলো, অথবা নামাজ পড়াবস্থায় অজু ছুটে গেল, এমতাবস্থায় নামাজ বাতিল বলে গণ্য হবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উচিত হবে, ছালাম দেয়া ব্যতীতই অজু করার জন্য মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়া। কেননা নামাজ বিঘ্নিত হয়েছে এবং শেষ হয়নি। আর সালাম তো হলো নামাজ সম্পন্ন করার কাজ।



নামাজ ও নাজাসাত

যে ব্যক্তি না জেনে নাজাসাতসহ নামাজ পড়ল, অথবা নাজাসাতের কথা ভুলে গেল, তবে তার নামাজ শুদ্ধ হবে। হাদীসে এসেছে, «রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা নামাজ আদায় করে তাঁর জুতা খুলে ফেললেন। উপস্থিত লোকজনও তাদের জুতা খুলে ফেলল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করে বললেন, «তোমরা জুতা খুলে ফেললে কেন? উত্তরে তারা বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা আপনাকে খুলে ফেলতে দেখলাম, তাই খুলে ফেললাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, «জিব্রীল আমার কাছে এসেছেন এবং খবর দিয়েছেন যে এ-দুটোয় নাজাসাত রয়েছে। তাই যদি তোমাদের কেউ মসজিদে আসে তাহলে যেন সে তার জুতা উল্টিয়ে দেখে নেয়। যদি তাতে কোনো নাজাসাত দেখে সে যেন তা জমিনে মুছে নেয় এবং সে দুটোতেই নামাজ আদায় করে।» (বর্ণনায় আবু দাউদ)

নামাজরত অবস্থায় যে ব্যক্তি জানতে পারল যে তার গায়ে অথবা কাপড়ে নাজাসাত রয়েছে, তার উচিত হবে তা দূর করা এবং নামাজ চালিয়ে যাওয়া। ইতঃপূর্বে আদায়কৃত নামাজের অংশের উপর ভিত্তি করেই পরবর্তী অংশ আদায় করা। আর যদি নাজাসাত দূর করতে সক্ষম না হয়, তবে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে।

তৃতীয়ত: কাপড়, শরীর ও জায়গা পাক হওয়া

১. কাপড় পাক;

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرۡ ٤﴾

{আর তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র কর।} [সূরা আল মুদ্দাসসির:৪]





কাপড় পাক হওয়া



শরীর পাক হওয়া



জায়গা পাক হওয়া

২. শরীর পাক:

হাদীসের এসেছে, «রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা দুটি কবরের কাছ দিয়ে গেলেন। তিনি বললেন, «এ-দুই কবরবাসীর আযাব হচ্ছে। এদেরকে বড় কোনো গুনাহর কারণে আযাব দেয়া হচ্ছে না। এই লোক তো পেশাব থেকে দূরত্ব বজায় রাখত না।» (বর্ণনায় আবু দাউদ)

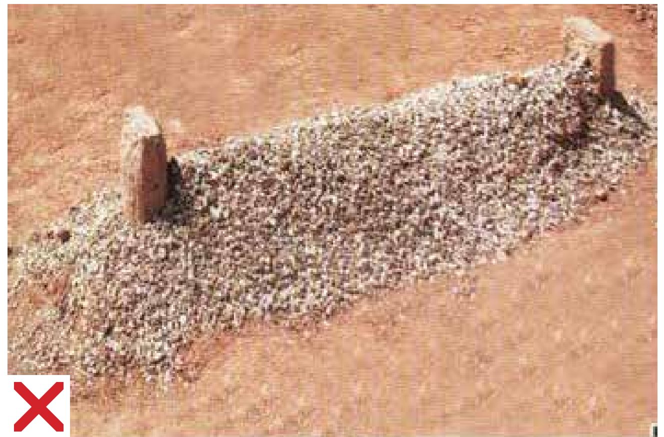
৩. জায়গা পাক;

এর প্রমাণ মসজিদে পেশাবকারী ব্যক্তি-বিষয়ক হাদীস যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, «তাকে ছেড়ে দাও, আর তার পেশাবের ওপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও।» (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

সমগ্র জমিনই মসজিদ

সমগ্র জমিনই মসজিদ। অতএব নাপাকিযুক্ত না থাকলে যেকোনো জায়গায় নামাজ আদায় করা শুদ্ধ। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, «আমার জন্য জমিনকে মসজিদ ও পবিত্র বানিয়ে দেয়া হয়েছে। তাই আমার উম্মতের মধ্যে কোনো ব্যক্তি যখন নামাজের ওয়াক্ত পাবে সে যেন তা আদায় করে নেয়।» (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)





কবরস্থানে নামাজ পড়া



উটের আস্তাবলে নামাজ পড়া



গোসলখানায় নামাজ পড়া

ব্যতিক্রম হলো কেবল ওইসব জায়গা যার ব্যাপারে হাদীসে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, যেমন কবরস্থানে নামাজ। গোসলখানায় নামাজ। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, «সমগ্র জমিনই মসজিদ, তবে কবরস্থান ও গোসলখানা ব্যতীত।» (বর্ণনায় তিরমিযী)

উটের আস্তাবলে নামাজ পড়া বৈধ নয়। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«তোমরা উটের আস্তাবলে নামাজ পড়ো না।» উটের আস্তাবল হলো, উট যেখানে রাতযাপন করে ও আশ্রয় নেয়।»

(বর্ণনায় তিরমিযী)

চতুর্থত: সতর ঢাকা

পুরুষের সতর হলো নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত।



নারীর জন্য নামাজে যা খোলা রাখা বৈধ

পুরুষের সতরের সীমানা

কাঁধ ঢাকা

পুরুষ এমন পোশাক পরবে যা দুই বাহু ও ঘার ঢেকে রাখবে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, «তোমাদের কেউ এমন এক কাপড়ে নামাজ পড়বে না যা তার দুই কাঁধকে খালি রাখে।» (বর্ণনায় তিরমিযী)



খোলা কাঁধে নামাজ আদায়

পঞ্চমত: কেবলামুখী হওয়া

কেবলা হলো পবিত্র কাবা।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ﴾

{সুতরাং তোমার চেহারা মাসজিদুল হারামের দিকে ফিরাও এবং তোমরা যেখানেই থাক, তার দিকেই তোমাদের চেহারা ফিরাও।} [সূরা আল বাকারা:১৪৪]

কেবলার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো নজরে রাখা আবশ্যক:

১- যে ব্যক্তি মসজিদুল হারামের ভিতরে নামাজ পড়বে তাকে সরাসরি কাবাঘরের দিকে মুখ করে দাঁড়াতে হবে। আর যে ব্যক্তি কাবাঘর থেকে দূরে নামাজ পড়বে, কাবাঘর যে দিকে রয়েছে সেদিকে মুখ করে দাঁড়ালেই চলবে; কেননা এ অবস্থায় সরাসরি কাবাঘরের দিকে মুখ করে দাঁড়ানো হয়তো সম্ভব হবে না। এ জন্যেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া



যে ব্যক্তি মাসজিদুল হারামের ভেতরে নামাজ আদায় করবে

সাল্লাম বলেছেন «পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝখানের সবটুকুই কেবলা» (বর্ণনায় তিরমিযী) {আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বলা যায়, উত্তর ও দক্ষিণের মাঝখানের সবটুকুই কেবলা}

কোনো যানবাহনে আরোহী ব্যক্তির কেবলা হলো যেদিকে সে গমন করছে তা। হাদীসে এসেছে, «রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাহনের ওপর নামাজ পড়তেন যেদিকে বাহন যেত সেদিকেই মুখ করে। তিনি বাহনের ওপর বেতরের নামাজও আদায় করতেন, তবে ফরয নামাজ পড়তেন না ।». (বর্ণনায় আবু দাউদ)

কেবলার দিক অজ্ঞাত থাকলে কি করণীয়?

কেবলার দিক কোনটি তা যদি জানা না থাকে, সে যদি কোনো বিল্ডিং এর ভিতরে থাকে অথবা নিকটে কোনো মানুষ পায়, তবে তার উচিত হবে জিজ্ঞাসা করে জানার চেষ্টা করা। অথবা মসজিদের মেহরাব, কম্পাস, চাঁদ সূর্যের অবস্থান ইত্যাদির মাধ্যমে কিবলা নির্ণয়ের চেষ্টা করা। পরিশেষে ব্যর্থ হলে যান্নে গালেব তথা প্রাধান্যপ্রাপ্ত ধারণার ওপর নির্ভর করে নামাজ আদায় করে নেয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ﴾ .

{অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় করো ।} [সূরা আত-তাগাবুন:১৬]

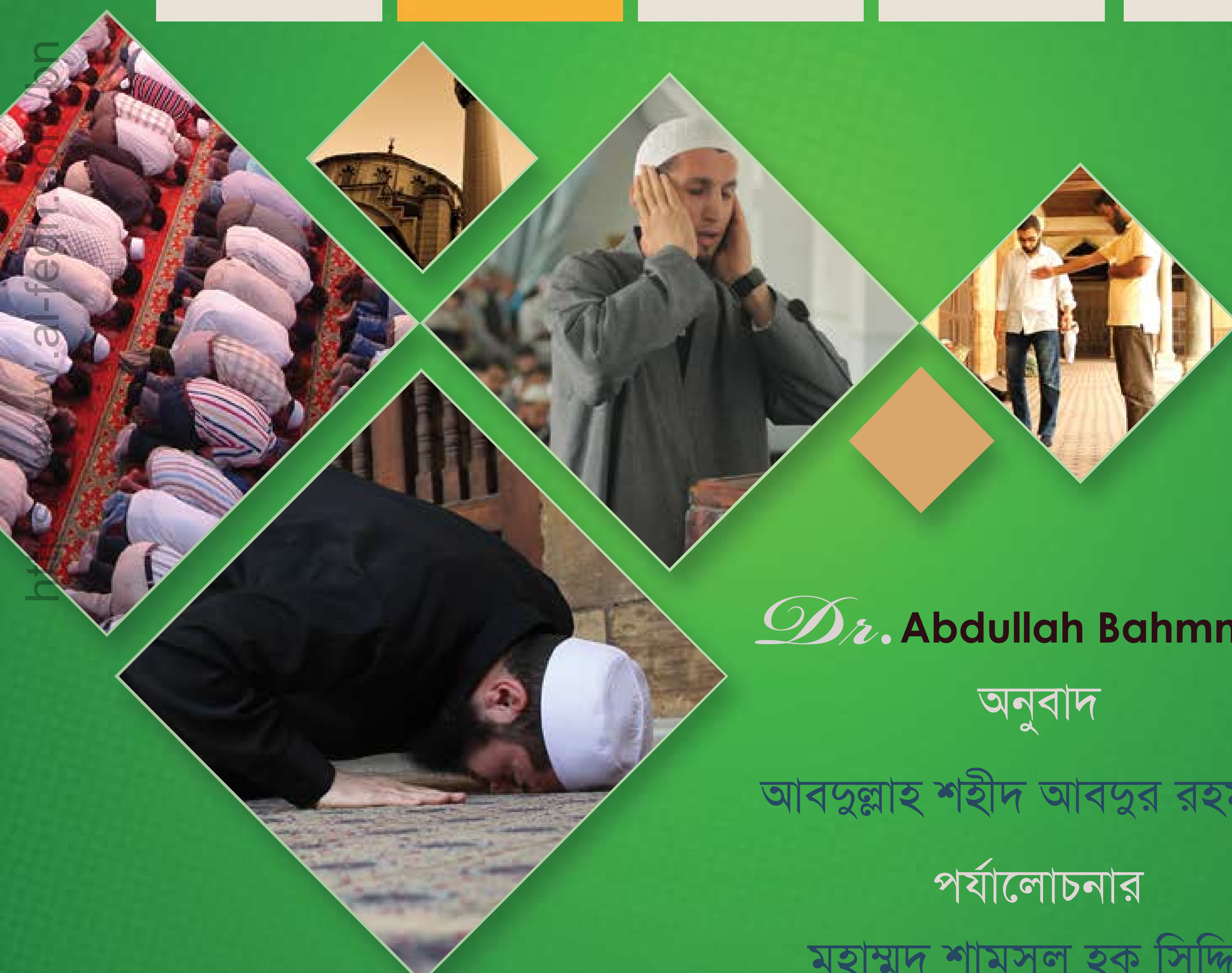


যে ব্যক্তি কাবাঘর থেকে দূরে নামাজ আদায় করবে

আলোকচিত্রে ইবাদত

সহজ সরল উপয়ে ইসলামের বিধি-বিধান শেখা

পবিত্রতা | নামাজ | রোজা | যাকাত | হজ্ব



Dr. Abdullah Bahmmam

অনুবাদ

আবদুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান

পর্যালোচনার

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

নামাজের আদব

নামাজের আদব



নামাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বড় একটি ইবাদত। নামাজে একজন মুসলমান তার শরীর ও মন আল্লাহমুখী করে ঐকান্তিকভাবে দাঁড়ায়। তাই নামাজের পূর্বে শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতি প্রয়োজন, যাতে নামাজের জন্য সম্পূর্ণভাবে ফারেগ হয়ে একাগ্রচিত্তে বিশুদ্ধভাবে তা আদায় করা সম্ভব হয়। তাই একজন নামাজীর নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোর প্রতি নজর রাখা আবশ্যক:

১- ইখলাস

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:
﴿وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ ٥﴾

যেকোনো আমলে ইখলাস থাকা অত্যন্ত জরুরি; কেননা যে আমলে ইখলাস নেই, যে আমলে রিয়া অথবা সুনাম কুড়ানোর ভাব মিশ্রিত, সে আমল আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। যে আমলে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা হয়, সে আমলও আল্লাহর কাছে প্রত্যাখ্যাত।

২- উত্তমরূপে অজু করা

অর্থাৎ সুনিপুণভাবে ও পূর্ণাঙ্গরূপে অজু করা।

আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, «আমি কি তোমাদেরকে এমন বিষয়ের দিকনির্দেশনা দিব না যার দ্বারা আল্লাহ তাআলা গুনাহ মাফ করবেন এবং দরজা বুলন্দ করবেন? তারা বললেন,« অবশ্যই দেবেন হে আল্লাহর রাসূল!। তিনি বললেন, কষ্ট সত্ত্বেও উত্তমরূপে অজু করা, মসজিদ পানে বেশি বেশি পদচারণা এবং এক নামাজের পর অন্য নামাজের অপেক্ষায় থাকা। এটাই হলো রিবাত, আল্লাহর ইবাদতে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখা।» (বর্ণনায় মুসলিম)

আল্লাহর ইবাদতে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখা।»

সূচীপত্র



৩- সকাল-সকাল নামাজে যাওয়া

অর্থাৎ নামাজের অপেক্ষায় থাকার ফজিলত ধরার উদ্দেশে সকাল-সকাল নামাজের জন্যে বের হয়ে যাওয়া। আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, «তোমাদের কেউ যতক্ষণ পর্যন্ত নামাজের অপেক্ষায় থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে নামাজেই থাকে।» (বর্ণনায় বুখারী)

৪ - যিকর ও দুআ

ঘর থেকে বের হওয়ার সময় দুয়া পড়া ও বলা:

باسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أَضِل أو أُضل، أو أزِل أو أُزَل، أو أظلِم أو أُظْلَم، أو أجهَل أو يُجهْل عليَّ

«বিসমিল্লাহ, আমি আল্লাহর ওপর ভরসা করেছি, সকল কৌশল ও শক্তি কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি দিকভ্রান্ত হওয়া অথবা অন্য কর্তৃক পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে। পদস্খলন ঘটা অথবা পদস্খলিত হওয়া থেকে। কারও ওপর জুলুম করা অথবা কারো দ্বারা নির্যাতিত হওয়া থেকে। কারও সাথে মূর্খতাপূর্ণ আচরণ অথবা অন্যের মূর্খতাজনিত আচরণে আক্রান্ত হওয়া থেকে।» (বর্ণনায় আবু দাউদ)

মসজিদে যাওয়ার পথে আল্লাহ তাআলার যিকর করা ও বলা:

اللهم اجعل في قلبي نوراً، وفي لساني نوراً، واجعل في سمعي نوراً، واجعل في بصري نوراً، واجعل من خلفي نوراً، ومن أمامي نوراً، واجعل من فوقي نوراً، ومن تحتي نوراً، اللهم أعطني نوراً

«হে আল্লাহ, আপনি আমার অন্তরে নূর রাখুন। আমার জিহ্বায় নূর রাখুন। আমার কানে নূর রাখুন। আমার চোখে নূর রাখুন। আমার পিছনে নূর রাখুন। আমার সামনে নূর রাখুন। আমার ওপরে নূর রাখুন। আমার নিচে নূর রাখুন। হে আল্লাহ আপনি আমাকে নূর দিন।» (বর্ণনায় মুসলিম)

৫- ধীরস্থিরতা ও ভাবগাম্ভীর্য বজায় রেখে নামাজে গমন করা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, «যখন তোমরা ইকামত শুনবে তখন নামাজের দিকে হেঁটে যাও। আর তোমরা ধীরস্থিরতা ও গাম্ভীর্যতা অবলম্বন করে চলো, দৌড়ে চলো না। অতঃপর নামাজের যেটুকু পাও আদায় করো, আর যেটুকু ছুটে যায় তা নিজেরা পূর্ণ করে নাও।» (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

৬- মসজিদে প্রবেশ করা ও বের হওয়ার সময় দুআ পড়া

মসজিদে প্রবেশের সময় বলবে:

أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ، بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك

«আমি মহান আল্লাহ তাআলার, তাঁর সম্মানিত চেহারার, তাঁর অনাদিকাল থেকে চলে আসা আধিপত্যের আশ্রয় চাচ্ছি অভিশপ্ত শয়তান থেকে।»

«আল্লাহর নামে শুরু করছি, আর সালাত ও সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর।

«হে আল্লাহ আপনি আমার জন্য রহমতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দিন।» (বর্ণনায় আবু দাউদ)

আর মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় বলবে:

بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم

«আল্লাহর নামে শুরু করছি, আর সালাত ও সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর। হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে আপনার অনুগ্রহ কামনা করছি। হে আল্লাহ, আপনি আমাকে অভিশপ্ত শয়তান থেকে বাঁচান।»

৭- দু রাকাত নামাজ পড়ার পূর্বে না বসা

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, «যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে সে যেন বসার পূর্বে দু রাকাত নামাজ পড়ে নেয়।» (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

৮- হাতের আঙ্গুল পরস্পর বিজড়িত করা থেকে বিরত থাকা

«হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, «যখন তোমাদের কেউ অজু করবে এবং তার অজু সুন্দরভাবে সম্পন্ন করবে, অতঃপর মসজিদে গমনের নিয়তে বের হবে, সে যেন তার আঙ্গুল পরস্পরে বিজড়িত না করে; কেননা সে নামাজেই রয়েছে। (বর্ণনায় আবু দাউদ)

৯- যিকর ও দুআয় মশগুল থাকা

নামাজের জন্য অপেক্ষার সময় যিকর-দুআ, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদিতে মশগুল থাকা। অন্য মুসল্লীদেরকে বিরক্ত না করা।

১০- নামাজে খুশুখুজু

খুশুখুজু হলো নামাজের মজ্জা। নামাজের রুহ। আর খুশুখুজুবিহীন নামাজ হলো আত্মাহীন মৃতব্যক্তির ন্যায়। ইবনে রজব রহ. বলেছেন: খুশু হলো: হৃদয়ের কোমলতা, বিগলিত অবস্থা, ধীরস্থিরতা, আনুগত্য, ভঙ্গুর অবস্থা ও স্খলন। অতঃপর যখন অন্তর খুশুপূর্ণ হবে তখন শরীরের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ খুশুপূর্ণ হবে; কেননা তা অন্তরের অনুগামী। (ইবনে রাজব, আল খুশু) অতএব খুশুর স্থল হলো অন্তর। আর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হলো অন্তরের মুখপাত্র।

১১- নামাজের সকল অংশে সুন্নতে রাসূলের অনুসরণ

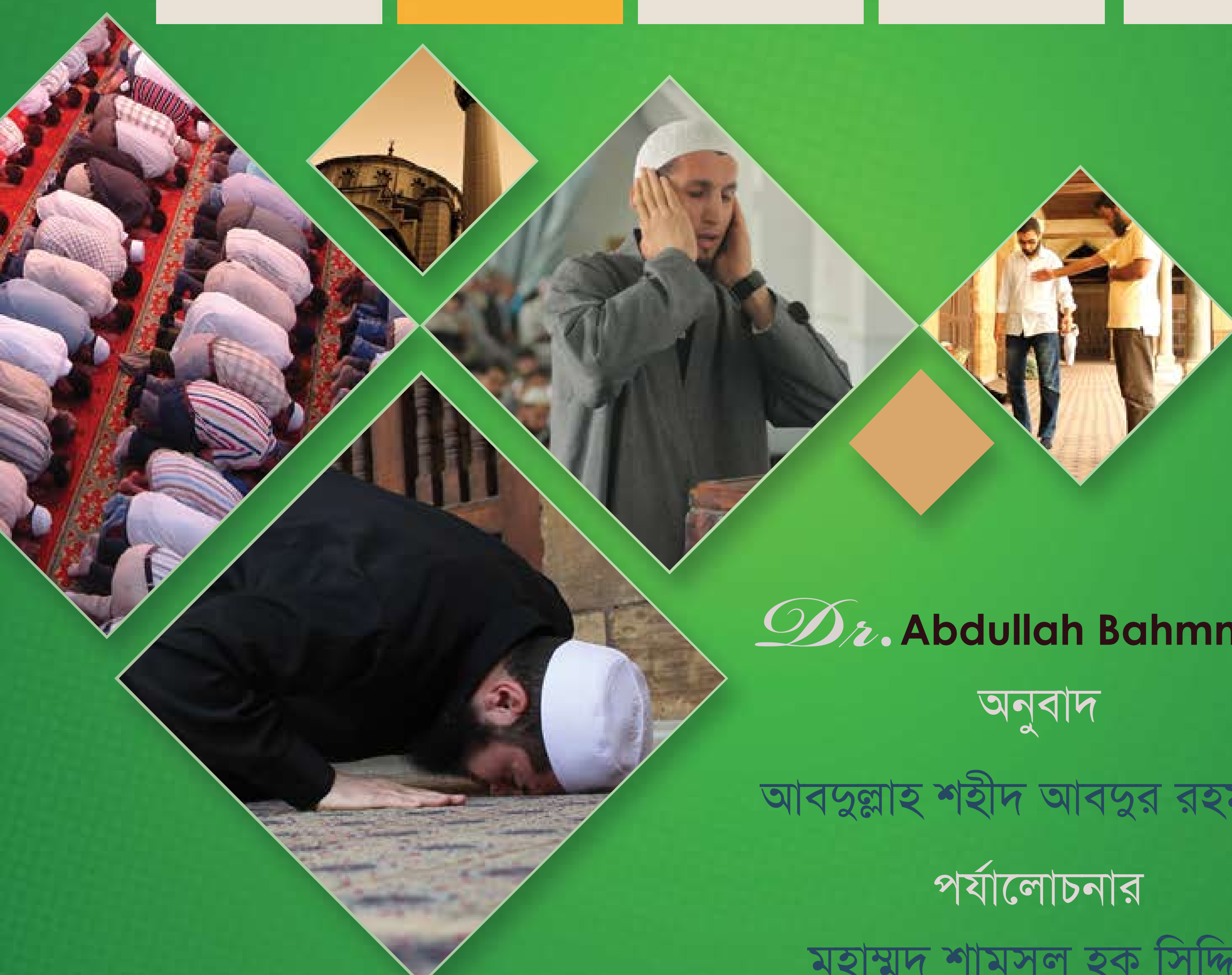
কেননা নামাজ হলো ইবাদত। আর ইবাদতে সুন্নতে রাসূলের অনুসরণ অত্যাবশ্যকীয়। অতএব নামাজে এমনকিছু বলা বা করা যাবে না, যা সুন্নত বহির্ভূত। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, «তোমরা নামাজ পড়ো যেভাবে আমাকে নামাজ পড়তে দেখেছ।» (বর্ণনায় বুখারী)



আলোকচিত্রে ইবাদত

সহজ সরল উপয়ে ইসলামের বিধি-বিধান শেখা

পবিত্রতা	নামাজ	রোজা	যাকাত	হজ্ব



Dr. Abdullah Bahmmam

অনুবাদ

আবদুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান

পর্যালোচনার

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

মুসল্লীর সুতরা

৫



মুসল্লীর সুতরা

মুসল্লীর সুতরা
যা মুসল্লী ও তার সামনে দিয়ে গমনকারীর মাঝে রাখা হয়

সুতরার শরীয়তসিদ্ধতা

মুকীম ও মুসাফির উভয়ের ক্ষেত্রে সুতরা রাখা শরীয়তসিদ্ধ। ফরয ও নফল সকল নামাজে, হোক তা মসজিদের ভিতরে অথবা বাইরে; হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,«যখন তোমাদের কেউ নামাজ পড়ে সে যেন সুতরা সামনে রেখে নামাজ পড়ে এবং এর কাছাকাছি দাঁড়ায়।» (বর্ণনায় আবু দাউদ)

ওয়াহব রাযি. বলেন, «রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিনায় আমাদের ইমামতি করলেন। তিনি তাঁর একটি নাতিদীর্ঘ কাঠের লাঠি সামনে গেড়ে নিলেন। এরপর আমাদের নিয়ে দু রাকাত নামাজ পড়লেন।» (বর্ণনায় আহমদ)

সূচীপত্র



সুতরা রাখার হুকুম

সুতরা রাখা সুন্নত; কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইমাম ও একাকী নামাজ আদায়কারীর জন্য সুতরা রাখার ব্যাপারে নির্দেশ ও উৎসাহ দিয়েছেন। অতএব সামনে দিয়ে লোক চলাচলের আশঙ্কা করলে সুতরা রাখা আবশ্যক। উপরন্তু মুসল্লী ও সুতরার মাঝে যে জায়গা থাকে সেখান দিয়ে কেউ গমন করলে তাকে বাধা দেয়াও জরুরি। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,«তোমাদের কেউ যেন সুতরা ব্যতীত নামাজ না পড়ে। আর কাউকে তোমার সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে দিয়ো না। যদি গমনকারী ব্যক্তি বিরত না হয়, তাহলে তার সাথে লড়াই করবে।» (বর্ণনায় ইবনে খুযাইমা)

সুতরার হিকমত

সুতরা রাখার বিধানে রয়েছে অনেক হিকমত। তন্মধ্যে কিছু হলো নিম্নরূপ:

১. মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে চলাচল বন্ধ করা; কেননা চলাচল অবাধ থাকলে মুসল্লীর খুশুখুজুতে ব্যাঘাত ঘটে।

২. সুতরা একাগ্রচিত্তে নামাজ আদায়ে মুসল্লীকে সহায়তা দেয়।

৩. নারী, কুকুর ও গাধা মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করায় নামাজ ভেঙ্গে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে সুতরার মাধ্যমে নিরাপদে থাকা যায়। আবু যর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,«তোমাদের কেউ যখন নামাজ পড়তে দাঁড়াবে, যদি হাতের কাছে থাকে, তাহলে যেন সে সোয়ারীর গদির পেছনের কাষ্টখন্ডের ন্যায় [একহাত বা তার থেকেও দীর্ঘ] কিছু দিয়ে সুতরা দেয়। আর যদি এরূপ না পায়, তাহলে গাধা, নারী ও কালো কুকুর তার নামাজ ভেঙ্গে দেবে। (বর্ণনাকারী বলেন) আমি বললাম, হে আবু যর! কুকুর নিয়ে সমস্যা কী? লাল অথবা হলুদ কুকুর থেকে কালো কুকুরের পার্থক্যটা কোথায়? তিনি বললেন, «হে আমার ভ্রতুষ্পুত্র, তুমি আমাকে যেভাবে জিজ্ঞাসা করলে আমিও সেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি উত্তরে বলেছেন,«কালো কুকুর শয়তান।» (বর্ণনায় মুসলিম)

ইমাম নববী (র:) বলেন, এখানে নামায ভেংগে দেয়ার অর্থ নামাযের খুশু খুযু নষ্ট করে দেয়; এর অর্থ এ নয় যে নামায নষ্ট করে দেয়।



সুতরার কিছু আহকাম

১. সুতরা অবলম্বন ইমাম ও একাকী নামাজ আদায়কারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মুক্তাদীর জন্য সুতরার প্রয়োজন নেই; কেননা ইমামের সুতরাই মুক্তাদীর জন্য যথেষ্ট। ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:«আমি একটি গাধীর ওপর সোয়ার হয়ে আগমন করলাম। আমি সে সময় প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেদিন মিনায় সাহাবীদের ইমামতি করছিলেন। আমি একটি কাতারের সামনে দিয়ে অতিক্রম করলাম। সোয়ারী থেকে নামলাম। গাধীটিকে ঘাস খেতে ছেড়ে দিলাম। এরপর আমি নামাজের কাতারে ঢুকে পড়লাম। এ বিষয়ে কেউ প্রতিবাদ জানালো না।» (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম) নামাজরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে অতিক্রম করা বৈধ নয়। এটি বরং কবিরা গুনাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,«নামাজরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে অতিক্রম করায় কী গুনাহ রয়েছে মানুষ যদি তা জানত তাহলে নামাজরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চাইতে চল্লিশ বছর দাঁড়িয়ে থাকাও তার কাছে উত্তম বলে মনে হত।» (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম) আবুন নদর বলেন,«আমি জানি না, তিনি চল্লিশ দিন বললেন, না চল্লিশ মাস, না চল্লিশ বছর?

২. কিন্তু যদি সুতরার বাইরে দিয়ে অতিক্রম করে অথবা সুতরা না থাকাবস্থায় সিজদার জায়গার বাইরে দিয়ে অতিক্রম করে, তবে গুনাহ হবে না।



৩. সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী ব্যক্তিকে বাধা দেয়া নামাজরত ব্যক্তির একটি আবশ্যক দায়িত্ব। আবু সাঈদ খুদরী রাযি. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,«যদি তোমাদের কেউ এমন জিনিস সামনে রেখে নামাজ পড়ে যা মানুষ থেকে তাকে আড়াল করে দেয় আর কেউ তার সামনে দিয়ে (সিজদার জায়গার ভিতর দিয়ে) অতিক্রম করতে চায়, তাহলে সে যেন তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়। আর যদি সে ক্ষান্ত না হয়, তবে তার সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হবে; কেননা সে শয়তান।» (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

৪. আলেমদের কেউ কেউ মসজিদুল হারামকে সুতরা বিষয়ক উল্লিখিত নীতিমালার বাইরে হিসাব করেছেন। মসজিদুল হারামে তারা নামাজরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে অতিক্রম করা বৈধ বলেছেন। তাদের দলিল হলো, «রাফউল হারাজ» তথা অসুবিধা দূরকরণ-বিষয়ক কুরআন সুন্নাহর প্রমাণাদি। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে মসজিদুল হারামে সুতরার বিধান বহাল রাখা মুসল্লীদেরকে সঙ্কট-সমস্যায় নিপতিত করবে।

৫. দেয়াল, মসজিদের পিলার, আলমারি অথবা লাঠি সুতরা হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।

৬. মুসল্লী ও সুতরার মাঝখানকার জায়গার পরিমাপ হলো একটি বকরী অতিক্রম করার মতো জায়গা। সাহল রাযি. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন,«রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামাজে দাঁড়ানোর স্থান ও দেয়ালের মাঝে একটি বকরী অতিক্রম করার পরিমাণ জায়গা ছিল।» (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)



নারীর অতিক্রমণে নামাজ ভেঙ্গে যাওয়া

নারী, গাধা ও কালো কুকুর নামাজরত পুরুষের সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে নামাজ ভেঙ্গে যাওয়ার উল্লিখিত হাদীসে নারীকে গাধা ও কুকুরের সাথে কখনোই তুলনা করা হয়নি। অর্থাৎ যে কারণে কালো কুকুর সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে নামাজ ভেঙ্গে যায় ঠিক একই কারণে নারী অতিক্রম করলেও নামাজ ভেঙ্গে যায়, বিষয়টি সে রকম নয়।

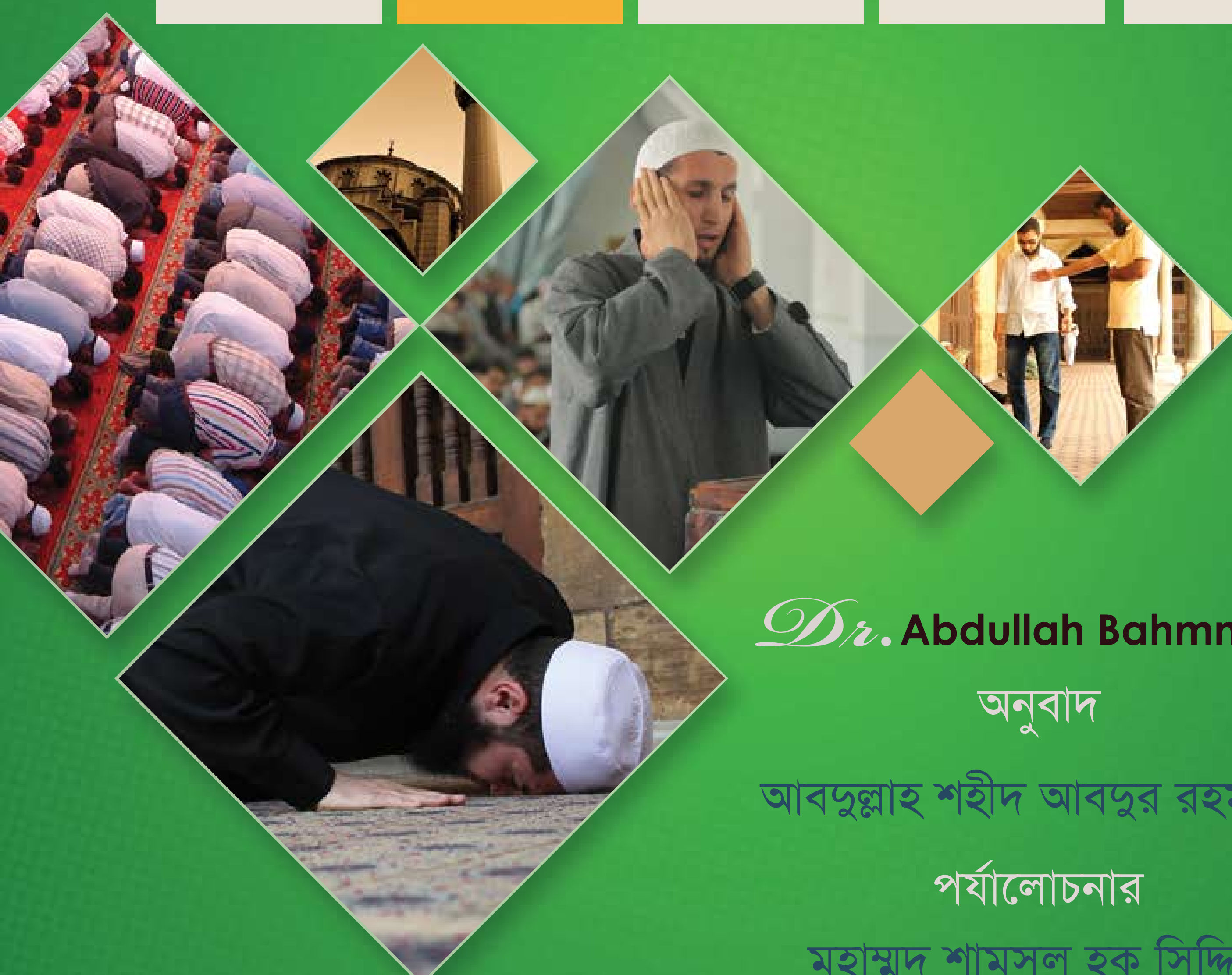
হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী কালো কুকুর শয়তান। এর অর্থ এটা নয় যে নারী ও গাধাও শয়তান। হাদীসে উল্লিখিত তিনটি বিষয়ের প্রতিটির কারণ ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। যদিও তিনটিকে একই ধারাবাহিকতায় উল্লেখ করা হয়েছে। কুকুর কেন নামাজ ভেঙ্গে দেয়, তার কারণ সরাসরি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, তবে অবশিষ্ট দুটির কারণ উল্লেখ করা হয়নি। যার অর্থ দাঁড়ায়, অবশিষ্ট দুটোর নামাজ ভেঙ্গে দেওয়ার কারণও ভিন্ন।

নারী কেন পুরুষের নামাজ ভেঙ্গে দেয় তা অনুমান করে বলা যায় যে, পুরুষের সিজদার জায়গার ভিতর দিয়ে নারী গমন করলে পুরুষের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থেকে যায়। নামাজ থেকে পুরুষের মনোযোগ সম্পূর্ণরূপে উঠে যাওয়ারও আশঙ্কা থাকে। আর এটা অনিস্বীকার্য যে কোনো পুরুষ অতিক্রম করার চেয়ে নারীর অতিক্রমণে পুরুষের দৃষ্টি অধিকমাত্রায় আকৃষ্ট হয়। এ জন্যেই নারীর অতিক্রমকে শরীয়ত প্রবর্তক নামাজভঙ্গকারী হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন, যাতে নামাজে খুশুখুজু বজায় থাকে। আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন।

আলোকচিত্রে ইবাদত

সহজ সরল উপয়ে ইসলামের বিধি-বিধান শেখা

পবিত্রতা	নামাজ	রোজা	যাকাত	হজ্ব



Dr. Abdullah Bahmmam

অনুবাদ

আবদুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান

পর্যালোচনায়

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

নামাজ পড়ার সঠিক নিয়ম

৬ নামাজের বর্ণনা

কেবলামুখী হওয়া ও তাকবীরে তাহরিমা

- নামাজ আদায়ে ইচ্ছুক ব্যক্তি কেবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে। মহান আল্লাহ তাআলার সামনে সে দাঁড়িয়ে এ অনুভূতি হৃদয়ে জাগ্রত করবে। অন্তরে খুশু ও বিনম্রভাব সৃষ্টি করবে।
- এরপর অন্তরে নামাজের নিয়ত করবে।
- দু হাত কাঁধ বরাবর অথবা কান বরাবর উঠাবে ও বলবে, «আল্লাহু আকবার» (বর্ণনায় মুসলিম)
- এরপর ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কব্জিতে ধরবে অথবা ডান হাত বাম হাতের ওপর রাখবে, হোক তা নাভির নিচে অথবা বুকের ওপরে।

ছানা পাঠ ও সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত

মুসল্লী তার মাথা নিচু করবে এবং সিজদার জায়গার প্রতি তাকিয়ে থাকবে। এরপর বলবে:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وتبَارَكَ اسْمُكَ، وَتعَالَى جَدُّكَ، وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ

«আপনি পবিত্র-মহান হে আল্লাহ। আমি আপনার প্রশংসা করছি। আপনার নাম বরকতময়। আপনার মর্যাদা উঁচু। আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।» (বর্ণনায় বুখারী)

- এরপর গোপনে বলবে :

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم

«আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। আল্লাহর নামে শুরু করছি যিনি দয়াময় পরম দয়ালু।» (বর্ণনায় মুসলিম)

- এরপর সূরা ফাতিহা পড়বে। শেষে বলবে«আমীন» অর্থাৎ হে আল্লাহ আপনি আমার প্রার্থনা কবুল করুন।
- সূরা ফাতিহার পর অন্য একটি সূরা অথবা মুসল্লীর পক্ষে কুরআন থেকে যা সহজ প্রথম দু রাকাতে পড়বে। ফজর, মাগরিব ও ইশার প্রথম দু রাকাতে প্রকাশ্য আওয়াজে কুরআন পড়বে।

সূচীপত্র



রুকু ও রুকু থেকে উঠা

এরপর তাকবীর দিয়ে রুকুতে যাবে। দুই হাঁটুর ওপর দু হাতের আঙ্গুলগুলো প্রশস্ত করে এমনভাবে রাখবে, মনে হবে যেন সে তা ধরে আছে। মাথা ও পিঠ সমান্তরাল রাখবে। এরপর বলবে: سبحان ربي العظيم «অর্থাৎ পবিত্র-মহান আমার মহামহিম রব। এরপর মাথা উঠাবে এবং ইমাম ও একাকী নামাজ আদায়কারী বলবে বর্ণনায় তিরমিযী): سمع الله لمن حمده অর্থাৎ প্রশংসাকারীর প্রশংসা আল্লাহ তাআলা শুনেছেন। আর সকলেই বলবে» (বর্ণনায় তিরমিযী)

ربنا ولك الحمد «হে আমাদের রব, সকল প্রশংসা আপনার জন্যেই।» (বর্ণনায় তিরমিযী)

রুকু থেকে উঠে, রুকুতে যাওয়ার পূর্বে দাঁড়ানো অবস্থায়, দুহাত যেভাবে রেখেছিল, সেভাবে রাখা মুস্তাহাব।



সিজদা ও সিজদা থেকে উঠা

- মুসল্লী তাকবীর দিয়ে সিজদায় যাবে। সিজদায় যাওয়ার সময় দুই হাঁটু প্রথমে রাখবে, এরপর হাত, এরপর কপাল ও নাক। দুই হাত কান বরাবর অথবা কাঁধ বরাবর কেবলামুখী করে বিছিয়ে দেবে।

দুই কনুই জমিন থেকে উঁচিয়ে রাখবে। বাহুর উর্ধ্বাংশ বগল, পেট ও রান থেকে দূরে রাখবে। সিজদাবস্থায় তিনবার বলবে: سبحان ربي الأعلى অর্থাৎ পবিত্র-মহান আমার রব, যিনি সর্বোর্ধ্ব। সিজদায় বেশি বেশি দুআ করবে।

- এরপর তাকবীর দিয়ে মাথা উঠাবে। এ সময় কাঁধ বা কান পর্যন্ত হাত উঠাবে না। বাম পা বিছিয়ে তার ওপর বসবে। ডান পা দাঁড় করিয়ে রাখবে। এ পায়ের আঙ্গুলগুলো কেবলামুখী করে রাখবে। দু হাত প্রশস্ত করে রানের ওপর রাখবে। হাতের আঙ্গুলগুলো থাকবে কেবলামুখী। এ সময় বলবে:

اللهم اغفر لي، وارحمني، واجبرني، واهدني، وارزقني

«হে আল্লাহ, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমার প্রতি রহম করুন। আমার ক্ষত দূর করুন। আমাকে আপনি হিদায়েত ও রিযিক দান করুন।» (বর্ণনায় তিরমিযী)

- এরপর তাকবীর দিয়ে প্রথম সিজদার মতোই দ্বিতীয় সিজদা করবে।
- এরপর তাকবীর দেয়া অবস্থায় মাথা উঠাবে এবং দাঁড়ানোর পূর্বে স্থির হয়ে মুহূর্তকাল বসবে। মালিক ইবনে হুআইরেছ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামাজের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন যে, «তিনি স্থির হয়ে বসার পূর্বে দাঁড়াতেন না।» (বর্ণনায় বুখারী)
- এরপর হাতের ওপর ভর করে দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়াবে।
  - প্রথম রাকাতের মতোই দ্বিতীয় রাকাত আদায় করবে। তবে প্রথম রাকাতের মতো প্রারম্ভিক দুআ তথা ছানা পড়বে না।



তাশাহহুদ

প্রথম দু রাকাত পড়া শেষ হলে প্রথম তাশাহহুদের জন্য মুসল্লী বসবে। বাম পা বিছিয়ে ডান পা দাঁড় করিয়ে রেখে বসবে। উভয় হাত উরুর ওপর রাখবে। বাম হাত প্রশস্ত করে রাখবে। আর ডান হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুল ও অনামিকা আঙ্গুল গুটিয়ে রাখবে। আর মধ্যমা আঙ্গুলকে বৃদ্ধাঙ্গুলের সাথে চক্রাকারে রাখবে। আর তার তর্জনী আঙ্গুল দ্বারা ইশারা দেবে এবং তার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে। এবং বলবে:

التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

«সমস্ত সম্মানজন সম্বোধন আল্লাহর জন্য। সমস্ত শান্তি-কল্যাণ ও পবিত্রতার মালিক আল্লাহ তাআলা। হে নবী! আপনার প্রতি শান্তি, আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। আমাদের প্রতি এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।»
(বর্ণনায় বুখারী)

এরপর দরুদ পড়বে ও বলবে:

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد

«হে আল্লাহ, আপনি মুহম্মাদের প্রতি এবং মুহাম্মদের পরিবারের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, যেমনিভাবে রহমত বর্ষণ করেছেন ইবরাহীমের প্রতি এবং ইবরাহীমের পরিবারের প্রতি। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত ও মহাসম্মানিত। হে আল্লাহ, আপনি মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবারের প্রতি বরকত নাযিল করুন, যেমনিভাবে আপনি বরকত নাযিল করেছেন ইবরাহীমের প্রতি এবং ইবরাহীমের পরিবারের প্রতি। নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত ও মহাসম্মানিত।»
(বর্ণনায় আবু দাউদ)

এরপর বলবে:



اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفرلي مغفرة من عندك، إنك أنت الغفور الرحيم.

«হে আল্লাহ, নিশ্চয় আমি নিজের ওপর অনেক জুলুম করেছি। আর গুনাহ তো কেবল আপনিই মাফ করেন। অতএব আপনি আমাকে আপনার পক্ষ থেকে মাফ করে দিন। নিশ্চয় আপনি অতি ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।»
(বর্ণনায় বুখারী)

অথবা বলবে:

اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال

«হে আল্লাহ, আমি জাহান্নামের আযাব থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। কবরের আযাব থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। দাজ্জালের অনিষ্টতা থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।»
(বর্ণনায় বুখারী)

সালাম

নামাজান্তে মুসল্লী তার ডানে ও বামে সালাম ফেরাবে এবং বলবে:

السلام عليكم ورحمة الله (বর্ণনায় মুসলিম)

নামাজ শেষে দুআ-যিকর

- তিনবার أستغفر الله «আমি আল্লাহর মাগফিরাত চাচ্ছি» বলা।»
(বর্ণনায় মুসলিম)

এরপর বলা:

اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام

«হে আল্লাহ, আপনি শান্তি। আর শান্তি আপনার পক্ষ থেকেই আসে। আপনি বরকতপূর্ণ, হে বড়ত্ব ও সম্মানের মালিক!»
(বর্ণনায় মুসলিম)

এরপর বলা:

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد

«আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক। তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই। প্রশংসাও তাঁর। এবং তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ, আপনি যা দেবেন তাতে বাধাদানকারী কেউ নেই। আর আপনি যা দেবেন না তা দেয়ার কেউ নেই। কোনো মর্যাদাশালীকে তার মর্যাদা (আপনার আযাবের ব্যাপারে) কোনো উপকার করতে পারে না।»
(বর্ণনায় বুখারী)

এরপর বলা:

لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك، وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون

«আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক। তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই। প্রশংসাও তাঁর। এবং তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কোনো উপায় ও ক্ষমতা নেই। আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। আমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করি। নিয়ামত তাঁরই, অনুগ্রহও তাঁর। উত্তম প্রশংসাসমূহও তাঁর। আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। আমরা তাঁর দীন তাঁরই নিমিত্তে একনিষ্ঠভাবে পালন করি, যদিও কাফেররা অপছন্দ করে।»
(বর্ণনায় মুসলিম)

سبحان الله

পবিত্র মহান আল্লাহ তাআলা (৩৩ বার)

الحمد لله

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার (৩৩ বার)

الله أكبر

আল্লাহ সর্বাপেক্ষা বড় (৩৩ বার)।

একশততম বারে বলবে:

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير



«আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক। তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই। প্রশংসাও তাঁর। এবং তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।» (বর্ণনায় মুসলিম)

নামাজান্তে পঠিতব্য আরেকটি দুআ হলো:

اللهم أعني على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك

« হে আল্লাহ, আপনি আমাকে আপনার যিকর, আপনার শুকরিয়া এবং সুন্দরভাবে আপনার ইবাদত আদায়ের ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করুন।» (বর্ণনায় আবু দাউদ)

- আয়াতুল কুরসী পড়া। সূরা ইখলাস, সূরা আল ফালাক ও সূরা আন-নাস পড়া। (বর্ণনায় মুসলিম)
- ফজরের নামাজে সালামের পর এই দুয়া পড়া:

اللهم إني أسألك علما نافعا ، ورزقا طيبا ، وعملا متقبلا

« হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে উপকারী ইলম, উত্তম রিযক এবং কবুল হওয়া আমল প্রার্থনা করি।» (বর্ণনায় ইবনে মাজাহ)

আয়েশা রাযি. বলেন, «রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম তাকবীর দিয়ে নামাজ শুরু করতেন। সূরা ফাতিহা পড়তেন। যখন তিনি রুকুতে যেতেন মাথা উপরের দিকেও রাখতেন না আবার একেবারে সোজাও করতেন না, বরং এ দুয়ের মাঝামাঝি পর্যায়ে রাখতেন। যখন তিনি রুকু থেকে উঠতেন সোজা হয়ে না দাঁড়িয়ে সিজদায় যেতেন না। আর যখন তিনি সিজদা থেকে উঠতেন তখন সোজা হয়ে না বসে দ্বিতীয় সিজদায় যেতেন না। তিনি প্রতি দু রাকাত পরপর আত্তাহিয়াতু পড়তেন। তিনি বাম পা বিছিয়ে দিতেন ও ডান পা দাঁড় করিয়ে রাখতেন। তিনি শয়তানের ন্যায় উপবেসন থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিতেন। আর হিংস্রপ্রাণী যেভাবে দু বাহু জমিনে বিছিয়ে রাখে সেভাবে মুসল্লী ব্যক্তির দু বাহু জমিনে বিছিয়ে রাখতে বারণ করতেন। আর তিনি সালামের মাধ্যমে নামাজ শেষ করতেন।» (বর্ণনায় মুসলিম)

শয়তানের ন্যায় উপবেসন করার অর্থ হলো নিতম্বের ওপর বসে দু পা সামনে দাঁড় করিয়ে রাখা এবং দু হাত মাটিতে রাখা ঠিক কুকুরের বসার মতো।

মাসায়েল

মুসল্লীদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও আছেন যারা তাশাহহুদের সময় ও দুই সিজদার মধ্যখানে ওপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে বসলে খুব ব্যথা অনুভব করেন। যদি অবস্থা এমন হয় তাহলে যেভাবে বসলে কষ্ট হয় না, সেভাবেই বসতে পারবে; কেননা কষ্টকর অবস্থা সহজতার আগমন ঘটায়।

নামাজের আকার-প্রকৃতিতে নারী ও পুরুষ সমান। তবে হানাফী মাযহাব অনুযায়ী কিছু বিষয়ে নারীর নামাজ পুরুষের নামাজ থেকে ভিন্ন।





তাকবীর



ছানা পাঠ ও সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত



রুকু



সিজদা



দুই সিজদার মাঝখানে বসা

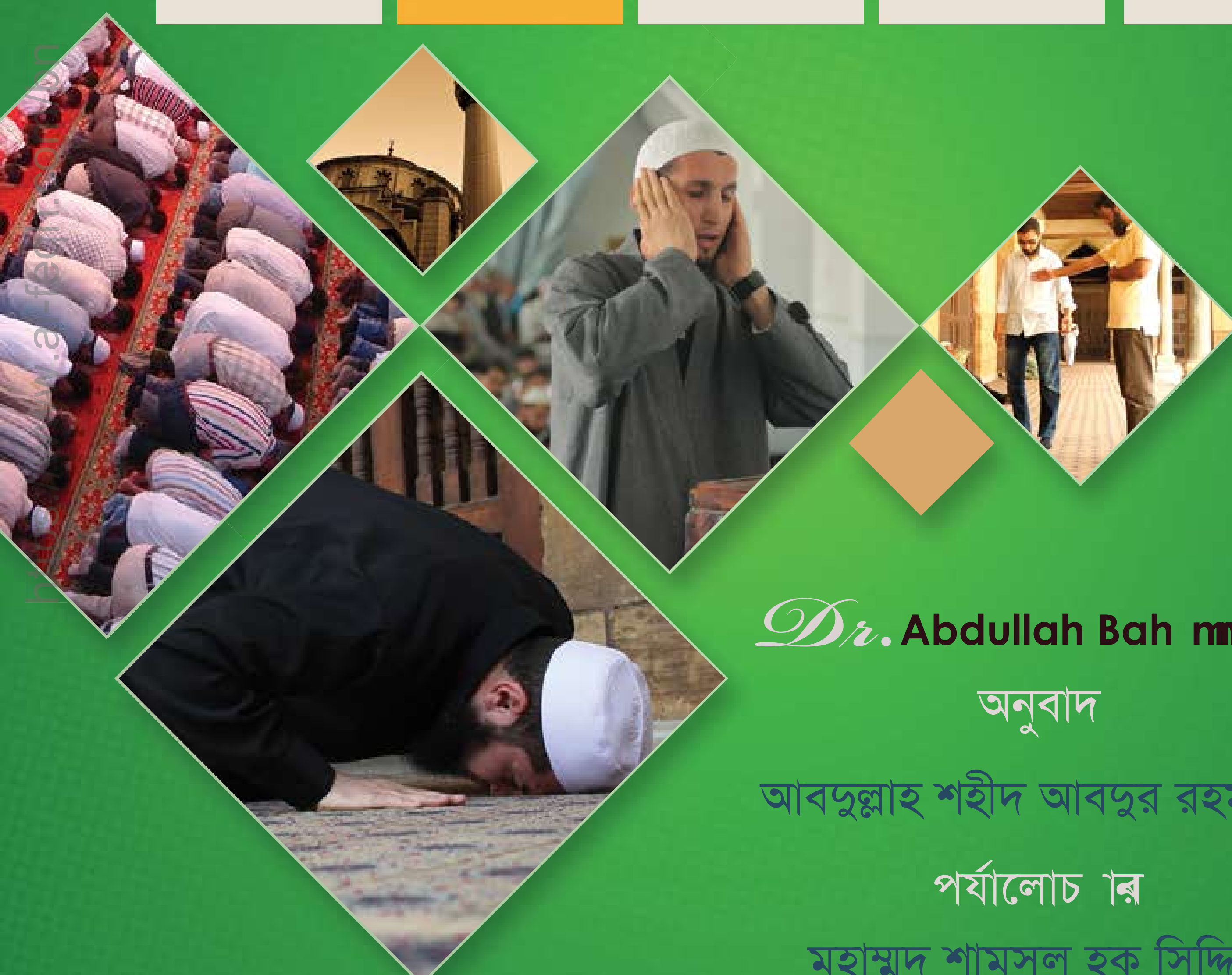
তাশাহহুদের জন্য বসা

সালাম দেয়া

আলোকচি ত্র ইবাদত

সহজ সরল উপয়ে ইসলামের বিধি-বিধান শেখা

পবিত্রতা | নামাজ | রোজা | যাকাত | হজ্ব



Dr. Abdullah Bah mmam

অনুবাদ

আবদুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান

পর্যালোচ ার

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

নামাজের মাসায়েল ও আহকাম

৭

নামাজের আহকাম

বসা অবস্থায় নামাজ আদায়

ক-বসা অবস্থায় নফল নামাজ:

বসা অবস্থায় নফল নামাজ পড়া বৈধ, তবে দাঁড়িয়ে পড়ার তুলনায় এর ছাওয়াব হবে অর্ধেক। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,«ব্যক্তি যদি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ে তবে এটাই তার জন্য উত্তম। আর যদি বসে নামাজ পড়ে তবে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায়কারীর তুলনায় অর্ধেক ছাওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি শুয়ে নামাজ পড়ে তার ছাওয়াব হয় বসে নামাজ আদায়কারীর অর্ধেক।» (বর্ণনায় বুখারী)

হ্যাঁ যদি ওযরের কারণে বসে নামাজ পড়া হয় তবে পূর্ণ ছাওয়াবই পাওয়া যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,«যখন কোনো বান্দা অসুস্থ হয়ে পড়ে অথবা সফর অবস্থায় থাকে তাহলে সে মুকীম ও সুস্থাবস্থায় যেরূপ আমল করত সে অনুপাতেই তার ছাওয়াব লেখা হয়।» (বর্ণনায় বুখারী)

খ-বসা অবস্থায় ফরয নামাজ আদায় করা:

যদি কোনো ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে সক্ষম হয়, তবে তার জন্য বসে বসে ফরয নামাজ আদায় করা শুদ্ধ হবে না।

সূচীপত্র









নিয়ত

নিয়তের কিছু আহকাম

১. নামাজ পড়া অবস্থায় নিয়ত ভেঙ্গে দেয়া জায়েয নয়। যে ব্যক্তি নামাজ কর্তন করার নিয়ত করল তার নামাজ ভেঙ্গে গেল। এমতাবস্থায় আবার প্রথম থেকে নামাজ শুরু করা আবশ্যক হবে। অবশ্য আহলে ইলমদের কারো কারো নিকট এ অবস্থায় নামাজ ভঙ্গ হয় না।

২. যে ব্যক্তি নফল নামাজের নিয়ত করে নামাজ শুরু করল, নামাজের অভ্যন্তরে সে তা ফরজের নিয়তে রূপান্তরিত করতে পারবে না।

৩. যে ব্যক্তি একাকী ফরয নামাজের নিয়ত করে নামাজে দাঁড়াল, এরপর কিছু লোকজন এসে জামাতের সাথে নামাজ শুরু করল, এমতাবস্থায় ফরজের নিয়তকে নফলের নিয়তে রূপান্তরিত করে দু রাকাত শেষ হলে ছালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করতে পারবে এবং জামাতে শরীক হয়ে ফরয নামাজ আদায় করতে পারবে।

সূরা ফাতিহা পড়া

সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। ইমাম ও মুক্তাদী সবার ক্ষেত্রেই সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। জেহরি নামাজের ক্ষেত্রেও এ বিধান প্রযোজ্য। উবাদা ইবনে ছামেত রাযি.বলেন, সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। ইমাম ও মুক্তাদী সবার ক্ষেত্রেই সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। জেহরি নামাজের ক্ষেত্রেও এ বিধান প্রযোজ্য। উবাদা ইবনে ছামেত রাযি.বলেন,«আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে ফজরের নামাজে ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন পড়লেন। কিন্তু তাঁর কুরআন পড়াটা ভারি মনে হলো। তিনি নামাজ থেকে ফারেগ হয়ে বললেন: তোমরা হয়তো তোমাদের ইমামের পিছনে কুরআন পড়? আমরা বললাম, জ্বি, হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন: সূরা ফাতিহা ব্যতীত তোমরা এরূপ করো না; কেননা যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়ল না তার নামাজ হলো না।» (বর্ণনায় আবু দাউদ)

«আমীন» বলা

ইমাম, মুক্তাদী, একা নামাজ আদায়কারী সবার জন্য আমীন বলা সুন্নত। ফরয, নফল, প্রকাশ্য কেরাতের নামাজ অপ্রকাশ্য কেরাতের নামাজ তথা সকল নামাজেই সূরা ফাতিহা পাঠান্তে আমীন বলা সুন্নত। নামাজ প্রকাশ্য কিরাআতের হোক বা গোপনীয় কিরাআতের সর্বস্থায় গোপনে আমীন বলবে।

এর দলিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী,«যখন ইমাম আমীন বলে তখন তোমরাও আমীন বলো; কেননা যার আমীন বলা ফেরেশতাদের আমীন বলার সময়ের সাথে মিলে যাবে তার অতীতের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।» (বর্ণনায় বুখারী)



নফল নামাজে প্রকাশ্যে কিরাত পড়া

নামাজ ছুটে গেলে তা কাযা করার সময় জোরে কিরাত পড়বে না আস্তে পড়বে? এ ক্ষেত্রে বলা যায় যে, মূল বিষয় হলো নামাজ, কাযা নামাজ কখন আদায় করছে সেটা মূল দেখার বিষয় নয়। অতএব যদি জেহরি নামাজের কাযা দিনের বেলায় আদায় করে তাহলে প্রকাশ্যে কিরাত পড়া হবে।

নফল নামাজের ক্ষেত্রে মূল হলো গোপনে কিরাত পড়া। তারাবীহ ও খুসুফের নামাজ এথেকে ব্যতিক্রম; যেহেতু এ ব্যাপারে দলিল রয়েছে।

হাত উঠানো

তাকবীরে তাহারিমার সময় হাত উঠানো হবে, আহলে ইলমের কারো কারো নিকট নিম্নবর্তী জায়গাসমূহেও হাত উঠানো হবে:

১- রুকুতে যাওয়ার তাকবীরের সময়।

২- রুকু থেকে উঠার তাকবীরের সময়।

৩- প্রথম তাশাহহুদ শেষে দাঁড়ানোর সময়।

রাকাতপ্রাপ্তি

মুক্তাদী যদি ইমামকে রুকুতে পায় তবে রাকাত পেয়েছে বলে গণ্য হবে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: «যে ব্যক্তি রুকু পেল, সে রাকাতও পেল।» (বর্ণনায় আবু দাউদ)

ধীর-স্থিরতা

নামাজের সকল রুকনে ধীর-স্থিরতা নামাজের রুকনের মধ্যে শামিল, যা পরিত্যাগ করলে নামাজ শুদ্ধ হবে না। হাদীসে এসেছে, আবু হুরায়রা রাযি. বলেন: «রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করলেন। এ সময় এক ব্যক্তি প্রবেশ করে নামাজ পড়ল। নামাজ শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এল ও সালাম করল। তিনি সালামের উত্তর দিলেন এবং বললেন,«তুমি ফিরে গিয়ে আবার নামাজ পড়, কেননা তোমার নামাজ হয়নি।» লোকটি ফিরে গিয়ে পূর্বের মতোই নামাজ পড়ল। এরপর পুনরায় এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাম করল। তিনি বললেন, «ওয়া আলাইকাস্ সালাম।» এরপর বললেন,«তুমি ফিরে গিয়ে আবার নামাজ পড়ো, কেননা তোমার নামাজ হয়নি।»

এরূপ তিনি তিনবার করলেন। অতঃপর লোকটি বলল, যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন, তাঁকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি এর চেয়ে উত্তমভাবে পারি না। আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন,«তুমি যখন নামাজে দাঁড়াবে,তাকবীর দেবে। এরপর আল কুরআনের যেটুকু তোমার পক্ষে সহজ তা পড়বে। এরপর রুকুতে যাবে এবং স্থির হয়ে রুকু সম্পন্ন করবে। এরপর রুকু থেকে উঠবে এবং সোজা হয়ে দাঁড়াবে। এরপর সিজদায় যাবে এবং স্থির হয়ে সিজদা সম্পন্ন করবে। এরপর সিজদা থেকে উঠবে এবং স্থির হয়ে বসবে। তুমি নামাজের সকল অংশেই এরূপ করবে।» (বর্ণনায় বুখারী)

সিজদার আকৃতি»

সিজদা সাতটি অঙ্গের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,«যখন বান্দা সিজদা করে তার সাথে সাতটি অংশও সিজদা করে: তার চেহারা। দুই হাত। দুই হাঁটু। দুই পা।» (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)





তর্জনী আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করা

সুন্নত হলো আঙ্গুল দিয়ে তাশাহহুদের সময় ইশারা করা। ওয়াইল ইবনে হুজর রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীস এর দলিল। হাদীসটি হলো, «অতঃপর তিনি তার তর্জনী আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করলেন। আমি তাকে তা নাড়াতে এবং তা দিয়ে দুআ করতে দেখলাম।» (বর্ণনায় নাসায়ী)

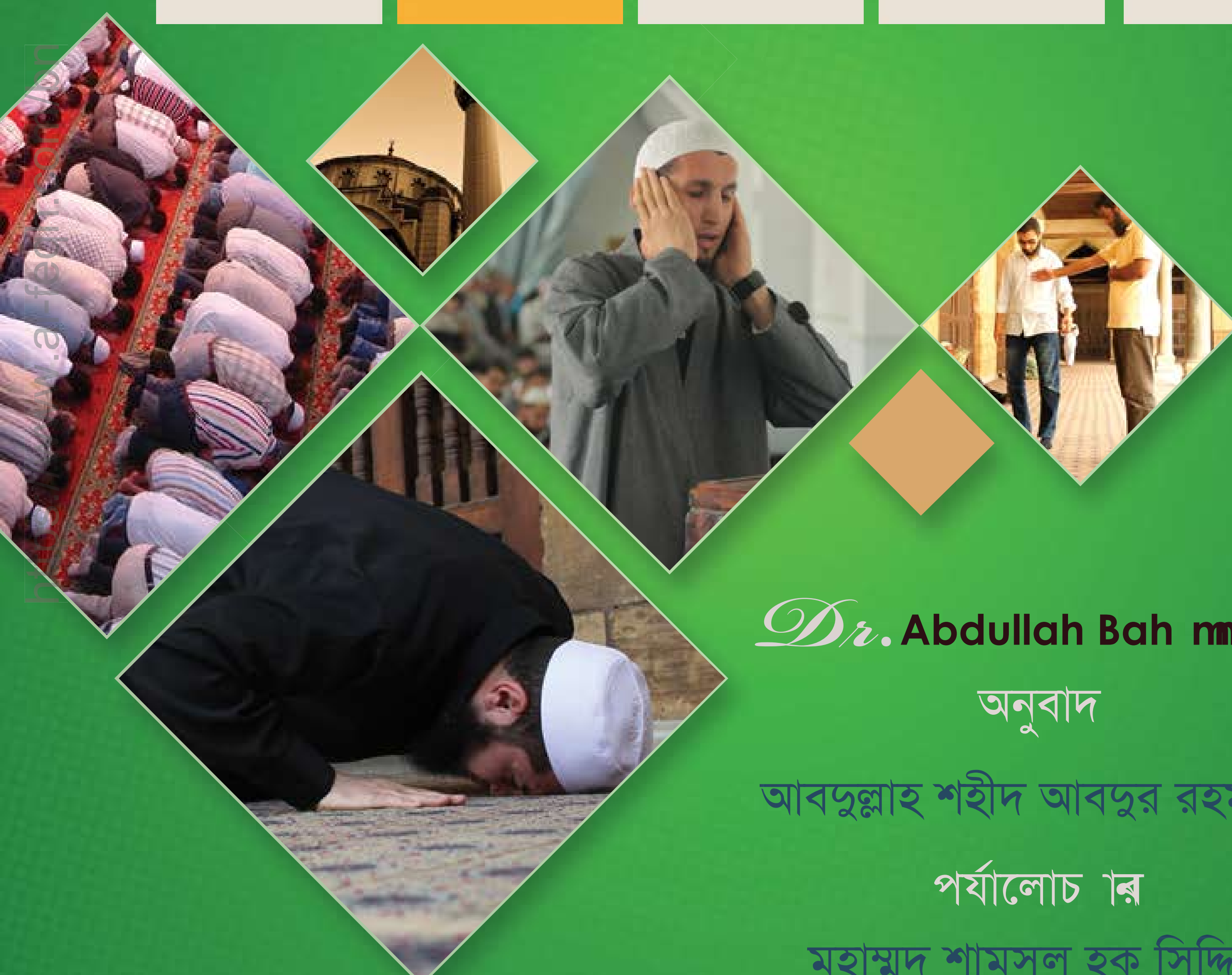
জিহ্বা নাড়ানো

নামাজের ভিতরে কুরান তিলাওয়াত, তাকবীর, দুআ ইত্যাদি মনে মনে পড়লে হবে না। বরং তা জিহ্বা দিয়ে উচ্চারণ করতে হবে। নূন্যতম পক্ষে এগুলো পড়ার সময় জিহ্বা ও ঠোঁট নাড়াতে হবে।

আলোকচিত্রে ইবাদত

সহজ সরল উপায়ে ইসলামের বিধি-বিধান শেখা

পবিত্রতা	নামাজ	রোজা	যাকাত	হজ্ব



Dr. Abdullah Bahmmam

অনুবাদ

আবদুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান

পর্যালোচনায়

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

নামাজের রুকন ওয়াজিব ও সুন্নতসমূহ

৮ নামাজের রুকন ওয়াজিব ও সুন্নতসমূহ

নামাজের রুকনসমূহ

তা হলো নামাজের মৌলিক অংশগুলো, যা কোনো অবস্থাতেই তরক করা চলে না। অপারগতা ছাড়া এগুলো ছুটে গেলে দায়মুক্ত হওয়া যায় না, হোক তা ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা ভুলে।

প্রথমত: নামাজের রুকনসমূহ

১- সক্ষম ব্যক্তির ফরয নামাজে কিয়াম তথা দাঁড়িয়ে নামাজ আদায়

২- কিরাত

৩- রুকু

৪- সাত অঙ্গের ওপর সিজদা করা

৫- শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পরিমাণ বসা

৬- বিভিন্ন রুকনের মাঝে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা।

৭- নামাজ পরিপূর্ণরূপে আদায় করা

যে ব্যক্তি কোনো রুকন ছেড়ে দিল তার কি করণীয়?

১-ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো রুকন ছেড়ে দিলে নামাজ বাতিল হয়ে যাবে এবং পুনরায় তা আদায় করতে হবে।

২-ভুলবশত ছেড়ে দিলে এর দু অবস্থা হতে পারে:

ক- যদি ভুলবশত কোনো রুকন ছুটে যায় এবং দ্বিতীয় রাকাতে গিয়ে ঠিক একই রুকন আদায়ের মূহুর্তে তা মনে হয়, তাহলে প্রথম রাকাত বাতিল বলে গণ্য হবে এবং দ্বিতীয় রাকাত এর স্থলাভিষিক্ত হবে। এ জন্যে

সূচীপত্র

সিজদায়ে সাহু দেয়া আবশ্যক হবে।

এর উদাহরণ: এক ব্যক্তি দ্বিতীয় রাকাতে সিজদা দেয়ার সময় মনে করতে পারল যে প্রথম রাকাতে সে দ্বিতীয় সিজদা দিতে ভুলে গিয়েছে। এমতাবস্থায় এই রাকাতকে প্রথম রাকাতের স্থলে ধরবে এবং প্রথম রাকাতকে বাতিল বলে গণ্য করবে।

খ - আর যদি ভুলে যাওয়া রুকন দ্বিতীয় রাকাতে সে রুকনে যাওয়ার পূর্বেই স্মরণ করতে পারে, তাহলে স্মরণ হওয়া মাত্রই সে রুকনটি আদায় করে নিতে হবে।

এর উদাহরণ: এক ব্যক্তি রুকু করতে ভুলে গেল।

নামাজের ওয়াজিবসমূহ

আর তা হলো সিজদায়ে সাহুর মাধ্যমে যার ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়

সে যখন কিরাত পড়া শেষ করে সিজদায় গেল তখন স্মরণ হলো যে রুকু করতে সে ভুলে গিয়েছে। এমতাবস্থায় সাথে সাথে দাঁড়িয়ে রুকু করে নেয়া আবশ্যক হবে। এরপর অবশিষ্ট নামাজ পূরণ করবে।

দ্বিতীয়ত: নামাজেরওয়াজিবসমূহ

১. আল্লাহু আকবার বলে নামাজ শুরু করা।

২. ফরয নামাজের প্রথম দু রাকাতে এবং বেতর ও নফল নামাজের সকল রাকাতে সূরা ফাতিহা পড়া।

৩. ছোট একটি সূরা অথবা কমপক্ষে ছোট ছোট তিন আয়াত ফরয নামাজের প্রথম দু রাকাতে এবং বেতর ও নফল নামাজের সকল রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে মিলানো।

৪. অন্য সূরা পড়ার পূর্বে সূরা ফাতিহা পড়া।

৫. সিজদার সময় কপালের সাথে নাকও রাখা।

৬. নামাজের আরকানসমূহ ধীরস্থিরভাবে আদায় করা, যেমন: রুকু-সিজদা ইত্যাদি সুস্থিরভাবে করা এবং রুকু-সিজদা থেকে উঠার পর সুস্থির হওয়া ইত্যাদি।

৭. কিরাআত ও রুকুর মাঝে এবং প্রতি রাকাআতে যা দুইবার করে আদায় করা হয় এসবের মাঝে তরতীব রক্ষা করা।

৮. তিন রাকাত অথবা চার রাকাতবিশিষ্ট নামাজের প্রথম বৈঠক।

৯. প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদ পাঠ করা।

১০. শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পাঠ করা।

১১. প্রথম তাশাহহুদের পর দেরি না করে তৃতীয় রাকাআতের জন্য দাঁড়ানো।

১২.না ফজরের দুই রাকাত, মাগরিব ও এশার প্রথম দুই রাকাত, জুমআ, দুই ঈদ, তারাবীহ ও রমজানের বেতরে প্রকাশ্যে কিরাআত পড়া। মাজ শেষ করার সময় সালাম বলা।

১৩. ফজররে দুই রাকাত, মাগরবি ও এশার প্রথম দুই রাকাত, জুমআ, দুই ঈদ, তারাবীহ ও রমজানরে বতেরে প্রকাশ্যে করিাআত পড়া।

১৪. যোহর ও আসরের নামাজে, মাগরিবের তৃতীয় রাকাআতে, এশার শেষ দুই রাকাআতে এবং দিনের নফল নামাজে ইমাম ও একাকী নামাজ আদায়কারীর ক্ষেত্রে গোপনীয়ভাবে কিরাত পড়া।

১৫. বিতরের নামাজে দুআয়ে কুনূত পড়া।

১৬. দুই ঈদের তাকবীর (প্রতি রাকাতে তিন তাকবীর করে) দুআয়ে কুনূত পড়ার পূর্বের তাকবীর, ঈদের নামাজের দ্বিতীয় রাকাতে রুকুতে যাওয়ার তাকবীর।

১৭.মুক্তাদির কিরাত না পড়া এবং জামাতের নামাজে ইমামের অনুসরণ করা।

১৮. দ্বিতীয় সিজদা প্রথম সিজদার পর বিলম্ব না করে আদায় করা।



ওয়াজিব ছুটে গেলে মুসল্লীকে কি করতে হবে?

১ - যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোনো ওয়াজিব ছেড়ে দেবে তার নামাজ বাতিল বলে গণ্য হবে এবং তাকে পুনরায় নামাজ আদায় করতে হবে।

২ - যে ব্যক্তি ভুলক্রমে কোনো ওয়াজিব ছেড়ে দেবে তার নামাজ শুদ্ধ বলে গণ্য হবে, তবে তার জন্য সিজদায়ে সাহু দেয়া আবশ্যক হবে।

তৃতীয়ত: নামাজের সুন্নতসমূহ

নামাজের ফরয ও ওয়াজিব ব্যতীত অবশিষ্ট আমলগুলো সুন্নত অথবা মুস্তাহাব যা ছুটে গেলে নামাজের শুদ্ধতায় কোনো প্রভাব পড়ে না এবং এ সবের জন্য সিজদায়ে সাহু দেওয়াও আবশ্যক নয়।

নামাজের সুন্নতসমূহ দুই প্রকার:

নামাজের সুন্নতসমূহ নিম্নরূপ

১. তাহরীমার জন্য পুরুষের ক্ষেত্রে কান বরাবর এবং স্বাধীন নারীর ক্ষেত্রে কাঁধ বরাবর হাত উঠানো।

২. আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিকভাবে রাখবে, পরস্পর মিলিয়ে রাখবে না আবার অতিমাত্রায় ফাঁক করেও রাখবে না।

৩. মুক্তাদীর তাহরীমা ইমামের তাহরীমার সাথে সাথে হওয়া।

৪. পুরুষের ক্ষেত্রে ডান হাত বাম হাতের ওপর নাভির নিচে রাখা। আর নারীর ক্ষেত্রে সিনার ওপর রাখা।

৫. নামাজ শুরুর দুআ অর্থাৎ ছানা পড়া, কিরাত পড়ার উদ্দেশ্যে সূরা ফাতিহার পূর্বে প্রতি রাকাতের শুরুতে আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ বলা।

৬. ছানা, আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, সূরা ফাতিহার পর আমীন বলা এবং রুকু থেকে উঠার পর রাব্বানা ওয়ালাকাল হামদ ইত্যাদি গোপনে বলা।

৭. তাহরীমার শুরু এবং শেষে মাথা সোজা রাখা, নিচু না করা।

৮. ইমামের ক্ষেত্রে তাকবীর, সামি-আল্লাহু লিমান হামিদাহ এবং সালাম প্রকাশ্য আওয়াজে বলা।

৯. দাঁড়ানো অবস্থায় দু পায়ের মধ্যখানে চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁক রাখা।

১০. ফাতিহার পর ফজর ও যোহরে তিওয়ালে মুফাস্সাল, আসর ও এশার সময় আওসাতে মুফাস্সাল এবং মাগরিবের সময় কিসারে মুফাসসাল থেকে সূরা পড়া।

১১.সকল নামাজের প্রথম রাকাতে দ্বিতীয় রাকাআতের তুলনায় দীর্ঘ কিরাআত পড়া। রুকুতে যাওয়ার সময়, সিজদায় যাওয়া ও উঠার সময় তাকবীর দেয়া, তবে রুকু থেকে উঠার সময় সামি-আল্লাহু লিমান হামিদাহ বলা। আর রুকুতে গিয়ে তিনবার سبحان ربي العظيم বলা এবং সিজদায় গিয়ে তিনবার سبحان ربي الأعلى বলা।

১২.রুকুতে গিয়ে দু হাতে দু হাটু ধরা।

১৩. রুকুতে পুরুষরা আঙ্গুল ফাঁক করে রাখবে। আর নারীরা তা করবে না।

১৪. রুকু অবস্থায় পিঠ সোজা রাখা। আর মাথা নিতম্বের সামান্তরাল রেখায় রাখা।

১৫. রুকু এবং সিজদা থেকে উঠে সোজা হয়ে স্থির হওয়া।

১৬. সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে দু হাঁটু, এরপর দু হাত, এরপর চেহারা রাখবে। আর সিজদা থেকে উঠার সময় ঠিক এর উল্টোটা করবে।

১৭.দুই করতলের মাঝখানে সিজদা করবে। আর হাত থাকবে কাঁধ বরাবর।

১৮. পুরুষের পেট ও ঊরুর মাঝে দূরত্ব থাকা। আর দুই কনুই পাঁজর থেকে দূরে রাখা এবং দুই

৮. বাহু জমিন থেকে ঊর্ধ্বে রাখা।

৯. নারীর পেট ও ঊরু একসাথে লাগিয়ে রাখা।

১০. দুই সিজদার মাঝে বসা এবং তাশাহহুদের সময় দুই হাত দুই ঊরুর ওপর রাখা।

১১. দুই সিজদা ও তাশাহহুদের সময় বাম পা বিছিয়ে তার ওপর বসা এবং ডান পা দাঁড় করিয়ে রাখা। পায়ের আঙ্গুল কিবলামুখী রাখা।

১২.নারীর তাওয়াররুক অর্থাৎ নিতম্বের ওপর বসা এবং একটি ঊরু জমিনের ওপর রাখা। বাম পা ডান পায়ের নিচ দিয়ে নিয়ে বাইরের দিকে রাখা; কেননা এরূপ করাই নারীর গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্য অধিক উপযোগী।

১৩. শুধু কালেমায়ে শাহাদাত পড়ার সময় তর্জনী দিয়ে ইশারা দেয়া। «লা ইলাহা» বলার সময় উঠানো এবং «ইল্লাল্লাহ» বলার সময় নামানো।

১৪. প্রথম দুই রাকাতের পরবর্তী রাকতগুলোয় সূরা ফাতিহা পড়া।

১৫. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর শেষ বৈঠকে দরুদ পড়া।

১৬. দরুদ পড়ার পর দুআ করা কুরআন-সুন্নাহর শব্দের সাথে মিল রেখে।

১৭.ডানে বামে সালাম ফেরানোর সময় ইমাম তার পেছনে থাকা মুসল্লী, ফেরেশতা নেককার জিনদের নিয়ত করা

১৮. যেদিকে ইমাম রয়েছে সেদিকে সালাম ফেরানোর সময় মুক্তাদী ইমামের সালামের জবাবের নিয়ত করবে।



ইফতিরাশ



তাওয়াররুক

১৯. একাকী নামাজ আদায়কারী শুধু ফেরেশতাদের প্রতি সালাম প্রদানের নিয়ত করবে।

২০. দ্বিতীয় সালামের সময় প্রথম সালামের তুলনায় আওয়াজ একটু নিচু করা।

২১. ইমামের সালামের সাথে সাথে সালাম দেয়া।

২২. ডান দিকে আগে সালাম দেয়া।

২৩. মাসবুক ব্যক্তি ইমাম দ্বিতীয় সালাম থেকে ফারেগ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, যাতে সে নিশ্চিত হতে পারে যে ইমামের ওপর কোনো সিজদায়ে সাহু নেই।

নামাজের আদবসমূহ

১. তাকবীরে তাহরীমার সময় পুরুষ তার করতল জামার ভিতর থেকে বের করবে; কেননা এতে অধিক তাওয়াযু প্রকাশ পায়। পক্ষান্তরে নারী এরূপ করবে না; কেননা নারী তার হাত বের করতে গেলে তার বাহুর কিছু অংশ বের হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়।

২. মুসল্লী দাঁড়ানো অবস্থায় তার সিজদার জায়গার প্রতি দৃষ্টি দেবে।

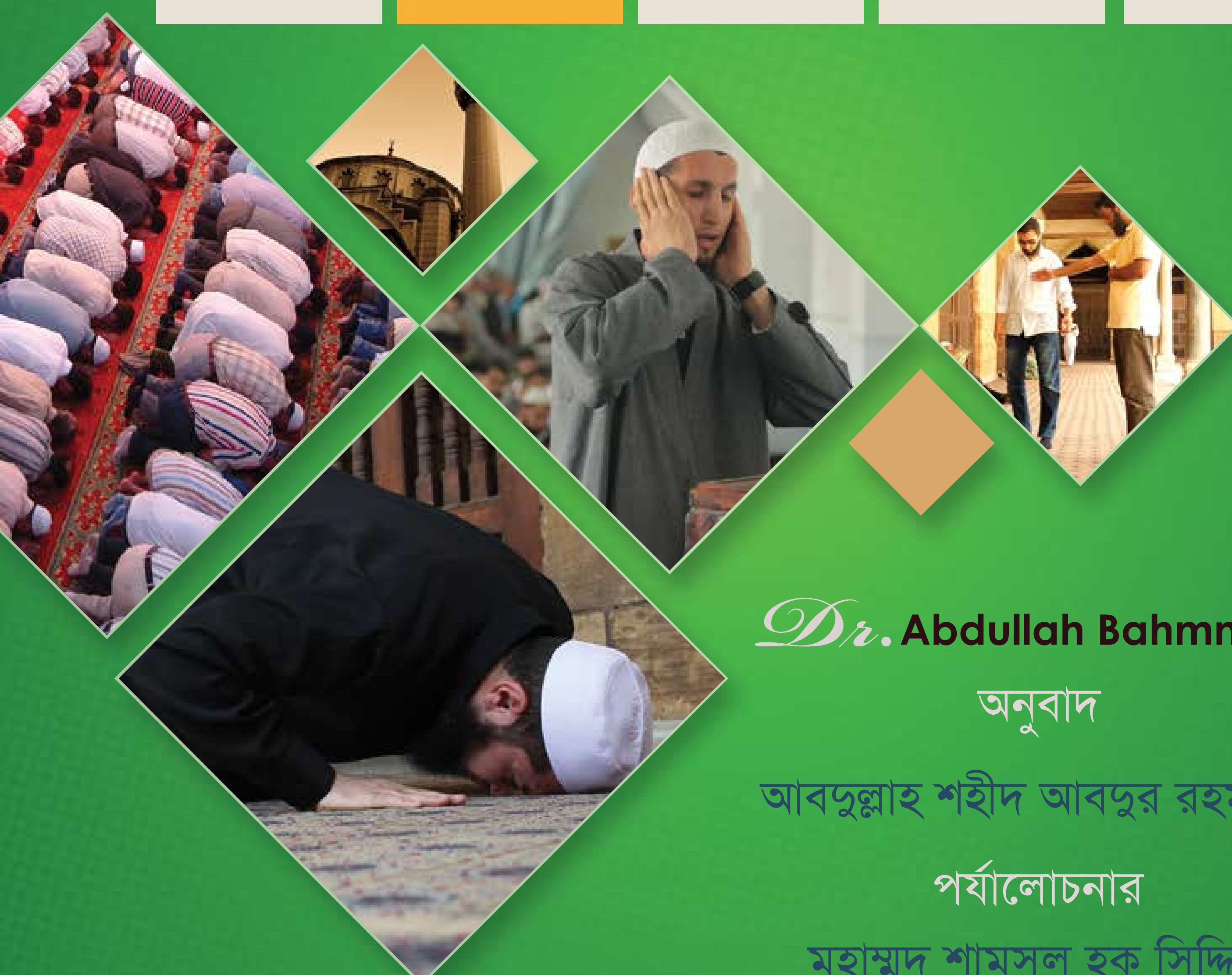
হাই তোলার সময় মুখ চেপে ধরা। যথাসাধ্য হাঁচি থামাতে চেষ্টা করা।

ইকামতের সময় حي على الفلاح বলার মুহূর্তে ইমাম ও মুক্তাদী সবাইকে দাঁড়িয়ে যাওয়া।

আলোকচিত্রে ইবাদত

সহজ সরল উপয়ে ইসলামের বিধি-বিধান শেখা

পবিত্রতা | নামাজ | রোজা | যাকাত | হজ্ব



Dr. Abdullah Bahmmam

অনুবাদ

আবদুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান

পর্যালোচনার

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

সিজদায়ে সাহু, সিজদায়ে তিলাওয়াত ও সিজদায়ে শোকর

১০ সিজদায়ে সাহু, সিজদায়ে তিলাওয়াত ও সিজদায়ে শোকর

সূচীপত্র

প্রথমত: সিজদায়ে সাহু

সিজদায়ে সাহু

ভুলের কারণে নামাজে যে ত্রুটি সৃষ্টি হয়েছে তা শুধরানোর জন্য মুসল্লী কর্তৃক প্রদত্ত দুই সিজদাকেই সিজদায়ে সাহু বলে।

সিজদায়ে সাহুর কারণ

- যে ব্যক্তি নামাজের ওয়াজিবসমূহের মধ্য থেকে কোনো একটি ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিল সে গুনাহগার হলো এবং তার নামাজ নষ্ট হয়ে গেল। এমতাবস্থায় তাকে উক্ত নামাজ পুনরায় আদায় করতে হবে। নামাজের যেসব ত্রুটি সিজদায়ে সাহুর মাধ্যমে শুধরিয়ে নেয়া যায় তা হলো:
- ফরজ নামাজের প্রথম দুই রাকাআতে বা এক রাকাআতে সূরা ফাতিহা পড়তে ভুলে যাওয়া। অনুরূপভাবে নফল নামাজ ও বিতরের নামাজের সকল রাকাতে সূরা ফাতিহা পড়তে ভুলে যাওয়া।
- সূরা ফাতিহার পর ছোট একটি সূরা অথবা ছোট ছোট তিন আয়াত অথবা লম্বা একটি পরিমাণ ফরজ নামাজের প্রথম দু রাকাআতে এবং নফল ও বিতরের যেকোনো রাকাআতে পড়তে ভুলে যাওয়া।
- নামাজ ভেদে প্রকাশ্যে অথবা গোপনীয়ভাবে কিরাত পড়ার যে নিয়ম রয়েছে তা ভঙ্গ করা। অতএব যদি কোনো ইমাম যোহর আসরের নামাজে প্রকাশ্যে কিরাত পড়ে অথবা মাগরিব, এশা ও ফজরের কিরাত গোপনীয়ভাবে আদায় করে তবে সিজদায়ে সাহু দিয়ে নামাজের ত্রুটি শুধরিয়ে নিতে হবে।
- তিন রাকাআত অথবা চার রাকাআতবিশিষ্ট নামাজে প্রথম বৈঠক ভুলে যাওয়া।
- শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়তে ভুলে যাওয়া।
- একই রাকাতে যে বিষয়টি দুই বার করতে হয় তা আদায়ের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা ভুলে যাওয়া। যেমন কোনো ব্যক্তি কেবল এক সিজদা আদায় করে দ্বিতীয় সিজদা আদায় করতে ভুলে গেল এবং দ্বিতীয় রাকাআতের জন্য দাঁড়িয়ে গেল। এরপর নামাজের শেষাংশে তা মনে পড়লে সিজদা করে নিল। এমতাবস্থায় ধারাবাহিকতা ভঙ্গ হওয়ার কারণে তাকে সিজদায়ে সাহু দিতে হবে। আর যে বিষয়টির একই রাকাআতে পুনরাবৃত্তি ঘটে না, যেমন কোনো তাকবীরে তাহরিমার পর রুকুতে চলে গেল এবং রুকু থেকে উঠে সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা তিলাওয়াত করল। এমতাবস্থায় পুনরায় তাকে রুকু করতে হবে এবং নামাজান্তে সিজদায়ে সাহু দিতে হবে। অনুরূপভাবে যথাসময়ে যদি তিলাওয়াতের সিজদা আদায় না করা হয় তবুও সিজদা সাহু দিতে হবে। আর নামাজের ফরজ কর্মসমূহ তার স্থান থেকে পিছিয়ে দেয়া অথবা একটার জায়গায় আরেকটা করা, যেমন যে সময়ে বসা উচিত তখন দাঁড়িয়ে গেল অথবা এর উল্টোটা করল, এমতাবস্থায় তাকে সিজদায়ে সাহু দিতে হবে।
- রুকু ও সিজদায় ধীর-স্থিরতা ছেড়ে দেয়া।
- ফরজ নামাজে কিরাত পড়ার যথার্থ নিয়ম ভঙ্গ করা। যেমন অন্য কোনো সূরা পড়ার পর সূরা ফাতিহা পড়া অথবা প্রথম দুই রাকাতে কিরাত না পড়ে শেষ দুই রাকাতে কিরাত পড়া। অথবা কেবল দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাকাআতে কিরাত পড়া। এমতাবস্থায় সিজদায়ে সাহু দেয়া ওয়াজিব হবে।
- দুআয়ে কুনূত পড়তে ভুলে যাওয়া।
- ঈদের নামাজে অতিরিক্ত তাকবীর ভুলে যাওয়া অথবা দ্বিতীয় রাকাতে রুকুতে যাওয়ার তাকবীর ভুলে যাওয়া।

সন্দেহ করা

সন্দেহ অর্থ দু বিষয়ের মধ্যে কোনটি করেছে তা নিয়ে ইতস্ততায় পড়া

- যদি প্রথম রাকাআতে তাশাহহুদ এর কোনো কিছু বাড়িয়ে পড়ে, যেমন ভুলে দরুদ পড়ে ফেলল অথবা একটি রুকন আদায় করা যায় পরিমাণ সময় চুপচাপ বসে রইল।

সন্দেহ করা

নামাজের ক্ষেত্রে দু ধরনের সন্দেহ হতে পারে:

১- নামাজ সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর সন্দেহ করা

এ প্রকৃতির সন্দেহ হিসাবে আনা হবে না।

এর উদাহরণ: এক ব্যক্তি ফজরের নামাজের পর, নামাজ কি দু রাকাত পড়ল না তিন রাকাত, এ নিয়ে সন্দেহ করল? এমতাবস্থায় এ সন্দেহের প্রতি নজর দেয়া হবে না। তবে যদি সন্দেহের স্থলে দৃঢ় বিশ্বাস তৈরি হয়, তাহলে সে অনুযায়ী আমল করবে।

২- নামাজে থাকাবস্থায় সন্দেহ করা:

এ প্রকৃতির সন্দেহেরও দু অবস্থা।

ক- সন্দেহযুক্ত দু বিষয়ের কোনো একটি তার কাছে রাজেহ বা প্রাধান্যপ্রাপ্ত মনে হবে:

এরূপ হলে যা তার কাছে প্রাধান্যপ্রাপ্ত বলে মনে হবে, সে অনুযায়ী আমল করবে এবং নিয়মমাফিক সিজদায়ে সাহু দেবে।

এর উদাহরণ: যোহরের নামাজ পড়ার সময় কারও সন্দেহ হলো, সে কি দ্বিতীয় রাকাতে আছে না তৃতীয় রাকাতে। কিন্তু তার কাছে তৃতীয় রাকাতে থাকার ব্যাপারটাই প্রাধান্যপ্রাপ্ত হলো, তাহলে এ রাকাতটিকে সে তৃতীয় রাকাত বলেই হিসেব করবে এবং নামাজ পূর্ণ করে নেবে। এরপর সিজদায়ে সাহু দেবে।

এর প্রমাণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস,«তোমাদের কারও যখন নামাজে সন্দেহ হবে, কোনটা সঠিক তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে। এরপর সালাম ফেরাবে এবং দুটি সিজদা করবে।» (বর্ণনায় ইবনে হিব্বান)



খ-দুটির মধ্যে কোনোটিই তার কাছে প্রাধান্যপ্রাপ্ত বলে মনে হবে না:

এ ক্ষেত্রে যা কম তার উপর ভিত্তি করে নামাজ সম্পন্ন করবে এবং সিজদায়ে সাহু দেবে।

এর উদাহরণ: যোহরের নামাজ পড়ার সময় কারও সন্দেহ হলো, সে কি দ্বিতীয় রাকাতে আছে না তৃতীয় রাকাতে? কিন্তু দু বিষয়ের কোনোটিই তার কাছে প্রাধান্যপ্রাপ্ত বলে মনে হলো না। এমতাবস্থায় সে যা কম তার উপর ভিত্তি করবে। অর্থাৎ ধরে নেবে যে, সে দ্বিতীয় রাকাতে আছে। এরপর নামাজ শেষ করে সালামের পূর্বেই সিজদায়ে সাহু দেবে।

এর প্রমাণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস,«তোমাদের কেউ যখন নামাজে সন্দেহ করল, অতঃপর সে জানল না তিন রাকাত পড়েছে কি চার রাকাত। এমতাবস্থায় সে যেন সন্দেহ দূরে ফেলে যেটুকুর ব্যাপারে সে নিশ্চিত সেটুকুর উপর ভিত্তি করে নেয়। এরপর সালাম ফেরানোর পূর্বেই যেন সে দুটি সিজদা দিয়ে নেয়।» (বর্ণনায় মুসলিম)



সিজদায়ে সাহু দেবে — সালাম ফেরাবে

কোনোকিছু অতিরিক্ত করা

অর্থাৎ নামাজে কোনোকিছু অতিরিক্ত আকারে আদায় করা, যেমন অতিরিক্ত রুকু অথবা সিজদা ইত্যাদি।

এরূপ বাড়িয়ে দেয়ার দু অবস্থা হতে পারে:

ক- মুসল্লী যখন কোনোকিছু বাড়িয়ে আদায় করছে, বিষয়টি ঠিক সে মুহূর্তেই মনে করতে পারল।

এমতাবস্থায় ওই কাজ থেকে ফিরে আসা আবশ্যক হবে। এরপর সে নামাজ সম্পন্ন করে ডান দিকে এক সালামের পর সিজদায়ে সাহু দিবে।

এর উদাহরণ: এক ব্যক্তি যোহরের নামাজ পড়া অবস্থায় পঞ্চম রাকাতের উদ্দেশে দাঁড়িয়ে গেল। এরপর সে তা রাকাতের ভিতরেই স্মরণ করতে পারল। এ অবস্থায় তার উচিত হবে সাথে সাথে বসে যাওয়া। নামাজ পূর্ণ করে নেয়া এবং নিয়ম মুতাবিক সিজদায়ে সাহু দেয়া।

খ- অতিরিক্ত কাজটি সম্পন্ন হওয়ার পর স্মরণ করতে পারা

এ অবস্থায় সে তার নামাজ সম্পন্ন করে নেবে। অতঃপর সালাম ফেরানোর পর সিজদায়ে সাহু দিয়ে নেবে।

এর দলিল, ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীস,হয়েছে?» তিনি বললেন,«তার মানে?» সাহাবী বললেন,«আপনি নামাজ পাঁচ রাকাত পড়েছেন।» এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাম ফেরানোর পর দুটি সিজদা দিলেন।» (বর্ণনায় বুখারী)

কোনোকিছু বাদ দেয়া

অর্থাৎ নামাজের কোনো ফরয বা ওয়াজিব বাদ দেয়া

১- নামাজের কোনো ফরয বাদ দেয়া

যদি এ ফরযকর্মটি তাকবীরে তাহরিমা হয়, তবে নামাজ বাতিল বলে গণ্য হবে; কেননা এ অবস্থায় নামাজ আদৌ শুরু হয়নি বলে ধরা হবে। আর যদি ফরযটি তাকবীরে তাহরিমা ব্যতীত অন্যকোনো ফরয হয়, তাহলে এর দু অবস্থা রয়েছে:



সালাম ফেরাবে — সিজদায়ে সাহু দেবে

ক- মুসল্লী হয়তো পরবর্তী রাকাতে ঠিক ওই ফরযটির জায়গায় পৌঁছলে তা স্মরণ করতে পারবে।

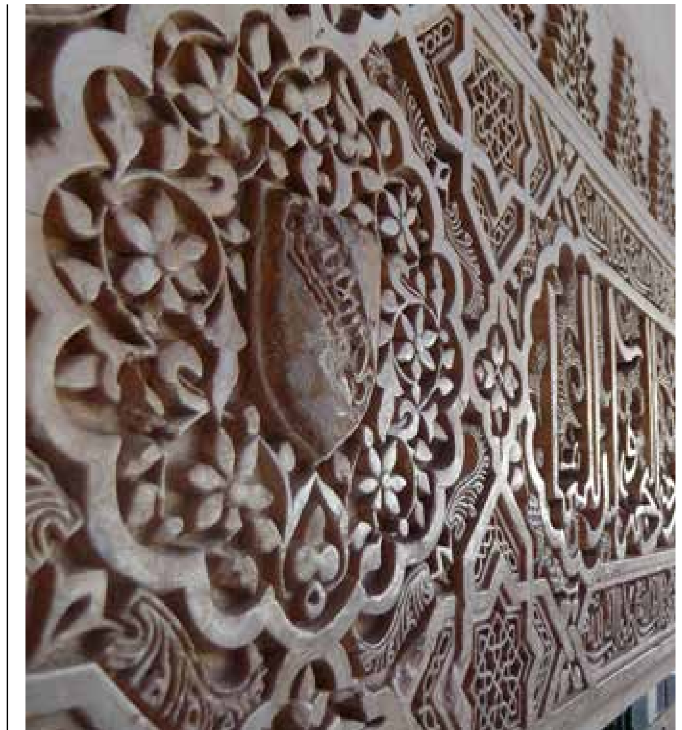
এমতাবস্থায় যে রাকাত থেকে ফরযটি ছুটে গিয়েছে সে রাকাতটি বাতিল করে দিয়ে পরবর্তী রাকাতটি তার জায়গায় হিসাব করবে।

এর উদাহরণ: এক ব্যক্তি প্রথম রাকাতে রুকু করতে ভুলে গেল। দ্বিতীয় রাকাতে রুকু করার সময় তার স্মরণ হলো যে প্রথম রাকাতে সে রুকু করতে ভুলে গিয়েছে। তাহলে এ রাকাতকেই সে প্রথম রাকাত হিসেবে ধরবে। আর প্রথম রাকাতটি হিসাবে আনবে না। এরপর সে তার নামাজ পূরণ করে নেবে এবং সালামের পর সিজদায়ে সাহু দেবে।

খ- পরবর্তী রাকাতে ওই ফরযটির জায়গায় পৌঁছার পূর্বেই মুসল্লীর তা স্মরণ হবে।

এ অবস্থায় সে বাদ-পড়া ফরযকর্মটি আদায় করে নেবে এবং তার পরের অংশটুকুও আদায় করবে। এরপর সে তার নামাজ পূরণ করে নেবে এবং সালামের পর সিজদায়ে সাহু দেবে।

এর উদাহরণ: একটি ব্যক্তি প্রথম রাকাতে দ্বিতীয় সিজদা এবং তার পূর্বে বসা ভুলে গেল। পরবর্তীতে সে তা দ্বিতীয় রাকাতের রুকু থেকে উঠার পর মনে করতে পারল। এমতাবস্থায় সে ফিরে আসবে, বসবে ও সিজদা করবে। এরপর সে তার নামাজ সম্পন্ন করবে এবং সালামের পর সিজদায়ে সাহু করবে।



২ - কোনো ওয়াজিবকর্ম বাদ দেয়া:

মুসল্লী যদি কোনো ওয়াজিব বাদ দেয়, তাহলে এর তিন অবস্থা হতে পারে:

ক-নামাজে এ ওয়াজিবকর্মটির জায়গা ছেড়ে যাওয়ার পূর্বেই তা স্মরণ হবে।

এমতাবস্থায় সে তা আদায় করে নেবে এবং এর জন্য সিজদায়ে সাহু দিতে হবে না।

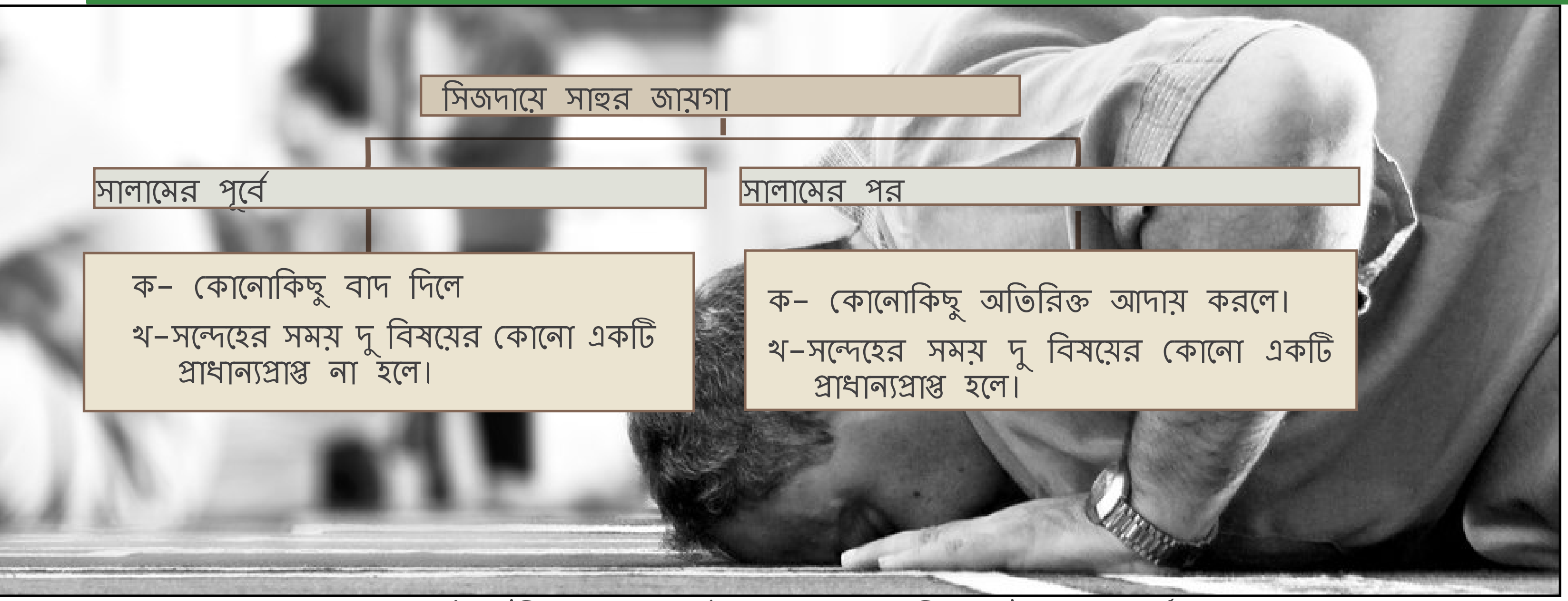
খ-ওয়াজিবকর্মটির জায়গা ছেড়ে যাওয়ার পর তা স্মরণ হবে, এর অব্যবহিত পরের ফরয কর্মে যাওয়ার পূর্বেই।

এমতাবস্থায় সে ফিরে যাবে এবং তা আদায় করে নেবে। এরপর নামাজ সম্পন্ন করে সালামের পর সিজদায়ে সাহু করে নেবে।

গ-ওই ওয়াজিবকর্মের পরবর্তী যে ফরয কর্ম তাতে পৌঁছার পর বিষয়টি স্মরণ হবে।

এমতাবস্থায় মুসল্লী তার নামাজ চালিয়ে যাবে এবং ছুটে যাওয়া ওয়াজিবকর্মটি আদায় করতে যাবে না। পরিশেষে সে সিজদায়ে সাহু দিয়ে নেবে।

এর উদাহরণ: এক ব্যক্তি দ্বিতীয় রাকাতে দ্বিতীয় সিজদা আদায়



করার পর তাশাহহুদ না পড়েই দাঁড়িয়ে যাওয়ার উপক্রম করল। কিন্তু দাঁড়ানোর পূর্বেই স্মরণ করতে পারল যে তাশাহহুদ পড়া বাদ পড়ে গেছে। এমতাবস্থায় সে বসে গিয়ে তাশাহহুদ পড়ে নেবে। বাকী নামাজ সম্পন্ন করবে এবং এ জন্য ক্ষতিপূরণমূলক কোনো কিছু করতে হবে না।

আর যদি সিজদা থেকে উঠার পর একেবারে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পূর্বে বিষয়টি স্মরণ হয়, তাহলে ফিরে যাবে এবং বসে গিয়ে তাশাহহুদ পড়ে নেবে। এরপর নামাজ পূর্ণ করে নেবে এবং সালামের পর সিজদায়ে সাহু দেবে।আর যদি সম্পূর্ণরূপে দাঁড়িয়ে যাওয়ার পূর্বে স্মরণ হয়, তাহলে তাশাহহুদ পড়ার প্রয়োজন হবে না। বরং সে এভাবেই নামাজ সম্পন্ন করে নেবে এবং সিজদায়ে সাহু দেবে।

এর দলিল আবদুল্লাহ ইবনে বুহাইনা রাযি. এর হাদীস যে, «নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে নিয়ে যোহরের নামাজ পড়লেন। তিনি না বসে দাঁড়ানো অবস্থায় প্রথম দু রাকাত আদায় করলেন। মানুষও তাঁর সাথে দাঁড়াল। তিনি যখন নামাজ শেষ করলেন, আর মানুষ তাঁর সালাম ফেরানোর অপেক্ষায়, তখন তিনি বসা অবস্থায়, তাকবীর দিলেন এবং সালাম ফেরানোর পূর্বেই দুটি সিজদা করলেন। এরপর সালাম ফেরালেন।» (বর্ণনায় বুখারী)

সিজদায়ে সাহুর বিবরণ

মুসল্লী ডান দিকে এক সালাম ফেরাবে, এরপর ঠিক নামাজের সিজদার ন্যায় সিজদা দেবে। তাশাহহুদ, দরুদ ও দুআ পড়বে। পরিশেষে সালাম দিয়ে বের হয়ে যাবে।



মাসায়েল

১- মুসল্লী যদি নামাজ সম্পন্ন করার আগেই সালাম ফিরিয়ে দেয় এবং বেশ কিছু সময় চলে যাওয়ার পর তা মনে করতে পারে, তাহলে পুনরায় নামাজ পড়তে হবে। আর যদি সামান্য সময় পর মনে করতে পারে, যেমন দুই তিন মিনিট, তাহলে নামাজ সম্পন্ন করে নেবে এবং সিজদায়ে সাহু দিয়ে নেবে।

২- মুকতাদীর উচিত সিজদায়ে সাহুতে ইমামের অনুকরণ করা যদিও সে সাহু বা ভুল হওয়ার পর নামাজে শরীক হয়।

৩- মুসল্লীর যদি দুটি সাহু একত্রিত হয়, যার একটি অনুযায়ী সালামের পূর্বে এবং অপরটি অনুযায়ী সালামের পরে সিজদায়ে সাহু দেয়া আবশ্যক হয়, তাহলে সালামের পূর্বে একবার সিজদায়ে সাহু আদায় করলেই চলবে।



দ্বিতীয়ত: সিজদায়ে শোকর

সিজদায়ে শোকর
কোনো নিয়ামত অর্জন হলে অথবা কোনো খুশীর সংবাদ পেলে

সিজদায়ে শোকর শরীয়তভুক্ত হওয়ার দলিল আবু বাকরা রাযি. এর হাদীস- যখন কোনো খুশীর বিষয় আসত অথবা কোনো সুসংবাদ দেওয়া হত তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায়ের উদ্দেশে সিজদারত হতেন। (বর্ণনায় আবু দাউদ)

সিজদায়ে শোকরের পদ্ধতি

তাকবীর দিয়ে সিজদায় যাবে এবং বলবে, »سبحان ربي الأعلى« অতঃপর প্রাপ্ত নিয়ামতের জন্য আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় করবে। এরপর তাকবীর ব্যতীতই সিজদা থেকে উঠবে এবং শেষে সালাম ফেরানোরও কোনো বিধান নেই।

নামাজে সিজদায়ে শোকর

নামাজরত অবস্থায় যদি কোনো খুশীর সংবাদ আসে এবং নামাজের ভিতরেই শোকর আদায়ের সিজদা প্রদান করে, তবে তার নামাজ বাতিল বলে গণ্য হবে; কেননা সিজদায়ে শোকরের নামাজের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই।

তৃতীয়ত: তিলাওয়াতের সিজদা

সিজদায়ে তিলাওয়াত
কুরআন তিলাওয়াতকারী সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করার ফলে যে সিজদা দিয়ে থাকে, তাকেই সিজদায়ে তিলাওয়াত বলে।

ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, «রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকটে সিজদাবিশিষ্ট সূরা তিলাওয়াত করতেন। অতঃপর তিনিও সিজদা দিতেন, আমরাও সিজদা দিতাম।» (বর্ণনায় বুখারী)

যখন কুরআন তিলাওয়াতকারী নামাজে কোনো সিজদার

আয়াত তিলাওয়াত করে- হোক তা প্রকাশ্য কিরাতের নামাজ বা অপ্রকাশ্য কিরাতের- অথবা নামাজের বাইরে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে তখন সিজদা দেয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে। আর তিলাওয়াতের সিজদার জন্য অজু থাকা জরুরি।

সিজদায়ে তিলাওয়াতের পদ্ধতি

তিলাওয়াতকারী অথবা শ্রোতা তাকবীর বলে সিজদায় চলে যাবে এবং বলবে, سبحان ربي الأعلى

এরপর বলবে:

سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته اللهم اكتب لي بها عندك أجراً، وضع عني بها وزراً، واجعلها لي عندك ذُخراً، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود

এরপর তাকবীর দেবে এবং সিজদা থেকে উঠবে। আর যদি নামাজের বাইরে থাকে তাহলে তাকবীর দেবে না এমনকী সালামও ফেরাবে না। (বর্ণনায় তিরমিযী)



সিজদার আয়াতসমূহ

সূরা আল আরাফ, আয়াত নং	(২০৬)	সূরা আলিফ লাম আস সিজদা, আয়াত নং	(১৫)
সূরা আর রা»দ, আয়াত নং	(১৫)	সূরা সাদ, আয়াত নং	(২৪)
সূরা আন নাহল, আয়াত নং	(৪৯)	সূরা ফুসসিলাত, আয়াত নং	(৩৭)
সূরা আল ইসরা, আয়াত নং	(১০৭)	সূরা আন নাজম, আয়াত নং	(৬২)
সূরা মারয়াম, আয়াত নং	(৫৮)	সূরা আল ইনশিকাক, আয়াত নং	(২১)
সূরা আল হাজ্জ, আয়াত নং	(১৮)	সূরা আন নামল, আয়াত নং	(২৫)
সূরা আল ফুরকান, আয়াত নং	(৬০)	সূরা আল আলাক, আয়াত নং	(১৯)।

মাসায়েল

১- যদি মুসাফির ব্যক্তি যানবাহনের উপর থাকাবস্থায় সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে, তবে তার উচিত হবে নেমে গিয়ে সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করা। সম্ভব না হলে বাহনের উপরই মাথায় ইশারা করে সিজদা করে নেবে।

২- যদি তিলাওয়াতকারী একাধিকবার সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে, তাহলে একবার সিজদা করলেই যথেষ্ট হবে।

৩- নামাজ পড়ার নিষিদ্ধ সময়ে সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করা মাকরুহ।

৪- সিজদার আয়াত শ্রবণকারী যদি ইচ্ছাকৃতভাবে তিলাওয়াতকারীর তিলাওয়াত শুনতে থাকে, আর যদি তিলাওয়াতকারী সিজদা না করে, তাহলে শ্রবণকারীকেও সিজদা দিতে হবে না; কেননা সে তিলাওয়াতে তিলাওয়াতকারীর অনুসারী।

৫- শোনার উদ্দেশ্য না থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি সিজদার আয়াত শ্রবণ করল, যেমন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময়, অথবা পাশে কোথাও তিলাওয়াত হচ্ছে অথচ তাতে তার মনোযোগ নেই, এমতাবস্থায়ও সিজদা করা আবশ্যক যদি তিলাওয়াতকারী মানুষ হয়ে থাকে। আর যদি যন্ত্র অথবা তোতাপাখি হয় তবে সিজদা করা আবশ্যক নয়।

আলোকচিত্রে ইবাদত

সহজ সরল উপয়ে ইসলামের বিধি-বিধান শেখা

পবিত্রতা | নামাজ | রোজা | যাকাত | হজ্ব







Dr. Abdullah Bahmmam

অনুবাদ

আবদুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান

পর্যালোচনায়

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

জামাতের সাথে নামাজ

১১ জামাতের সাথে নামা



জামাতের সাথে নামাজের হুকুম

১-ইসলামি শরীয়ত সক্ষম পুরুষদেরকে জামাতের সাথে নামাজের নির্দেশ দিয়েছে। জামাত তরক করা থেকে হুঁশিয়ার করেছে। এমনকি অন্ধ ব্যক্তিকেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জামাত তরক করার অনুমতি দেন নি। শুধু তাই নয়, বরং যারা জামাতে নামাজ আদায় করে না তাদেরকে জ্বলিয়ে দেয়ার ইচ্ছাও তিনি পোষণ করেছিলেন।

জামাতে নামাজ আদায়ের গুরুত্ব বিষয়ে আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمۡ فَأَقَمۡتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلۡتَقُمۡ طَآئِفَةٞ مِّنۡهُم مَّعَكَ﴾

{আর যখন তুমি তাদের মধ্যে থাকবে। অতঃপর তাদের জন্য সালাত কায়েম করবে, তখন যেন তাদের মধ্য থেকে একদল তোমার সাথে দাঁড়ায়।} [সূরা আন-নিসা:১০২]

এখানে আল্লাহ তাআলা ভয় ও সফর হালতেও জামাতে নামাজ আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব নির্ভয় ও মুকীম অবস্থায় জামাতের সাথে নামাজ আদায়ের গুরুত্ব কতটুকু তা বলাই বাহুল্য।

২- আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, «মুনাফিকদের ওপর সবথেকে ভারি নামাজ হলো এশা ও ফজরের নামাজ। আর যদি তারা জানতো এ দুটোয় কি রয়েছে, তবে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এ দুটোয় অংশ নিত। আর নিশ্চয় আমি ইচ্ছা করেছি, যে নামাজের ব্যাপারে নির্দেশ দেব, অতঃপর তা দাঁড় করানো হবে। এরপর আমি এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দেব মানুষদেরকে নিয়ে নামাজ পড়তে। আর আমি কিছু লোক সংগে নিয়ে বের হয়ে যাবো, যাদের সাথে জ্বালানি কাঠের

সূচীপত্র



বোঝা থাকবে। অতঃপর এমন লোকদের কাছে যাব, যারা জামাতের সাথে নামাজ পড়তে আসে না। এরপর আমি তাদেরকে ভিতরে রেখেই তাদের বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দেব।» (র্বণনায় বুখারী ও মুসলমি)

৩- ওই অন্ধ ব্যক্তি-বিষয়ক হাদীস, যাকে মসজিদে আনা- নেয়ার জন্য কেউ ছিল না। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করল। উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, «তুমি কি আযান শুনতে পাও? লোকটি বলল,«হ্যাঁ, পাই»। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,« তাহলে তুমি সাড়া দাও।» (বর্ণনায় মুসলিম)

৪-ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, «যে ব্যক্তি আগামীকাল আল্লাহর সাথে মুসলমান হিসেবে সাক্ষাৎ করতে আগ্রহী, সে যেন এই নামাজগুলো সংরক্ষণ করে যেখানে এর আযান দেয়া হয়। আল্লাহ তাআলা তোমাদের নবীর জন্য হিদায়েতের নিয়মনীতি শরীয়তভুক্ত করেছেন। আর এগুলো সে হিদায়েতের নিয়মনীতির অন্তর্ভুক্ত। এতএব তোমরা যদি ঘরে নামাজ পড় যেভাবে এই পিছিয়ে-থাকা ব্যক্তি ঘরে নামাজ পড়ে, তবে তোমরা তোমাদের নবীর আদর্শ ছেড়ে দিলে। আর তোমরা যদি তোমাদের নবীর আদর্শ ছেড়ে দাও তাহলে অবশ্যই গোমরাহ হয়ে যাবে। যখন কোনো ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জন করে, অতঃপর সুন্দরভাবে অজু করে এই মসজিদগুলোর যেকোনো একটিতে যায়, আল্লাহ তার প্রতি পদক্ষেপের বিনিময়ে একটি নেকী লিখে দেন, একটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেন এবং একটি গুনাহ মাফ করেন। আমরা দেখতে পেরেছি যে, জামাতে নামাজ আদায় থেকে মুনাফিক ব্যক্তিই পিছিয়ে থাকে, যার নিফাক সবার কাছে জানা। আর এমনতো সময় ছিল, যখন কোনো ব্যক্তিকে অন্য দুই ব্যক্তি সাহায্য করে ধরে ধরে নিয়ে আসত এবং কাতারের মাঝে দাঁড় করিয়ে দিত।» (বর্ণনায় মুসলিম)



জামাতের সাথে নামাজ আদায়ের হিকমত ও ফজিলত

১- আল্লাহর প্রতি ঈমানের সূত্রে যারা পরস্পরে ভাই ও বন্ধুতে পরিণত হয়েছে, তাদের পরস্পরে পরিচিতি লাভ। তাদের মাঝে মহব্বত ও ভালোবাসা জোরদার করে তোলা; কেননা আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমানের সূত্র ধরে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা ও মহব্বত সৃষ্টি না হলে ঈমান এবং জান্নাত লাভের আশা করা দুষ্কর।

২- যে ব্যক্তি লাগাতার চল্লিশ দিন তাকবীরে তাহরিমা পেয়ে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করতে সক্ষম হলো, সে জাহান্নাম ও নিফাক থেকে নিষ্কৃতি লাভে সক্ষম হলো। আনাস রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন,«যে ব্যক্তি জামাতের সাথে তাকবীরে উলা পেয়ে চল্লিশ দিন নামাজ আদায় করল, তার জন্য দুটি নিষ্কৃতি লিখে দেয়া হলো, একটি হলো জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি, অপরটি হলো নিফাক থেকে নিষ্কৃতি। (বর্ণনায় তিরমিযী)

৩- মুসলমানদের মাঝে বিভিন্নতার অবসান ঘটিয়ে সংঘবদ্ধতা গড়ে তোলা এবং উত্তম ও ভালো কাজের প্রতি তাদের সকলের হৃদয় আকৃষ্ট করা।

৪- মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতার মনোভাব জোরদার করা।

৫- মুসলমানদের অন্তরসমূহ একসূত্রে বেঁধে দেয়া; কেননা একই কাতারে সাদা কালো, আরবি-আজমি, আবাল-বৃদ্ধ, ধনী-গরীব কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এক কাতারে এক ইমামের পিছনে, একই সময়ে, এক কিবলাকে সামনে নিয়ে দাঁড়িয়ে যায়।

৬- আল্লাহর শত্রুদেরকে রোষান্বিত করা; কেননা মুসলমানরা যতদিন মসজিদে নামাজ আদায়ের ব্যাপারে যত্নবান থাকবে ততদিন তারা শক্তিমান ও সুরক্ষিত হয়ে কালযাপন করতে সক্ষম হবে।

৭- গুনাহ মাফ হওয়া এবং দরজা বুলন্দ হওয়া। আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, «আমি কি তোমাদেরকে এমন বিষয়ের পথ দেখাব না, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা গুনাহসমূহ মাফ করে দেন এবং দরজা বুলন্দ করেন? তারা বললেন, নিশ্চয় দেখাবেন হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন,«কষ্ট সত্ত্বেও উত্তমরূপে অজু করা, মসজিদ পানে অধিক পদচারণা, এক নামাজের পর অন্য নামাজের অপেক্ষায় থাকা। এটাই হলো রিবাত তথা আল্লাহর ইবাদতে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখা।» (বর্ণনায় মুসলিম)

৮- একা নামাজ পড়ার তুলনায় জামাতের সাথে নামাজ পড়ার ছাওয়াব সাতাশগুন বেশি। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, «জামাতের সাথে নামাজ আদায় একা নামাজ আদায়ের চেয়ে সাতাশগুন বেশি ফজিলতপূর্ণ।» (বর্ণনায় বুখারী)

ঘরে জামাতের সাথে নামাজজ আদায়

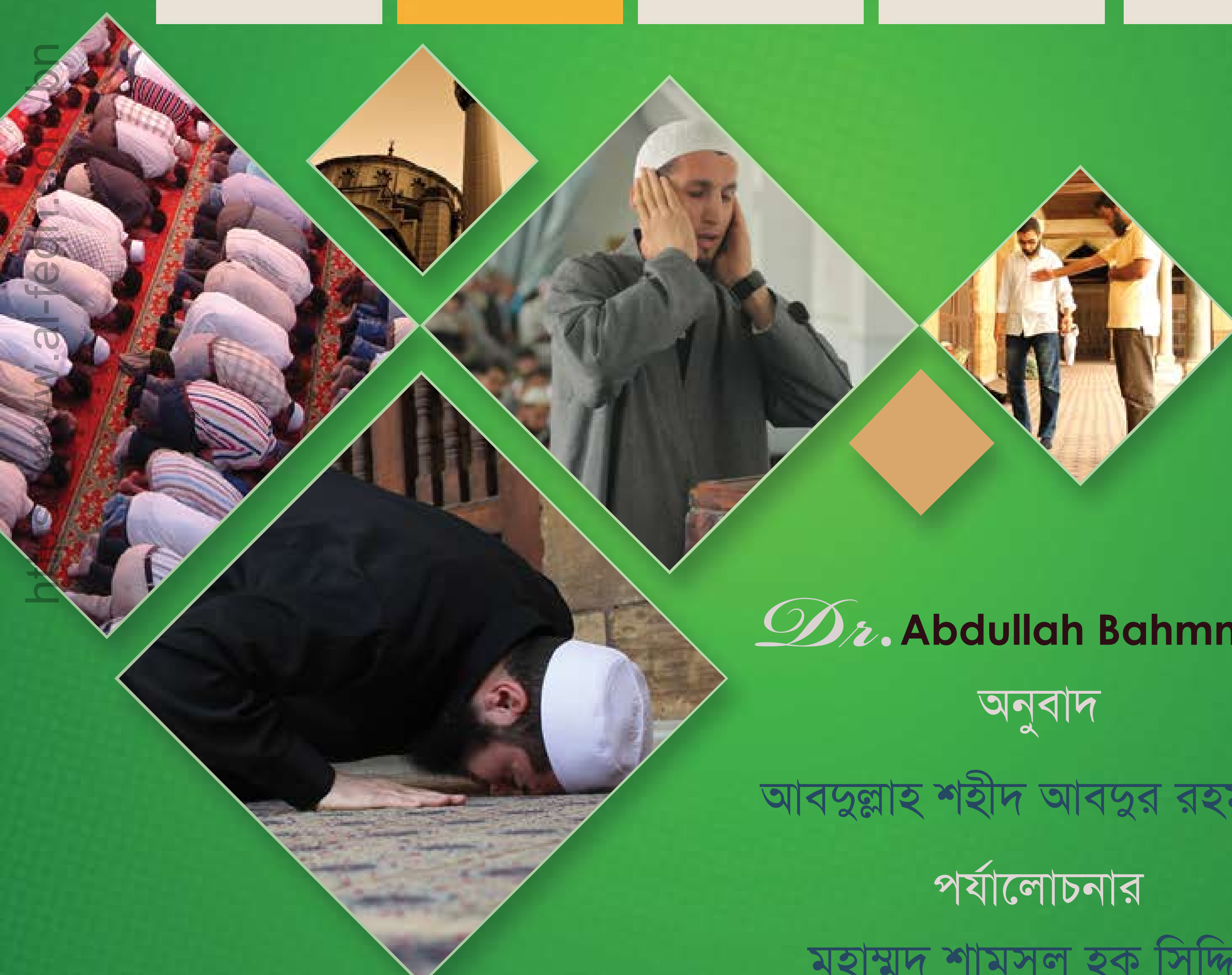
মসজিদ কাছে থাকা সত্ত্বেও এক বা একাধিক ব্যক্তির জন্য ঘরে নামাজ পড়া উচিত নয়। হ্যাঁ, যদি মসজিদ দূরে হয় অথবা আযান শোনা যায় না তাহলে ঘরে নামাজ পড়লে কোনো সমস্যা হবে না।



আলোকচিত্রে ইবাদত

সহজ সরল উপয়ে ইসলামের বিধি-বিধান শেখা

পবিত্রতা	নামাজ	রোজা	যাকাত	হজ্ব



Dr. Abdullah Bahmmam

অনুবাদ

আবদুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান

পর্যালোচনার

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

ইমামতি ও ইমামের ইকতিদা

১২ ইমামতি ও ইমামের ইকতিদা

সূচীপত্র

যে ইমামতি করার অধিক হকদার

এ ক্ষেত্রে তরতীব হলো নিম্নরূপ:

প্রথমত: আল্লাহর কিতাব অধিক পাঠকারী: অর্থাৎ যে ব্যক্তির অধিক কুরআন মুখস্থ আছে এবং কুরআনের হুকুম-আহকাম বিষয়ে অধিক অধিক সমঝদার।

দ্বিতীয়ত: সুন্নতে নববী সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী: অর্থাৎ যে সুন্নতে নববীর হুকুম আহকাম, অর্থ ও ভাব সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী।

তৃতীয়ত: হিজরতের ক্ষেত্রে অগ্রগামী: অর্থাৎ যে ব্যক্তি দারুল কুফর থেকে দারুল ইসলামে অন্যদের তুলনায় আগে হিজরত করেছে। আর যদি হিজরত না থাকে তাহলে যে ব্যক্তি তাওবা ও গুনাহ পরিত্যাগের ক্ষেত্রে অন্যদের তুলনায় আগে।

চতুর্থত: অন্যদের তুলনায় বয়সে যিনি বড়: যদি উল্লিখিত বিষয়ের ক্ষেত্রে সবাই সমান হয় সেক্ষেত্রে এ বিষয়টি প্রযোজ্য।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, «যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব অধিক পাঠকারী সে মানুষের ইমামতি করবে। যদি আল্লাহর কিতাব অধিক পাঠের ক্ষেত্রে মানুষ সমান হয়, তাহলে যে ব্যক্তি সুন্নত সম্পর্কে বেশি জ্ঞানী। আর যদি সুন্নতের ক্ষেত্রে সবাই সমান হয়, তাহলে যে হিজরতের ক্ষেত্রে অধিক পুরাতন। আর যদি হিজরতের ক্ষেত্রে সবাই সমান হয়, তাহলে ইসলামের ক্ষেত্রে যে অধিক পুরাতন।» (বর্ণনায় মুসলিম)

মসজিদে ইমাম নিয়োগের সময় অথবা যে মসজিদের সুনির্দিষ্ট কোনো ইমাম নেই সে মসজিদে জামাতের সাথে নামাজ পড়ার সময় এ ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হবে। পক্ষান্তরে যদি ইমামতির জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো লোক থাকে, অথবা বাড়ির মালিক ইমাম হন, কর্ণধার ব্যক্তি তার অধীনস্থদের ইমাম হন, এ ক্ষেত্রে তাকেই ইমামতির জন্য এগিয়ে দিতে হবে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, «অধিপতি ব্যক্তির অধীনস্থ কেউ যেন তার ইমামতি করতে না যায়, আর বাড়ির মালিকের অনুমতি ব্যতীত কেউ যেন বসার জন্য তৈরি করে রাখা জায়গায় না বসে।» (বর্ণনায় বুখারী)

ইমাম ও মুকতাদীর দাঁড়ানোর স্থান

১-মুকতাদী একজন হলে: ইমামের বরাবর ডানে দাঁড়াবে। ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন,,«আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এক রাতে নামাজ পড়েছি, অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বামে দাঁড়িয়েছি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পেছন দিক থেকে আমার মাথা ধরে তাঁর ডানে এনে দাঁড় করালেন।» (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

২-জামাত যদি দুজন বা দুজনের অধিক লোকের হয়, তাহলে ইমাম তাদের সম্মুখে ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়াবে। এর প্রমাণ জাবের ও জিবার রাযি. এর হাদীস যে, তাদের দুজনের একজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ডানে অন্যজন বামে দাঁড়ালেন। জাবের রাযি. বলেন,«অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের দুজনের হাত ধরে পেছনে সরিয়ে দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলেন।» (বর্ণনায় মুসলিম)

নামাজে নারীদের দাঁড়ানোর পদ্ধতি

১- শুধু নারীরা যদি জামাতের সাথে নামাজ আদায় করে, তবে সুন্নত হলো তাদের ইমাম তাদের কাতারের মাঝেই দাঁড়াবে। সামনে দাঁড়াবে না।

২- নারী পুরুষের পেছনে দাঁড়াবে যদি পুরুষ নারীর ইমাম হয়। আর যদি পুরুষদের জামাতের সাথে নামাজ আদায় করে তবে পুরুষদের কাতারের পেছনে দাঁড়াবে।

৩- যদি একদল নারী পুরুষদের জামাতের সাথে নামাজ আদায় করতে যায়, তবে সুন্নত হলো নারীরা পুরুষদের থেকে দূরুত্বে পেছনে, পুরুষদের কাতারের মতোই কাতার করে দাঁড়াবে। আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিও ওয়া সাল্লাম বলেন,«নারীদের সর্বোত্তম কাতার হলো শেষ কাতার এবং নিকৃষ্টতম কাতার হলো প্রথম কাতার।» (বর্ণনায় ইবনে মাজাহ)



রেডিওতে সম্প্রচারিত নামাজে ইকতিদা করা



নারীদের নামাজ



পুরুষের পাশে নারী

ইমামের পিছনে ইকতিদা করা বিষয়ক কিছু আহকাম

১- ঘর থেকে মাইকের আওয়াজ শুনে বা রেডিও টেলিভিশনে সম্প্রচারিত নামাজের ইমামের সাথে ইকতিদা করে নামাজ আদায় করা শুদ্ধ নয়।

২- মসজিদের বাইরে থেকে ইমামের ইকতিদা করা শুদ্ধ হবে যদি কাতার সংযুক্ত থাকে।

৩- মসজিদের ছাদে অথবা ইমামের দাঁড়ানোর স্তর থেকে নিচে নামাজ পড়া বৈধ রয়েছে, যদি ইমামের আওয়াজ শোনা যায়।

৪- নফল নামাজ আদায়কারীর পেছনে ফরয নামাজ আদায়কারীর ইকতিদা করা শুদ্ধ নয়। তবে এর উল্টোটা শুদ্ধ । (বর্ণনায় বুখারী)

ইমামের পূর্বে কোনোকিছু করে ফেলা।

১- মুকতাদীর উচিত ইমামের অনুকরণ করা। অর্থাৎ ইমাম যখন কোনো কিছু করবে এর অব্যবহিত পরেই মুকতাদী তা করবে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,«ইমাম এ জন্য রাখা হয়েছে যে মানুষ তার অনুকরণ করবে। অতঃপর সে যখন তাকবীর দেবে তখন তোমরাও তাকবীর দাও। যখন রুকু করবে তোমরাও রুকু করো। যখন সিজদা করবে তোমরাও সিজদা করো।» [বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম]

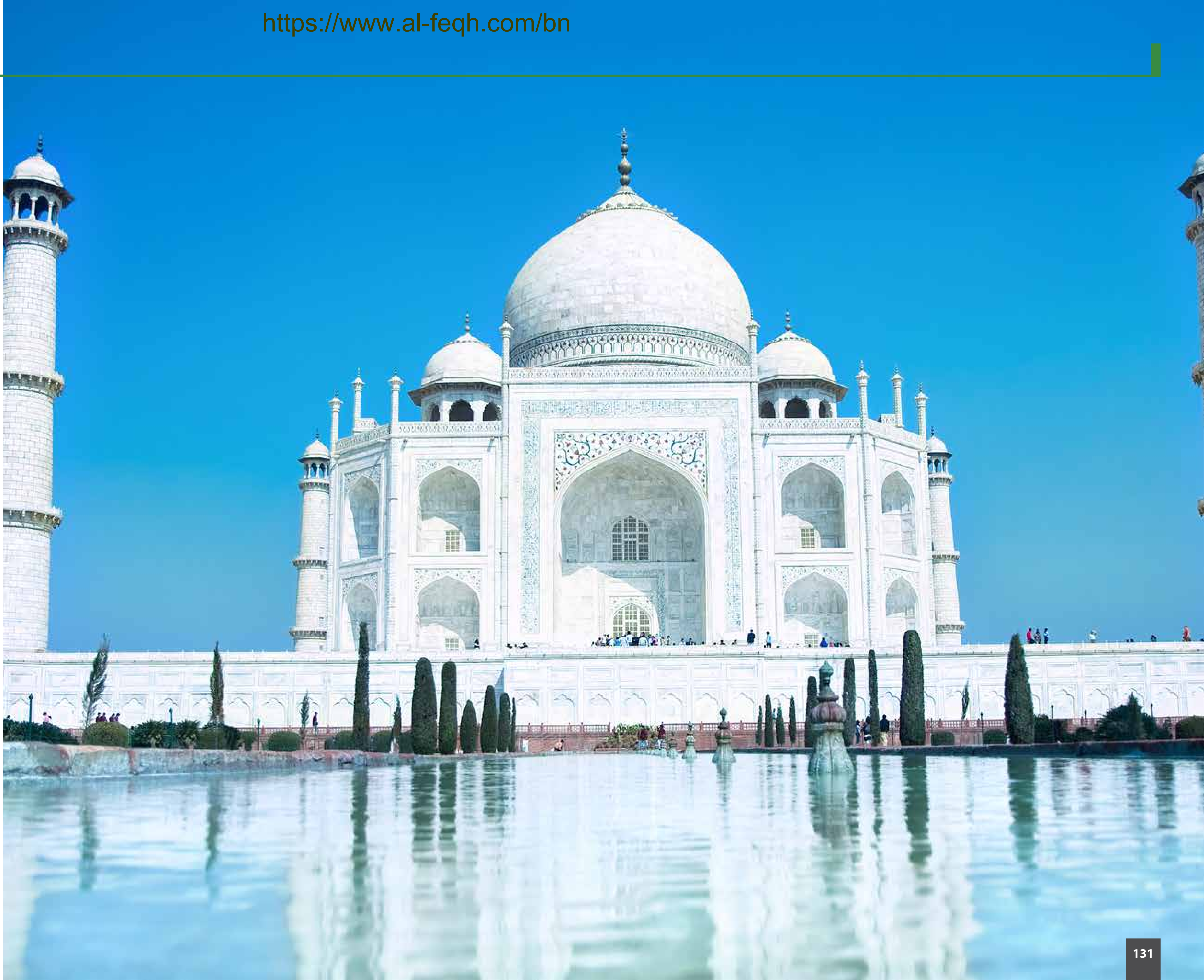
২- ইমামের পূর্বে কোনোকিছু করে ফেলা হারাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জোর দিয়ে এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন,«তোমাদের কেউ কি আশঙ্কা করে না যে, সে যখন ইমামের পূর্বে মাথা উঠিয়ে ফেলবে, আল্লাহ তার মাথাকে গাধার মাথায় পরিণত করবেন, অথবা তার আকৃতিকে গাধার আকৃতিতে রুপান্তরিত করবেন?»

(বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

অজুবিহীন ব্যক্তির পেছনে নামাজ

অজুবিহীন ব্যক্তির পেছনে নামাজ পড়া শুদ্ধ নয়। কিন্তু যদি এ ব্যাপারে নামাজ শেষ হওয়ার পর জানা যায়, তবে মুকতাদীর নামাজ শুদ্ধ হয়েছে বলে ধরা হবে। তবে ইমামকে পুনরায় তার নামাজ আদায় করে নিতে হবে।





আলোকচিত্রে ইবাদত

সহজ সরল উপয়ে ইসলামের বিধি-বিধান শেখা

পবিত্রতা | নামাজ | রোজা | যাকাত | হজ্ব





Dr. Abdullah Bahmmam

অনুবাদ

আবদুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান

পর্যালোচনার

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

ওযরগ্রস্ত বা অসুস্থ ব্যক্তি ও মুসাফিরের নামাজ

১৩ ওযরগ্রস্ত ব্যক্তিদের নামাজ

যাদের কোনো ওযর রয়েছে
অসুস্থতা, সফর ও ভয়

অসুস্থ ব্যক্তির নামাজ

অসুস্থ ব্যক্তি তার সাধ্য মতো নামাজ পড়বে। অতএব সে যদি সুস্থ ব্যক্তির মতোই সবকিছু করতে পারে, তবে সেভাবেই করবে। আর যদি না পারে তবে সাধ্য অনুযায়ী যেভাবে পারে সেভাবে পড়বে।

অসুস্থ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে পারে তবে দাঁড়িয়েই পড়বে। আর যদি দাঁড়িয়ে পড়তে না পারে, তা হলে বসে বসে পড়বে। আর যদি বসেও পড়তে না পারে তাহলে কাত হয়ে শুয়ে চেহারা কিবলার দিকে করে নামাজ পড়বে। যদি কাত হয়ে শুয়ে সম্ভব না হয়, তা হলে, সম্ভব হলে, চিৎ হয়ে শুয়ে কিবলার দিকে পা দিয়ে নামাজ পড়বে, এটাও যদি সম্ভব না হয়, তাহলে যেভাবে সম্ভব সেভাবেই পড়বে।

এ সবের দলিল হলো আল্লাহ তাআলার বাণী,«অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় করো।»

হাদীসে এসেছে ইমরান ইবনে হুসাইনকে লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,«তুমি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ো, যদি না পার তাহলে বসে, যদি না পার তাহলে শুয়ে।» (বর্ণনায় বুখারী)

অসুস্থ ব্যক্তির নামাজের আহকাম

১. যদি অসুস্থ ব্যক্তি বসে নামাজ পড়ে এবং সিজদা দিতে সক্ষম হয় তবে সিজদা দেয়া তার জন্য ওয়াজিব হবে।

২. যদি বসে নামাজ পড়ে এবং সিজদা দিতে অক্ষম হয় তাহলে শরীর দিয়ে রুকু ও সিজদার জন্য ইশারা দেবে। সিজদা রুকুর চেয়ে একটু নিচু হবে। শরীর দিয়ে ইশারা করা সম্ভব না হলে মাথা দিয়ে ইশারা করবে। অনুরূপভাবে যখন চিৎ হয়ে শুয়ে নামাজ পড়বে তখনও মাথা দিয়ে ইশারা দিবে।

৩. যদি প্রতি নামাজের জন্য অসুস্থ ব্যক্তির অজু করা সম্ভব না হয় অথবা প্রতি ওয়াক্তে নামাজ পড়া কষ্টকর হয়, তাহলে যোহর ও আসর, মাগরিব ও ইশা একসাথে জমা করে পড়বে। অসুস্থ ব্যক্তির সুবিধামতো প্রথমটার সময় অথবা শেষটার সময় একত্র করে পড়তে পারবে।

৪. যতক্ষণ পর্যন্ত হুঁশ-জ্ঞান ঠিক থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত নামাজ মাফ হবে না। অতএব অসুস্থ ব্যক্তির অসুস্থতার অজুহাতে এ ব্যাপারে অবহেলা করা কখনো উচিত হবে না। বরং নামাজ আদায়ের ব্যাপারে সাধ্যমতো চেষ্টা করে যেতে হবে।

৫. যদি অসুস্থ ব্যক্তি কিছু দিন চেতনাহীন হয়ে পড়ে থাকে। আবার কিছু দিনের জন্য চৈতন্য ফিরে পায়, তাহলে চেতনাবস্থায় সে সাধ্যমতো নামাজ আদায় করবে। আর অচেতন অবস্থার নামাজগুলো তার কাযা করতে হবে না যদি অচেতন অবস্থা বেশি দীর্ঘায়িত না হয়, যেমন মাত্র একদিন অচেতন হয়ে রইল, এমতাবস্থায় যখন সম্ভব ওই দিনের নামাজ কাযা করে নেবে।

সূচীপত্র



কেবলামুখী



নামাজ শুরু ও সূরা ফাতিহা পাঠ



রুকুর জন্য ইশারা করা



সিজদার জন্য ইশারা করা

মুসাফিরের নামাজ

চার রাকাতবিশিষ্ট নামাজ, যেমন যোহর আসর ও ইশা কসর করে দু রাকাত পড়া মুসাফিরের জন্য ওয়াজিব। আল্লাহ তাআলা বলেন, {আর যখন তোমরা জমিনে সফর করবে, তখন তোমাদের নামাজ কসর করাতে কোন দোষ নেই। যদি আশঙ্কা কর যে, কাফিররা তোমাদেরকে ফিতনায় ফেলবে। নিশ্চয় কাফিররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু} [সূরা নিসা:১০১]

হাদীসে এসেছে, আনাস ইবনে মালিক রযি. বলেন, «আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে মদীনা থেকে মক্কার উদ্দেশে বের হয়েছি। তিনি মদীনায় ফিরে আসা পর্যন্ত আমাদেরকে নিয়ে (চার রাকাতবিশিষ্ট নামাজ) দু রাকাত করে আদায় করেছেন।» [বর্ণনায় নাসায়ী]

সফর বলতে যা বুঝায়

যে সফরে কসর করে নামাজ পড়া ওয়াজিব এবং রমজানে রোজা ভঙ্গ করা বৈধ তার সর্বনিম্ন দূরত্ব হলো পায়ে হেঁটে অথবা উটে চড়ে মধ্যম গতিতে চলার তিনদিনের পথ। অবশ্য আলেমদের কারও কারও নিকট প্রথাগতভাবে যাকে সফর বলা হয় সেটাই হলো নামাজ কসর করা বৈধ হওয়ার সফর।

নামাজ কসর করা

১. মুসাফির যে এলাকায় বসবাস করে সে এলাকার বাড়ীঘর অতিক্রম করার পর থেকে কসর শুরু হবে। দারুল ইকামত অর্থাৎ আবাস এলাকায় থাকাবস্থায় কসর করা জায়েয নয়; কেননা নিজ এলাকা ছেড়ে যাওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কসর করেছেন বলে কোনো বর্ণনায় আসেনি।

২. মুসাফির যখন কোনো এলাকায় পৌঁছবে এবং ১৫ দিন অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নেবে তখন সে মুকীম হয়ে যাবে এবং তার জন্য পূর্ণাঙ্গরূপে নামাজ আদায় করা ওয়াজিব হবে। আর যদি ১৫ দিনের কম সময়ের জন্য অবস্থানের সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে তার জন্য কসর করা ওয়াজিব হবে। আর যদি, কতদিন থাকবে এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবে সিদ্ধান্ত না নেয়, বরং যে কজের উদ্দেশে সফর করেছে তা শেষ



হলেই নিজ এলাকায় ফিরে যাবে বলে মনস্থির করে, তাহলে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত কসর করে নামাজ আদায় করে যাবে। এ অবস্থায় যদি পনের দিনের অধিক অবস্থান করে তবুও কোনো সমস্যা হবে না।

৩. মুসাফির যদি মুকীম ব্যক্তির পেছনে নামাজ আদায় করে তাহলে কসর ব্যতীত পূর্ণাঙ্গ নামাজই আদায় করতে হবে। ইমামের সাথে পুরো নামাজ না পেলেও ইমামের সালামের পর বাকি নামাজ পরিপূর্ণভাবে আদায় করতে হবে।

দুই নামাজ একত্রে জমা করে পড়া

মুসাফির ও অসুস্থ ব্যক্তি কি যোহর ও আসর যেকোনো একটির সময়ে এবং মাগরিব ও এশা যেকোনো একটির সময়ে আদায় করতে পারবে? আলেমগণ এ মাসআলার ক্ষেত্রে মতানৈক্য করেছেন। হানাফী মাযহাব অনুযায়ী মুসাফির ও অসুস্থ ব্যক্তি জমা করতে পারবে না তবে কেবল রূপক অর্থে। যেমন প্রথম নামাজটি একেবারে শেষ ওয়াক্তে পড়বে এবং দ্বিতীয় নামাজটি প্রথম ওয়াক্তে। তাদের প্রমাণ আল্লাহ তাআলার বাণী,

{নিশ্চয় নামাজ মুমিনদের ওপর সুনির্দিষ্ট সময়ে ফরজ}[সূরা আন-নিসা:১০৩]

জমহুর ফকীহদের মতানুযায়ী, «দুই নামাজ একত্রে জমা করে পড়া বৈধ। তাদের প্রমাণ বেশ কয়টি হাদীস, যেমন মুয়ায (রাযি.)-র হাদীস আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাবুক যুদ্ধে বের হলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যোহর ও আসর» মাগরিব ও এশা একসাথে আদায় করতেন। [বর্ণনায় মুসলিম]



আর অসুস্থ ব্যক্তির জন্য তাঁরা উক্ত পদ্ধতিতে নামাজ জমা করে পড়া সফরের সাথে তুলনা করে বলেছেন, যেহেতু উভয়টিতে কষ্ট রয়েছে। যদি প্রথমটির সময়ে

দুই নামাজ একত্রে পড়া হয় তবে এটাকে জম-এ তাকদীম বলে। আর যদি দ্বিতীয়টির সময় একত্র করা হয় তবে এটাকে জম-এ তাখীর বলে।

৩-জমা ও কসর সবসময় একই সাথে হওয়া জরুরি নয়, কখনো হয়তো জমা ও কসর উভয়টিই করা হবে। আবার কখনো হয়তো শুধু জমা করা হবে কসর করা হবে না।

বাসে আরোহিত মুসাফিরের নামাজ

১. নফল নামাজ: বাসে নফল নামাজ পড়া বৈধ। এর জন্য কোনো ওযর থাকার প্রয়োজন নেই। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, «নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বাহনের ওপর নফল নামাজ আদায় করতেন, যে দিকে তা যেত সেদিকেই পড়তেন।

২. ফরয নামাজ: বাসে ফরয নামাজ পড়া জায়েয আছে যদি বাস থেকে নেমে নামাজ আদায় করার সুযোগ না থাকে। অথবা যদি বাস থেকে নেমে নামাজ আদায়ের সুযোগ থাকে কিন্তু দ্বিতীয়বার বাসে না উঠতে পারার আশঙ্কা থাকে। অথবা যদি বাস থেকে নামলে শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

বাহনের উপর ফরয নামাজ পড়ার কয়েকটি সুরত হতে পারে:

ক- নামাজী হয়তো কিবলামুখী হতে পারবে, এবং রুকু-সিজদা করতে পারবে, যেমন পানির জাহাজে থাকাবস্থায়। এমন পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই নামাজ আদায় করবে; কেননা এ অবস্থায় সে সক্ষম।

খ - নামাজী তার বাহনে কিবলামুখী হতে পারে তবে রুকু সিজদা করতে পারে না, এমতাবস্থায় তাকবীরে তাহরিমার সময় কিবলামুখী হবে, এরপর বাহন যে দিকে যায় সে দিকে ফিরেই নামাজ পড়বে এবং রুকু ও সিজদার সময় ইশারা দেবে।

সালাতুল খাওফ

শরীয়তসম্মত প্রত্যেক যুদ্ধক্ষেত্রে সালাতুল খাওফ আদায় করা জায়েয। এ ক্ষেত্রে মুকীম ও মুসাফিরের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কুরআন ও সুন্নাহ থেকে এর প্রমাণ হলো:

আল কুরআনে এসেছে, আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓا۟ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا۟ فَلْيَكُونُوا۟ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا۟ فَلْيُصَلُّوا۟ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا۟ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾

{আর যখন তুমি তাদের মধ্যে থাকবে। অতঃপর তাদের জন্য সালাত কায়েম করবে, তখন যেন তাদের মধ্য থেকে একদল তোমার সাথে দাঁড়ায় এবং তারা তাদের অস্ত্র ধারণ করে। এরপর যখন সিজদা করে ফেলবে, তখন তারা যেন তোমাদের পেছনে অবস্থান নেয়। আর অপর একটি দল যারা সালাত আদায় করেনি তারা যেন তোমার সাথে এসে সালাত আদায় করে এবং তারা যেন তাদের সতর্কতা অবলম্বন ও অস্ত্র ধারণ করে।} [সূরা আন-নিসা:১০২]

বৃষ্টির কারণে দুই নামাজ একসাথে জমা করা

বৃষ্টির কারণে দুই নামাজ একসাথে জমা করা হানাফী মাযহাব অনুযায়ী জায়েয নেই। অবশ্য আলেমদের কেউ কেউ তা জায়েয বলেছেন। আর যারা ঘরে নামাজ আদায় করবে, যেমন নারীদের ক্ষেত্রে, তাদের জন্য কারও কাছেই দুই নামাজ একত্রে পড়া বৈধ নয়।

হাদীসের প্রমাণ হলো এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের আমল।

সালাতুল খাওফ আদায় পদ্ধতি

খাওফ বা ভয়ের কারণে নামাজের রাকাত সংখ্যা কমে যাবে না। অতএব যদি মুকীম ব্যক্তি সালাতুল খাওফ আদায় করে তবে পরিপূর্ণরূপেই আদায় করতে হবে। আর যদি মুসাফির ব্যক্তি তা আদায় করে তাহলে কসর করে আদায় করতে হবে। তবে সালাতুল খাওফ আদায়ের ধরন-ধারণে বিভিন্নতা রয়েছে যার সবগুলোই জায়েয।

যে ধরনের ভয়ের কারণে সালাতুল খাওফ আদায় করা বৈধ তার দুটি অবস্থা রয়েছে:

প্রথম অবস্থা: শত্রুর আক্রমণের ভয়

এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত যেকোনো পদ্ধতিতে তা আদায় করা যাবে, যার মধ্যে সবথেকে প্রসিদ্ধ হলো সাহল ইবনে আবি খাসআমার বর্ণিত পদ্ধতি। আর তা হলো এই: ইমাম মুক্তাদীদেরকে দু দলে বিভক্ত করবে। একদল শত্রুদের প্রতি নজর রাখবে। অন্যদল ইমামের সাথে এক রাকাত আদায় করবে। ইমাম যখন দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়াবে তখন ইমামের ইকতিদা ছেড়ে দেবে এবং অবশিষ্ট নামাজ নিজেরা আদায় করে সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করে দেবে। এরপর তারা শত্রুর প্রতি নজরদারির জন্য চলে যাবে। এবার দ্বিতীয় দলটি আসবে এবং ইমামের সাথে দ্বিতীয় রাকাত আদায় করবে। ইমাম যখন তাশাহহুদ পড়তে বসবে তখন তারা দাঁড়িয়ে যাবে এবং নিজেদের অবশিষ্ট নামাজ আদায় করে নেবে। এ অবস্থায় ইমাম তাদের অপেক্ষায় থাকবে। অতঃপর তারা যখন বসবে এবং তাশাহহুদ পড়ে নেবে তখন ইমাম তাদেরকে নিয়ে একসাথে সালাম ফেরাবে।

এটা হলো মুকীম অবস্থায় ফজর এবং সফর অবস্থায় সালাতুল খাওফের পদ্ধতি। কিন্তু যদি মুকীম অবস্থা হয় অথবা মাগরিবের নামাজ আদায় করা হয়, «তাহলে প্রথম দলকে নিয়ে ইমাম দু রাকাত নামাজ আদায় করবে। এরপর তারা ইমামের ইকতিদা ছেড়ে দিয়ে বাকি নামাজ নিজেরা আদায় করে নেবে। এরা চলে গেলে দ্বিতীয় দলটি আসবে ও অবশিষ্ট নামাজে ইমামের ইকতিদা করবে। ইমাম যখন শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়তে বসবে তখন তারা ইমামকে ছেড়ে দিয়ে বাকি নামাজ পূর্ণ করে নেবে। আর ইমাম তাদের অপেক্ষায় থাকবে। তারা যখন শেষ বৈঠকে বসবে এবং তাশাহহুদ পড়ে নেবে» ইমাম তখন তাদেরকে নিয়ে সালাম ফেরাবে। (বর্ণনায় বুখারী)

দ্বিতীয় অবস্থা হলো: এমন ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হওয়া যে উল্লিখিত পদ্ধতিতে নামাজ আদায় করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

এ রূপ পরিস্থিতিতে হাঁটা অবস্থায় বা আরোহনরত অবস্থায় নামাজ আদায় করা শুদ্ধ। সম্ভব হলে কিবলামুখী হবে। আর সম্ভব না হলে কিবলামুখী না হলেও চলবে। ইবনে উমর রাযি. বলেছেন,«যদি ভয় এর থেকেও বেড়ে যেত, তারা তখন দাঁড়িয়ে হাঁটা অবস্থায় অথবা আরোহনরত অবস্থায় কিবলামুখী হয়ে বা না হয়ে নামাজ আদায় করতেন।» (বর্ণনায় বুখারী)এ অবস্থায় ইশারা দিয়ে রুকু ও সিজদা করবে। অতএব হাঁটা অবস্থায়, অথবা যুদ্ধবিমানে আরোহিত অবস্থায় অথবা ট্যাংকের উপরে যে হালতে আছে সে হালতেই নামাজ পড়বে। এর প্রমাণ আল্লাহ তাআলার বাণী:

﴿إِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾

{কিন্তু যদি তোমরা ভয় কর, তবে হেঁটে কিংবা আরোহণ করে (আদায় করে নাও)।}

[সূরা আল বাকারা:২৩৯]





বিমানে নামাজ



পানির জাহাজে নামাজ



ট্যাংকের ওপর নামাজ

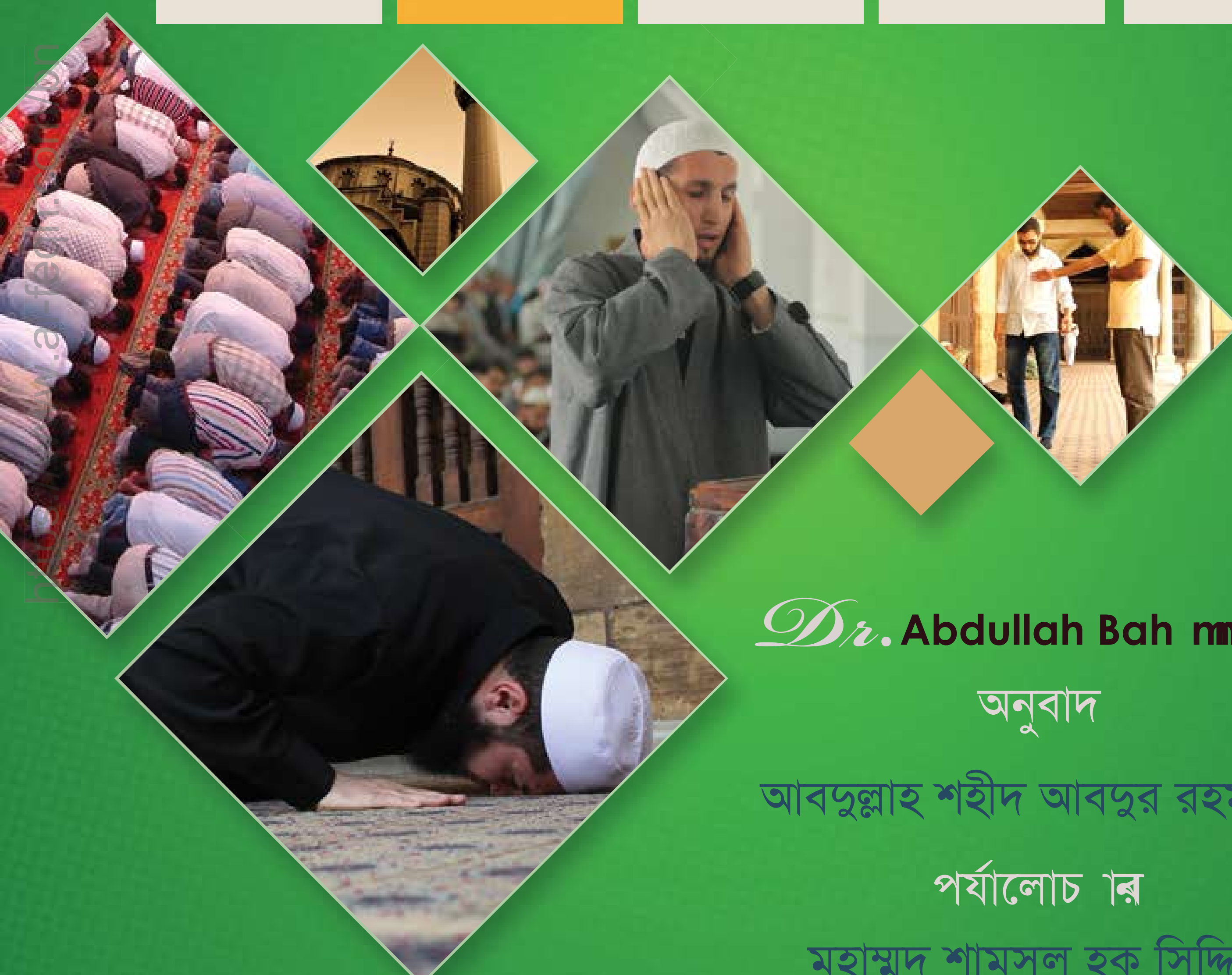
শরীয়তের সহজতা

ইসলামি শরীয়তের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো সহজতা, সাবলীলতা ও সঙ্কটপূর্ণ অবস্থার অপসারণ। কষ্টদুর্ভোগ সহজতা নিয়ে আসে, ইসলামী শরীয়তের এটি একটি সাধারণ ব্যাকরণ।

আলোকচিত্রে ইবাদত

সহজ সরল উপয়ে ইসলামের বিধি-বিধান শেখা

পবিত্রতা	নামাজ	রোজা	যাকাত	হজ্ব



Dr. Abdullah Bahmmam

অনুবাদ

আবদুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান

পর্যালোচনায়

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

জুমআর নামাজ



১৪

জুমআর নামাজ

সূচীপত্র

জুমআর নামাজের হুকুম

জুমআর নামাজ সুস্থমস্তিষ্কসম্পন্ন ও প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমানের উপর ফরয, যদি ছেড়ে দেয়ার মতো কোনো ওযর না থাকে।

এর দলিল:

১-আল্লাহ তাআলার বাণী :

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٩ ﴾

{হে মুমিনগণ, যখন জুমুআর দিনে নামাজের জন্য আহবান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে ধাবিত হও। আর বেচা-কেনা বর্জন কর।} [সূরা আল জুমআ:৯]

২-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস, «জুমআর নামাজ তরক করা থেকে মানুষের অবশ্যই বিরত হওয়া উচিত। অন্যথায় আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরে মহর লাগিয়ে দেবেন। এরপর তারা নিশ্চিতরূপে গাফেলদের মধ্যে শামিল হয়ে যাবে।» [বর্ণনায় মুসলিম]

যার ওপর জুমার নামাজ ফরয নয়

নারী, অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু, মুসাফির, অসুস্থ ব্যক্তি যার জুমআর নামাজে অংশ নেয়া কষ্টকর, এদের ওপর জুমআর নামাজ ফরয নয়। তবে এরা যদি নামাজে হাজির হয় তবে তা শুদ্ধ হবে। আর যদি হাজির না হয় তাহলে জুমআর পরিবর্তে যোহরের নামাজ পড়ে নেবে।

জুমআর দিনের ফজিলত

জুমআর দিন হলো সপ্তাহের সর্বোত্তম দিন। আল্লাহ তাআলা জুমআর দিনকে এ উম্মতের জন্য বিশেষ হাদিয়া হিসেবে দিয়েছেন অন্যান্য উম্মত এ দিনটির ক্ষেত্রে পথভ্রষ্ট হয়ে যাওয়ার পর। জুমআর দিনের ফজিলতের ব্যাপারে বহু হাদীস এসেছে। তন্মধ্যে কয়েকটি হলো নিম্নরূপ



মুসাফির



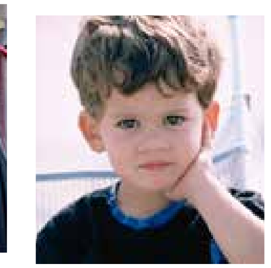
অসুস্থ ব্যক্তি

1. সূর্যউদিত হয়েছে এমন দিনগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম হলো জুমআর দিন। এ দিনেই আল্লাহ তাআলা আদম.আ. কে সৃষ্টি করেছেন। এ দিনেই তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে। এ দিনেই তাঁকে জান্নাত থেকে বের করা হয়েছে।» (বর্ণনায় মুসলিম)
2. যে ব্যক্তি গোসল করল এবং জুমাআয় হাজির হলো, অতঃপর সাধ্যমতো নামাজ পড়ল। এরপর খুতবা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিনা বাক্যে মনোযোগসহ শুনল। অতঃপর ইমামের সাথে নামাজ আদায় করল, তাহলে তার মাঝে ও অন্য জুমআর মাঝে এমনকি এর অতিরিক্ত আরো তিন দিনে যা কিছু পাপগুনাহ হয়েছে তা মাফ হয়ে গেল।» (বর্ণনায় মুসলিম)
3. আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন: «পাঁচ নামাজ, জুমআ থেকে জুমআ, রমজান থেকে রমজান- যদি কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা হয়- তবে এ সবের মাঝে যা হয় তার জন্য কাফফরা।» (বর্ণনায় মুসলিম)

জুমআ পাওয়া



নারী



নারীঅপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু

মুসলমানের উচিত জুমআর নামাজের জন্য আগেভাগে প্রস্তুতি নেয়া এবং সকাল- সকাল জুমআয় চলে যাওয়া। তবে যদি জুমআর নামাজে যেতে দেরি হয়ে যায় আর দ্বিতীয় রাকাতে রুকু অবস্থায় ইমামকে পায় তবে জুমআ হিসেবে সে তার নামাজকে পূর্ণ করে নেবে। আর যদি দ্বিতীয় রাকাতের রুকুতে ইমামকে না পায় তাহলে যোহর হিসেবে তার নামাজকে পূর্ণ করে নেবে। অনুরূপভাবে ঘুম অথবা অন্যকোনো কারণে যে ব্যক্তির জুমআর নামাজ ছুটে গেল সে জুমআর পরিবর্তে যোহরের নামাজ পড়ে নেবে। অর্থাৎ চার রাকাত নামাজ পড়ে নেবে।

জুমআর দিন যা মুস্তাহাব

1. জুমআর দিন সূরা কাহাফ পড়া মুস্তাহাব। হাদীসে এসেছে, «যে ব্যক্তি জুমআর দিন সূরা কাহাফ পড়ল, দুই জুমআর মধ্যবর্তী সময়টা তার জন্য নূর দ্বারা আলোকিত হলো।» (বর্ণনায় হাকেম)
2. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি বেশি বেশি দরুদ পড়া। আবু মাসউদ আল আনসারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন,«তোমরা শুক্রবার দিন আমার প্রতি বেশি বেশি দরুদ পাঠ করো; কেননা জুমআর দিন যে ব্যক্তি আমার ওপর দরুদ পাঠ করে, তার দরুদ অবশ্যই পেশ আমার কাছে করা হয়।» (বর্ণনায় হাকেম)
3. গোসল করা ও আতর ব্যবহার করা; হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,«যে ব্যক্তি জুমআর দিন গোসল করল এবং সাধ্যমতো পবিত্রতা অর্জন করল, তেল ব্যবহার করল, অথবা তার বাড়িতে থাকা আতর লাগাল, এরপর বের হলো এবং দুই ব্যক্তিকে ফাঁক করে বসল না, তাহলে আল্লাহ তাআলা এই জুমআ ও অন্য জুমআর মাঝে তার যেসব গুনাহ হয়েছে তা মাফ করে দেবেন।» (বর্ণনায় বুখারী)

জুমআর মাসায়েল

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিম্বারের অনুসরণে মিম্বারের ক্ষেত্রে সুন্নত হলো তিনধাপবিশিষ্ট হওয়া।

২. জুমআর আযান হওয়ার পূর্বে মসজিদে বসে বিশেষভাবে কুরআন তিলাওয়াত শোনা

৩. মাইকে সমবেত যিকর ও হামদ না»ত পড়ার যে প্রথা কোথাও কোথাও দেখা যায়, তা সুন্নতের পরিপন্থি।

৪. যখন মুসল্লী মসজিদে হাজির হয় এবং ইমাম খুতবা দিতে থাকে তখন হালকাভাবে দু রাকাত নামাজ পড়ে নেবে; কেননা হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, «যখন ইমাম খুতবা দেয়ার সময় তোমাদের কেউ মসজিদে আসে তখন যেন সে দু রাকাত নামাজ পড়ে নেয়, আর তা যেন সে হালকাভাবে পড়ে।» (বর্ণনায় ইবনে খুযাইমাহ)

৫. খুতবার সময় দুআ করার সময় খতীব তার তর্জনী আঙ্গুল দিয়ে ইশারা দেবে। ইস্তিস্কা অথবা বৃষ্টি বন্ধের জন্য দুআ করার সময় ব্যতীত ইমাম তার হাত উঠাবে না। হুসাইন ইবনে আবদির রহমান রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, «আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খুতবার সময় দুআ করা অবস্থায় এভাবে বলতে শুনেছি – এই বলে তিনি তার হাত দিয়ে ইশারা দিলেন।» (বর্ণনায় আহমদ)

৬. – জুমআর নামাজের পূর্বে চার রাকাত সুন্নত নামাজ বলতে কিছু নেই। তবে দ্বিতীয় আযানের পূর্বে সাধারণ নফল নামাজ পড়া মুস্তাহাব।



আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করা

এর প্রমাণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস, «যে ব্যক্তি জুমআর দিন গোসল করল এবং সাধ্যমতো পবিত্রতা অর্জন করল, তেল ব্যবহার করল, অথবা তার বাড়িতে থাকা আতর লাগাল, এরপর বের হলো এবং দু ব্যক্তির মাঝে ফাঁক করে বসল না তাহলে আল্লাহ তাআলা এই জুমআ ও অন্য জুমআর মাঝে তার যে গুনাহ হয়েছে তা মাফ করে দেবেন।» (বর্ণনায় দারামী)

৭. জুমআর পরে দু রাকাত কিংবা চার রাকাত নামাজ পড়া সুন্নত। ইবনে উমর রাযি. বর্ণনা করে বলেন,«রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমআর পরে তাঁর ঘরে দু রাকাত নামাজ পড়তেন।» (বর্ণনায় সিহাহ সিত্তার মুহাদ্দিসীনগণ) অন্য এক বর্ণনায় এসেছে,« তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জুমআর পরে নামাজ পড়তে চায় সে যেন চার রাকাত নামাজ পড়ে।» (বর্ণনায় মুসলিম) আর এ নামাজ ঘরে পড়াই উত্তম।

যদি ঈদ ও জুমআ একত্রিত হয়, তাহলে অধিক সতর্কতা হলো ঈদ ও জুমআ উভয়টিই আদায় করা। আর জুমআ না পড়লে যোহরের



তিনধাপবিশিষ্ট মিম্বার

নামাজ তো অবশ্যই পড়তে হবে। অবশ্য যারা জামে মসজিদ থেকে দূরবর্তী এলাকায় বসবাস করে তারা জুমআর নামাজে উপস্থিত না হলেও কোনো সমস্যা নেই। ইয়াস ইবনে আবি রামলা আশশামী রা. বলেন, «আমি মাআবিয়া. রাযি. কে যায়েদ ইবনে আরকাম রাযি.এর কাছে এই বলে প্রশ্ন করতে দেখেছি যে, আপনি কি জুমআ ও ঈদ এক দিনে হয়েছে এমন কোনো দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হাজির ছিলেন? তিনি বললে, হ্যাঁ, ছিলাম। তিনি দিনের শুরুতে ঈদের নামাজ পড়েছেন, এরপর জুমআর ব্যাপারে সুযোগ দিয়ে বলেছেন, যে জুমআ পড়তে চায় সে যেন পড়ে নেয়।» (বর্ণনায় আহমদ)

জুমআর নামাজ শুদ্ধ হওয়ার শর্ত

১. ওয়াক্ত: অতএব ওয়াক্ত হওয়ার আগে জুমআর নামাজ শুদ্ধ হবে না। ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পরও জুমআর নামাজ শুদ্ধ হবে না, অন্যান্য ফরয নামাজের মতোই। আর যোহরের নামাজের ওয়াক্তই জুমআর নামাজের ওয়াক্ত।

২. জামাত: জামাত করা যায় এমন সংখ্যক লোকদের উপস্থিতি জুমআর নামাজ শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত। অতএব এককভাবে জুমআর নামাজ আদায় হয় না। আর জামাত হওয়ার জন্য সর্বনিম্ন সংখ্যা হলো তিনজন।

৩. স্থায়ী বসতি থাকা: অর্থাৎ জুমআর নামাজ এমন জনপদে কায়েম হতে হবে যেখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বাড়িঘর রয়েছে, হোক তা ইঁট-পাথর দ্বারা নির্মিত বা প্রথা অনুযায়ী অন্যকিছু দিয়ে তৈরি। অতএব মরুপল্লী ও অস্থায়ী তাবুতে বসবাসকারীদের ওপর জুমআর নামাজ ফরয নয়। এমনকি তারা যদি জুমআর নামাজ আদায় করে তবে তা শুদ্ধ হবে না।

৪. জুমআর পূর্বে দুটি খুতবা দেয়া; কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো খুতবা ব্যতীত জুমআর নামাজ পড়াননি

জুমআর নামাজ আদায় পদ্ধতি

জুমআর নামাজ দুই রাকাত। উভয় রাকাতে প্রকাশ্য আওয়াজে কিরাত পড়তে হবে। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা আল জুমআ, «এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা আল মুনাফিকূন অথবা প্রথম রাকাতে সূরা আল আ»লা ও দ্বিতীয় রাকাতে সূরা আল গাশিয়া পড়া সুন্নত। (বর্ণনায় মুসলিম)

দুই খুতবা

দুই খুতবার হুকুম

দুই খুতবা ওয়াজিব। জুমআ শুদ্ধ হওয়ার জন্য এ দুই খুতবা শর্তও বটে। যদি উপস্থিত মুসল্লীদের অধিকাংশ আরবি ভাষা বুঝে এবং আরবি বাক্যের অর্থ উদ্ধারে সক্ষম থাকে, তাহলে আরবিতেই খুতবা দিতে হবে। তখন এটাই হবে আরবি ভাষার প্রতি গুরুত্ব প্রদানের দাবি। উপরুক্ত আরবি ভাষায় খুতবা প্রদান করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খুতবা প্রদান-বিষয়ক আদর্শের অনুকরণ থেকে বিচ্যুতিও ঘটে না।

তবে যদি অধিকংশ শ্রোতা আরবি ভাষা না বুঝে, তাহলে অন্য ভাষায়ও খুতবা প্রদান করা যেতে পারে; কেননা খুতবার মূল উদ্দেশ্য হলো ওয়াজ ও নসীহত। শুধুই কিছু শব্দমালার মৌখিক উচ্চারণ খুতবা প্রদানের মূল উদ্দেশ্য নয়। তবে কিছু আরবি বাক্য সংযোজনের প্রতিও খেয়াল রাখা জরুরি, যেমন কুরআনের আয়াত, কিছু হাদীস; যাতে, আলেমদের মধ্যে যারা আরবি ভাষায় খুতবা প্রদান ওয়াজিব মনে করেন তাদের মতানুযায়ী আমলও হয়ে যায়



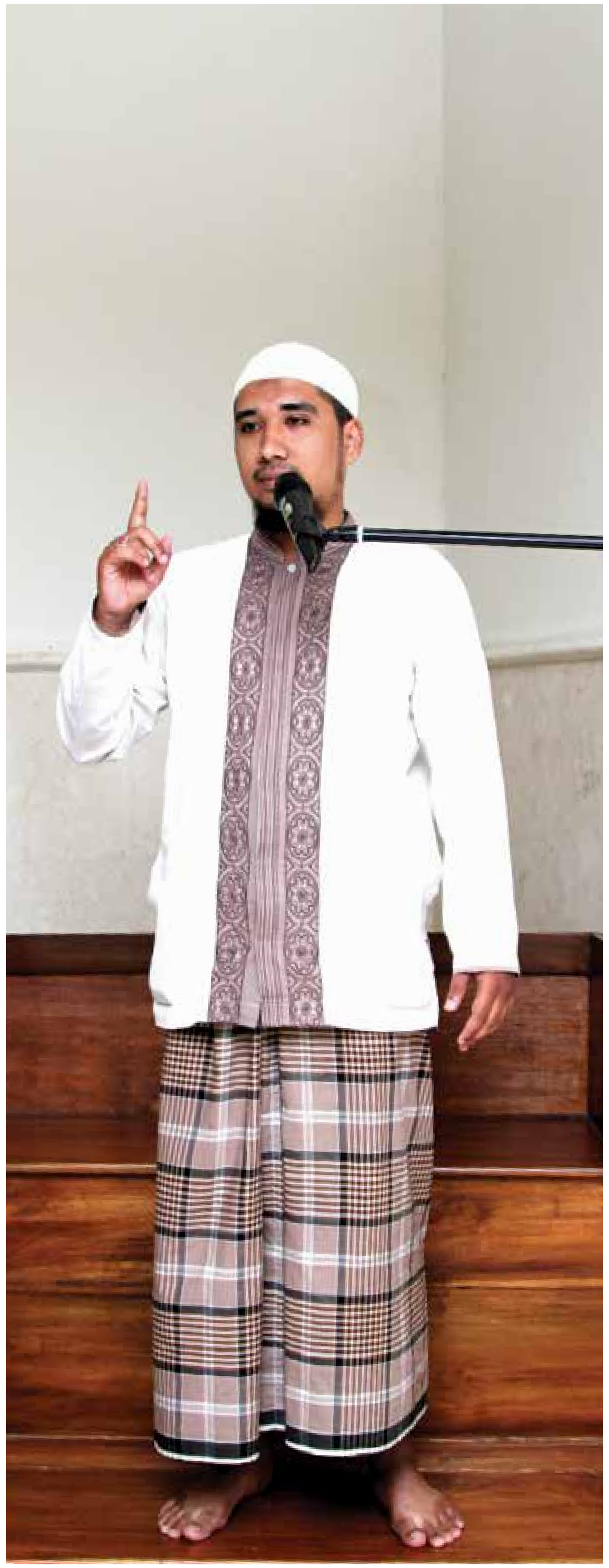
মরুপল্লীবাসীদের তাদের জায়গায় জুমআর নামাজ আদায় করা শুদ্ধ হবে না।



জুমআর সময়



জামাতের সাথে জুমআর নামাজ আদায় করা



খুতবার সম্পূরক বিষয়সমূহ

খুতবার কোনো ফরয-রুকন নেই। বরং প্রথা অনুযায়ী যা খুতবা বলে পরিচিত তা হলেই খুতবা হয়ে যাবে। তবে খুতবার কিছু সম্পূরক বিষয় রয়েছে। যেমন:

১. আল্লাহর প্রশংসা করা

২. শাহাদাতাইন পড়া

৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরুদ পাঠ করা

৪. তাকওয়া অবলম্বনের উপদেশ দেয়া

৫. কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করা

৬. ওয়াজ ও নসীহত করা

খুতবায় যা মুস্তাহাব

১-মিম্বারে উঠে খুতবা প্রদান করা।

২-মিম্বারে উঠার সময় মুসল্লীদেরকে সালাম দেয়া।

৩- দুই খুতবার মাঝে সামান্য সময়ের জন্য বসা

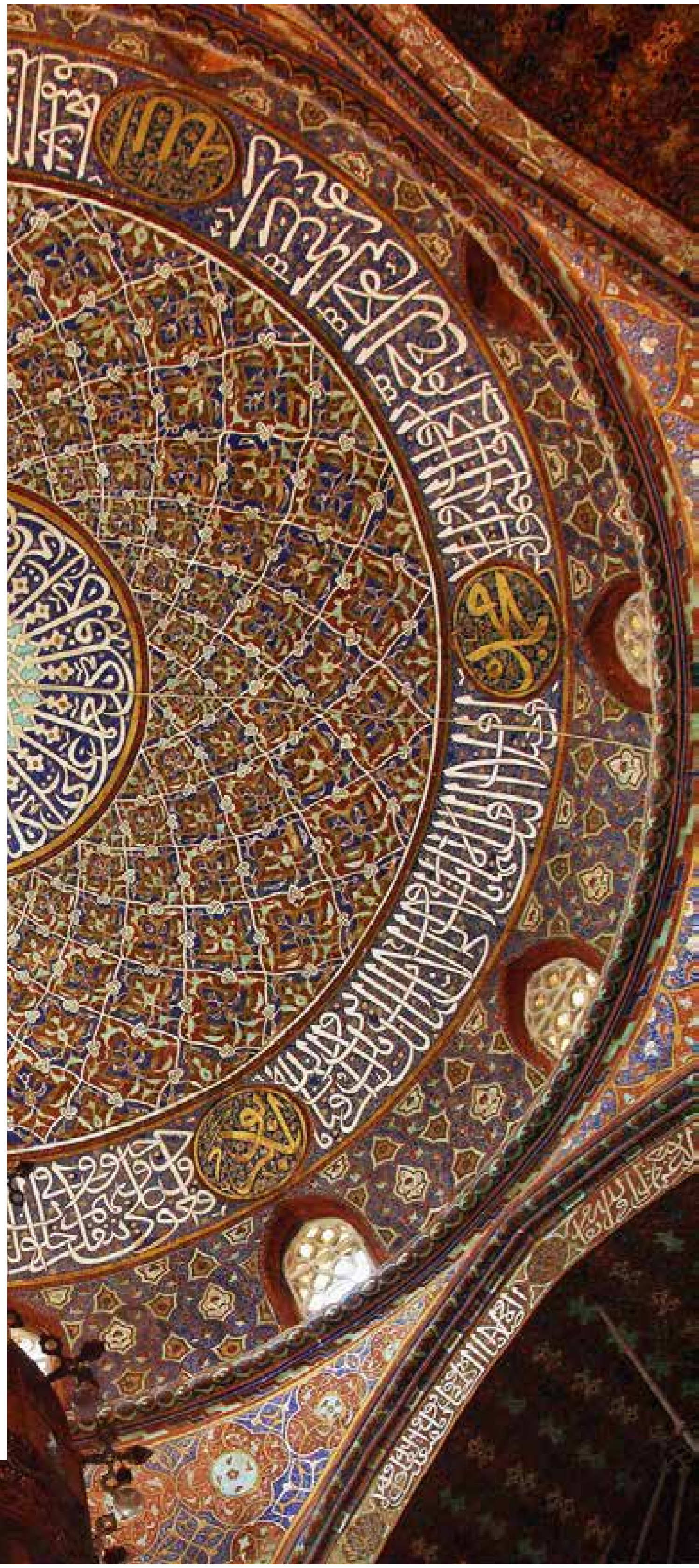
৪-খুতবা সংক্ষিপ্ত হওয়া

৫-খুতবায় দুআ করা

জুমআর নামাজে যা নিষিদ্ধ

১. জুমআর দিন ইমাম খুতবা প্রদানকালে কথা বলা হারাম; হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,«যদি জুমআর দিন তুমি তোমার সাথীকে বল চুপ থাকো» আর ওদিকে ইমাম খুতবা দিচ্ছে, তবে তুমি অন্যায় করলে।» (বর্ণনায় বুখারী)

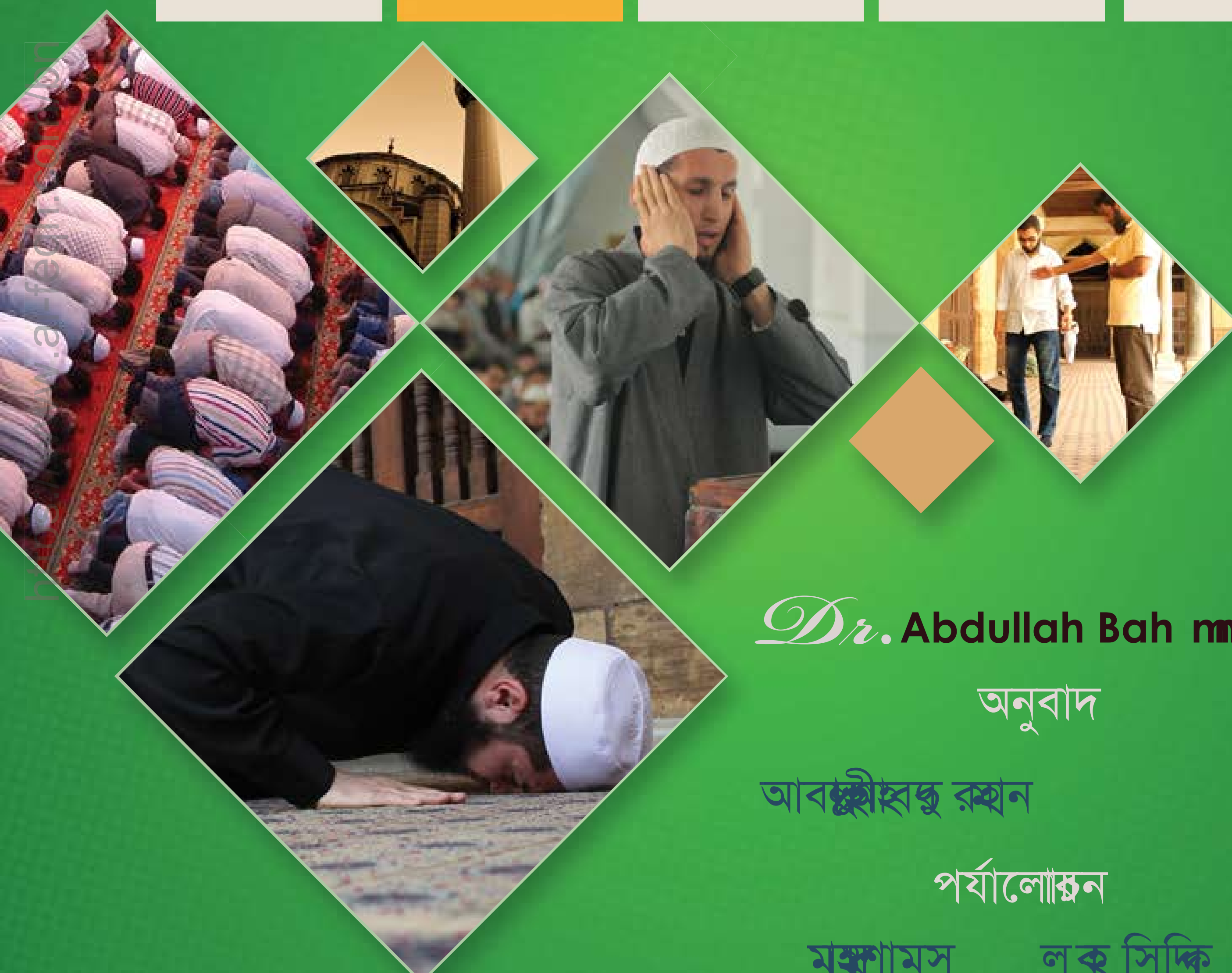
২. মানুষের ঘাড়ের উপর দিয়ে যাওয়া মাকরুহ। তবে ইমামের জন্য তা মাকরুহ নয়। ওই ব্যক্তির জন্যও মাকরুহ নয় যে এরূপ না করলে সামনের খালি জায়গায় যেতে পারছে না।



আলোকচিত্রে

সহজ সরল উপায়ে ইসলামের বিধি-বিধান শিক্ষা

পবিত্রতা	নামাজ	রোজা	যাকাত	হজ্জ



Dr. Abdullah Bah mmam

অনুবাদ

আবদুল্লাহ শহীদ আব্দুর রহমান

পর্যালোচনা

মুহাম্মাদ শামসুল হক সিদ্দিক

নফল নামাজ বা সুন্নত নামাজের প্রকার ও গুরুত্ব

১৫ নফল নামাজ

নফল নামাজ

ফরয ও ওয়াজিব নামাজ ব্যতীত শরীয়তসিদ্ধ অন্যান্য নামাজকে নফল নামাজ বলা হয়, যার মধ্যে সুন্নত নামাজও শামিল রয়েছে।

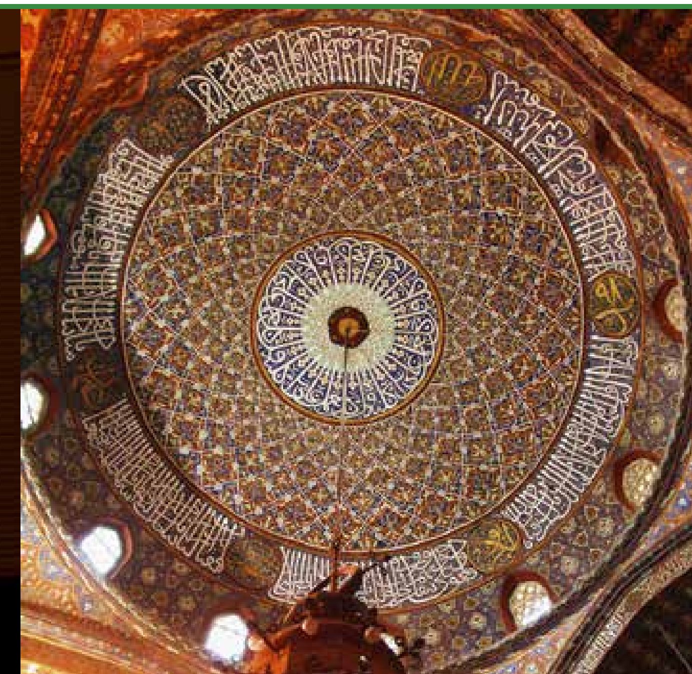
নফল নামাজের ফজিলত

১-নফল নামাজ আল্লাহর ভালোবাসা আকৃষ্ট করার মাধ্যম। হাদীসে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ তাআলা বলেন,«আমার বান্দা নফলের মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে এ পর্যন্ত যে আমি তাকে মহব্বত করে ফেলি। আর আমি যখন তাকে মহব্বত করে ফেলি আমি তার কান হয়ে যাই যা দিয়ে সে শোনে, আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে, আমি তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে আঘাত করে। আমি তার পা হয়ে যাই যা দিয়ে সে হাঁটে। যদি সে আমার কাছে কোনো প্রার্থনা করে আমি তার প্রার্থনা কবুল করি। যদি সে আমার আশ্রয় প্রার্থনা করে তবে অবশ্যই আমি তাকে আশ্রয় দিই।» (বর্ণনায় বুখারী)

২-নফল নামাজ ফরজের ত্রুটি বিচ্যুতির ক্ষতিপূরণ হিসেবে কাজ করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,«কিয়ামতের দিন প্রথম যে আমলের হিসাব নেয়া হবে তা হলো নামাজ। আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের লক্ষ্য করে বলবেন-যদিও তিনি এ বিষয়ে সমধিক জ্ঞানী-, তোমরা আমার বান্দার নামাজ দেখ, সে কি পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করেছে, না অপূর্ণাঙ্গরূপে? যদি তা পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় হয়ে থাকে তবে তা পূর্ণাঙ্গরূপেই লিখা হবে। আর যদি অপূর্ণাঙ্গরূপে আদায় হয়ে থাকে তবে আল্লাহ তাআলা বলবেন: দেখ, আমার বান্দার কোনো নফল নামাজ আছে কি না? নফল নামাজ থেকে থাকলে আল্লাহ তাআলা বলবেন,«আমার বান্দার ফরয নামাজ নফল নামাজ দিয়ে পূর্ণাঙ্গ করে দাও। এরপর অন্যান্য আমলের হিসাব নেয়া হবে।» (বর্ণনায় আবু দাউদ)



সূচীপত্র



নফল নামাজ ঘরে পড়া উত্তম

নফল নামাজ ঘরে পড়া মসজিদে পড়ার চেয়ে উত্তম। তবে ওই নফলের কথা আলাদা যা জামাতের সাথে আদায়ের নির্দেশ এসেছে, যেমন তারাবীর নামাজ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,«নিশ্চয় ঘরে আদায় করা নামাজ উত্তম নামাজ, তবে ফরয ব্যতীত।» (বর্ণনায় বুখারী)

নফল নামাজের প্রকার

নফল নামাজের প্রকার

প্রথমত: সুন্নতে রাতেবা বা ফরয নামাজের আগে পিছের নামাজ

ফরয নামাজের আগে-পিছের মোট নামাজ হলো দশ রাকাত বা বারো রাকাত। আর তা হলো:

-ফজরের পূর্বে দু রাকাত।

যোহরের পূর্বে দু রাকাত বা চার রাকাত এবং যোহরের পরে দু রাকাত।

-মাগরিবের পরে দু রাকাত।

-ইশার পরে দু রাকাত। ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,«আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে দশ রাকাত নামাজের কথা সংরক্ষণ করেছি: যোহরের পূর্বে দু রাকাত, যোহরের পরে দু রাকাত, মাগরিবের পরে ঘরে দু রাকাত, ইশার পরে ঘরে দু রাকাত এবং ফজরের পূর্বে দু রাকাত।» (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

আয়েশা রাযি. থেকেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে, «তবে তিনি যোহরের পূর্বে চার রাকাতের কথা উল্লেখ করেছেন।» (বর্ণনায় মুসলিম)

সুন্নতসমূহের মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হলো ফজরের দু রাকাত সুন্নত, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো পরিত্যাগ করেননি। আয়েশা রাযি. বলেন,« নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের দু রাকাত নামাজের তুলনায় অন্যকোনো নফল নামাজের ক্ষেত্রে এত যত্নবান ছিলেন না।» (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

ফজরের এ দু রাকাত হালকা করে আদায় করা সুন্নত। তবে খেয়াল রাখতে হবে ওয়াজিবগুলো যেন ত্রুটিমুক্তভাবে আদায় হয়। আয়েশা রাযি.

পূর্ববর্তী সুন্নত	ফরয নামাজ	পরবর্তী সুন্নত
দু রাকাত	ফজর	———
চার রাকাত	যোহর	দু রাকাত
———	আসর	———
———	মাগরিব	দু রাকাত
———	ইশা	দু রাকাত

থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, «নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের দু রাকাত সুন্নত হালকাভাবে পড়তেন। এমনকি আমি মনে মনে বলতাম, তিনি সূরা ফাতিহা পড়লেন কিনা? (বর্ণনায় বুখারী)

ফজরের সুন্নত ছুটে গেলে তা কাযা করারও বৈধতা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,«যে ফজরের সুন্নত পড়ল না সে যেন তা সূর্যোদয়ের পর পড়ে নেয়।» (বর্ণনায় তিরমিযী)


ইশার পরে


ফজরের সুন্নত দিনের বেলায় কাযা করা


মাগরিবের পরে


ফজরের পূর্বে


যোহরের পূর্বে ও পরে

যোহরের পূর্বে ও পরে

যোহরের পূর্বে ও পরে

বিতরের নামাজ ওয়াজিব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,« নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা বিতরের নামাজ ওয়াজিব করেছেন, অতঃপর তোমরা বিতর আদায় করো হে আহলে কুরআন! » (বর্ণনায় আবু দাউদ)

বেতরের নামাজ আদায়-পদ্ধতি

1. সর্বনিম্ন বেতর হলো এক রাকাত। আর সবার্ধিক হলো এগারো রাকাত অথবা তেরো রাকাত। দু রাকাত দু রাকাত করে পড়ে পরিশেষে এক রাকাত পড়ে পুরো

2. নামাজকে বেতর তথা বেজোড় বানিয়ে দেবে।

3. তিন রাকাত হলো সর্বনিম্ন পূর্ণাঙ্গ বেতর। তৃতীয় রাকাতে রুকুতে যাওয়ার পূর্বে তাকবীর দেবে ও হাত উঠাবে। এরপর নিয়ম মুতাবিক হাত বেঁধে দুআয়ে কুনুত পড়বে এবং রুকুতে যাবে। আলেমদের কারও কারও মতানুযায়ী, দু রাকাত পড়ে সালাম ফেরাবে। এরপর ভিন্নভাবে এক রাকাত পড়বে ও সালাম ফেরাবে। প্রথম দু রাকাতের পর তাশাহহুদ না পড়েও তৃতীয় রাকাত পড়া যাবে। আর বেতরের নামাজে মুস্তাহাব হলো প্রথম রাকাতে ফাতিহার পর সূরা আ»লা এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা আল কাফিরুন পড়া। আর তৃতীয় রাকাতে সূরা ইখলাস পড়া। উবায় ইবনে কা»ব রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেতরের প্রথম রাকাতে «সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ»লা» এবং দ্বিতীয় রাকাতে «কুল ইয়া আইউহাল কাফিরুন» ও তৃতীয় রাকাতে «কুল হুয়াল্লাহু আহাদ» পড়তেন। (বর্ণনায় নাসায়ী)

বেতরের সময়

ইশার পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত। তবে রাতের তৃতীয়াংশে তা আদায় করা উত্তম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,«নিশ্চয় শেষ রাতের নামাজের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়া হবে। » (বর্ণনায় মুসলিম)

বেতরের সময় দুআ

বেতরের সময় শেষ রাকাতে রুকুর পূর্বে দুআ পড়ার বিধান রয়েছে। অতঃপর তাকবীর দেয়া হবে ও দু হাত উঠানো হবে। হাদীসে যেসব দুআর কথা এসেছে, তা পড়বে। তন্মধ্যে :

اللهم إنا نستعينك، ونستغفرك، ونؤمن بك، ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير، ونشكرك، ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي، ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، ونرجو رحمتك و نخشى عذابك، إن عذابك بالكفار ملحق

«হে আল্লাহ, আমরা আপনার সাহায্য প্রার্থনা করি। আপনার কাছে ক্ষমা চাই। আপনার প্রতি ঈমান রাখি। আপনার প্রতি তাওয়াক্কুল করি। আপনার শুকরিয়া আদায় করি। আমরা আপনাকে অস্বীকার করি না। যারা আপনার অবাধ্যতায় লিপ্ত তাদেরকে আমরা বর্জন ও পরিত্যাগ করি। হে আল্লাহ, আমরা কেবল আপনারই ইবাদত করি। আপনার উদ্দেশেই নামাজ পড়ি ও সিজদা দিই। আপনার পানেই আমরা ধাবিত হই এবং আপনার আনুগত্যে দ্রুত আগাই। আমরা আপনার রহমত প্রত্যাশা করি। আপনার আযাবকে ভয় করি। নিশ্চয় আপনার আযাব কাফেরদের সাথেই যুক্ত হবে।» (বর্ণনায় আবু দাউদ)

আরেকটি দুআ হলো:

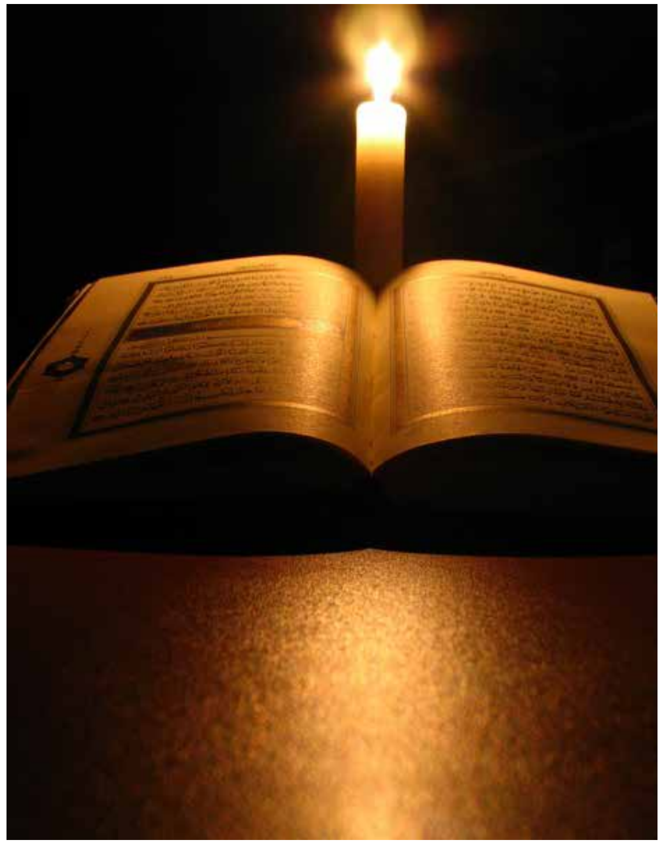
اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضي عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت

«হে আল্লাহ, আপনি যাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন আমাকে সঠিক পথ দেখিয়ে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আপনি যাদেরকে সুস্থতা দান করেছেন আমাকেও সুস্থতা দান করে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আপনি যাদের অভিভাবক হয়েছেন আমাকেও তাদের মধ্যে শামিল করুন। আমাকে যা দিয়েছেন তাতে আপনি বরকত দিন। আপনি যা ফয়সালা করেছেন তার মধ্যে যা মন্দ, তা থেকে আমাকে রক্ষা করুন। আপনিই প্রকৃত ফয়সালাকারী, আপনার ওপর ফয়সালা আরোপ করার কেউ নেই। আপনি যার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছেন তাকে কেউ অপদস্থ করতে পারে না। আর আপনি যার শত্রু হয়েছেন তাকে কেউ ইজ্জত দিতে পারে না। আপনি বরকতময় হে আমাদের রব, আপনি সর্বোচ্চ।» (বর্ণনায় তিরমিযী)

মাসায়েল

সুন্নত হলো বেতরের নামাজের পর তিনবার «سبحان الملك القدوس» বলা। তৃতীয়বার আওয়াজ উঁচু করে টেনে টেনে বলা। এর সাথে «رب الملائكة والروح » বাড়িয়ে বলাও বৈধ। (বর্ণনায় বুখারী)

দুআর পর মুখমণ্ডলে হাত বুলানো বা মাসেহ করা শরীয়তসম্মত নয়। হোক তা বেতরের দুআয় বা অন্য কোনো দুআয়। কেননা এ ব্যাপারে কোনো বিশুদ্ধ হাদীস আসেনি।



দিনের বেলায় বেতরের নামাজ কাযা করা

দিনের বেলায় বেতরের নামাজ কাযা করা বৈধ। তবে কাযা করার সময় বেজোড় সংখ্যায় না পড়ে জোড় সংখ্যায় পড়তে হবে। অর্থা□□ তিন রাকাতের জায়গায় চার রাকাত পড়তে হবে। আয়েশা রাযি. বর্ণনা করেন,«রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যখন রাতের বেলায় অসুস্থতার কারণে রাতের নামাজ ছুটে যেত, তখন তিনি দিনের বেলায় বারো রাকাত নামাজ আদায় করে নিতেন।

তৃতীয়ত: তারাবীর নামাজ

তারাবী হলো মাহে রমজানের রাতের নামাজ।

এ নামাজের নাম এ জন্য তারাবী রাখা হয়েছে যে, মানুষ এতে প্রতি চার রাকাত পরপর আরাম করে নেয়, যাকে আরবিতে তারবীহা বলে। সে হিসেবে এ নামাজের নাম তারাবী রাখা হয়েছে।

তারাবীর নামাজের ফজিলত

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,«যে ব্যক্তি ছাওয়াবপ্রাপ্তির দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে ও আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় রমজানের রাতে নামাজ আদায় করবে, আল্লাহ তার অতীতের সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন।» (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

তারাবীর নামাজের হুকুম

তারাবীর নামাজ সুন্নতে মুয়াক্কাদা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমজানে তারাবীর নামাজ আদায়কে শরীয়তভুক্ত করেছেন। তিনি মসজিদে সাহাবীদেরকে নিয়ে কয়েক রাত তারাবীর নামাজ আদায় করেছেন। এরপর মুসলমানদের ওপর ফরয হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় ছেড়ে দিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরামও পরবর্তীতে এ নামাজ আদায় করে গেছেন।

(বর্ণনায় মুসলিম)

তারাবীর নামাজের রাকাত সংখ্যা

আহলে ইলমের কারও কারও নিকট তারাবীর নামাজ বিশ রাকাত । সায়েব রাযি. থেকে এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, «উমর রাযি.এর যুগে তারা বিশ রাকাত নামাজের মাধ্যমে রমজানের রাতযাপন করতেন।» (বর্ণনায় মুসলিম)

আর কারো কারো নিকট এগারো রাকাআত।

মাসায়েল

1. তাহাজ্জুদের নামাজ আদায়ে অভ্যস্ত ব্যক্তির তাহাজ্জুদের নামাজ ছেড়ে দেয়া মাকরুহ। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,,«হে আবদুল্লাহ, তুমি অমুক ব্যক্তির মতো হয়ো না। সে তাহাজ্জুদের মাধ্যমে কিয়ামুল লাইল করত, পরবর্তীতে সে তা ছেড়ে দিয়েছে।» (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)
2. স্বামী তাহাজ্জুদের জন্য উঠলে তার স্ত্রীকেও জাগিয়ে দেয়া মুস্তাহাব। তদ্রূপভাবে স্ত্রীরও উচিত স্বামীকে জাগিয়ে দেয়া। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,«যখন রাতের বেলায় স্বামী তার স্ত্রীকে জাগিয়ে দেবে,অতঃপর দু রাকাত নামাজ পড়বে, তবে তাদেরকে যিকরকারী ও যিকরকারীনীদের মধ্যে লিখে নেয়া হবে।» (বর্ণনায় আবু দাউদ)



নামাজের জন্য জাগ্রত হওয়া

3. যদি তাহাজ্জুদের নামাজে কারও ঘুম চলে আসে, তবে উচিত হবে নামাজ ছেড়ে দিয়ে শুয়ে পড়া, যাতে ঘুম চলে যায়। আয়েশা রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,«যদি তোমাদের কেউ নামাজে তন্দ্রাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে সে যেন শুয়ে নেয়, যতক্ষণ না ঘুম চলে যায়।» (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)



নিদ্রাগ্রস্ত হয়ে পড়ল

4. রাতের তৃতীয়াংশে দুআ-ইস্তিগফার করা মুস্তাহাব। আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ তাআলা রাতের শেষ তৃতীয়াংশে পৃথিবীর আকাশে নেমে আসেন, অতঃপর বলেন: কে আছে আমাকে ডাকার, অতঃপর আমি তার ডাকে সাড়া দেব? কে আছে আমার কাছে গুনাহ মাফ চাওয়ার, অতঃপর আমি তার



রাতের শেষ তৃতীয়াংশে দুআ



চাশতের সময়



তাহিয়াতুল মসজিদ

গুনাহ মাফ করে দেব? (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম) চতুর্থত: চাশতের নামাজ

সূর্য এক বর্শা পরিমাণ উর্ধ্বে উঠার পর যে নামাজ আদায় করা হয়, তাকেই চাশতের নামাজ বলে। আরবিতে বলে সালাতুদ্দুহা। এ নামাজের সময় শুরু হয় সূর্যোদয়ের পর এক বর্শা পরিমাণ ঊর্ধ্বে উঠে গেলে। পশ্চিমাকাশে সূর্য ঢলে যাওয়ার সামান্য সময় পূর্ব পর্যন্ত এ নামাজের সময় থাকে।

চাশতের নামাজের ফজিলত

আল্লাহ তাআলা হাদীসে কুদসীতে বলেন, «হে আদম সন্তান, আমার জন্য তুমি দিনের প্রথম ভাগে চার রাকাত নামাজ পড়ো, আমি তোমার দিনের শেষ ভাগের জন্য যথেষ্ট হব।» (বর্ণনায় মুসলিম)

চাশতের নামাজের রাকাত সংখ্যা

ফকীহদের কারও কারও নিকট, চাশতের নামাজ দু রাকাত, চার রাকত, ছয় রাকাত এবং আট রাকাত আদায় করা চলে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম থেকে এরূপ প্রমাণিত।

পঞ্চমত: তাহিয়াতুল মসজিদের নামাজ

এ নামাজ হলো দু রাকাত যা মসজিদে প্রবেশকারীর মসজিদে বসার পূর্বে আদায় করা শরীয়তসিদ্ধ। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, «তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে, সে যেন বসার পূর্বেই দু রাকাত নামাজ পড়ে নেয়।» (বর্ণনায় মুসলিম)

বসার পূর্বেই যদি সরাসরি ফরয নামাজ পড়া হয় অথবা ফরজের পূর্বের সুন্নত নামাজ পড়া হয়, তবে তা তাহিয়াতুল মসজিদের জন্য যথেষ্ট হবে। আলাদাভাবে আর তাহিয়াতুল মসজিদ পড়তে হবে না।

ষষ্ঠত: ইস্তিখারার নামাজ

ইস্তিখারার নামাজ দু রাকাত, যা কোনো কাজ শুরু করার পূর্বে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়লে আদায় করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ নামাজটি তার সাহাবীদেরকে শেখাতেন, ঠিক কুরআনের কোনো সূরা শেখানোর মতোই।

ইস্তিখারার দুআ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ কোনো কাজ শুরু করার ইচ্ছা করে তখন যেন সে দু রাকাত নফল নামাজ পড়ে। এরপর বলে:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لِي، وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ،وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي، وَمَعَاشِي، وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي –قَالَ– وَيُسَمِّى حَاجَتَهُ

«হে আল্লাহ, আমি আপনার ইলমের মাধ্যমে আপনার কাছে যা ভালো তা প্রত্যাশ্যা করছি। আপনার কুদরতের মাধ্যমে আপনার কাছে শক্তি চাচ্ছি। আমি আপনার মহান অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। নিশ্চয় আপনি ক্ষমতাবান আর আমি অক্ষম। আপনি জ্ঞানবান আর আমি জ্ঞানহীন। আপনি অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞানী। হে আল্লাহ, আপনার জ্ঞান মুতাবিক, যদি এই কাজ আমার দীন, আমার জীবিকা এবং শেষ পরিণতির নিরিখে উত্তম হয়ে থাকে তবে তা আমার জন্য নির্ধারিত করুন এবং সহজ করে দিন। এরপর তাতে আপনি বরকত দিন। আর যদি আপনার জ্ঞান মুতাবিক এই কাজ আমার দীন, আমার জীবিকা, আমার শেষ পরিণতির নিরিখে অকল্যাণকর হয়ে থাকে তবে তা আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিন। এবং আমাকে তা থেকে দূরে সরিয়ে নিন। আর যেখানেই কল্যাণ থাকুক আমার জন্য তা নির্ধারণ করুন। এরপর তাতেই আমাকে পরিতুষ্ট রাখুন।) এ দুআ পড়ার পর ইস্তিখারাকারী যে কাজের জন্য ইস্তিখারা করছে তা উল্লেখ করবে।» (বর্ণনায় বুখারী)

ইস্তিখারার আলামত

ইস্তিখারা বার বার করা যায়। তবে যে বিষয়কে কেন্দ্র করে ইস্তিখারা করা হলো সে বিষয়ক কোনো স্বপ্ন দেখতে হবে তেমন কোনো কথা নেই। বরং ইস্তিখারাকারীর উচিত হবে, যে বিষয়ে ইস্তিখারা করেছে এবং আল্লাহর কাছে কল্যাণ কামনা করেছে, সে বিষয় করতে শুরু করা, যদি না তা গুনাহের কাজ হয় অথবা তাতে আত্মীয়তা-সম্পর্ক কর্তিত হয়। যদি কাজ সম্পন্ন হয় তবে এটাই তার জন্য খায়ের। আর যদি বাধাগ্রস্ত হয়, তবে এতেই তার কল্যাণ নিহিত।

সপ্তমত: তাহিয়াতুল অজুর দু রাকাত নামাজ

আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিলাল রাযি. কে বলেছেন, «হে বিলাল, তুমি আমাকে এমন একটি আমলের কথা বল যা তুমি ইসলাম গ্রহণের পর করেছ এবং যে ব্যাপারে তুমি সবথেকে বেশি আশাবাদী; কেননা আমি জান্নাতের সম্মুখে তোমার জুতার আওয়াজ শুনতে পেরেছি।» (বর্ণনায় বুখারী) বিলাল রাযি. বললেন, «আমি তেমন কোনো আশার আমল করিনি তবে আমি রাতে বা দিনে যখনই অজু করেছি তখনই আমি ওই অজু দ্বারা যতটুকু সম্ভব নামাজ পড়েছি।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে তাহাজ্জুদের নামাজ

রাতের নামাজ করটিসোল হরমোনের নির্গমন কমিয়ে দিতে সাহায্য করে, বিশেষ করে সকালে ঘুম থেকে উঠার কয়েক ঘন্টা আগে। আর এ সময়টাই হলো রাতের শেষ তৃতীয়াংশের সময়। এ হরমোনের নির্গমন কমে যাওয়ার অর্থ হলো হঠাৎ রক্তের সুগার বেড়ে যাওয়া থেকে সুরক্ষা পাওয়া। আর হঠাৎ রক্তের সুগার বেড়ে যাওয়ার অর্থ সুগারের রোগীদের মারাত্মক ধরনের হুমকির মুখে পড়া।

সাধারণ নফল নামাজ

তা হলো এমন নামাজ, যা কোনো স্থান বা কারণের সাথে সম্পৃক্ত নয়।

এ ধরনের নামাজ নিষিদ্ধ সময় ছাড়া যেকোনো সময়ই আদায় করা বৈধ।

সাধারণ নফল নামাজের কয়েকটি উদাহরণ

রাতের নামাজ (তাহাজ্জুদের নামায)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,«ফরজের পর সর্বোত্তম নামাজ হলো রাতের নামাজ।» (বর্ণনায় মুসলিম)

অন্যত্র তিনি বলেছেন,«নিশ্চয় জান্নাতে কিছু কক্ষ রয়েছে যার বহির্ভাগ ভিতর থেকে দেখা যাবে এবং ভিতরের ভাগ বাইরে থেকে দেখা যাবে। এরপর এক বেদুইন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, এটি কার জন্য, হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন,«যে ভালো কথা বলে, খাবার খাওয়াল, দিনের পর দিন রোজা রাখল এবং মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন আল্লাহর উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ল।» (বর্ণনায় তিরমিযী)

নামাজের নিষিদ্ধ সময়

1. ফজরের নামাজ আদায়ের পর থেকে সূর্যোদয়ের পর এক বর্শা পরিমাণ উর্ধ্বে উঠা পর্যন্ত। অর্থাৎ সূর্যোদয়ের পর প্রায় বিশ মিনিট পর্যন্ত।
2. সূর্য মধ্য-আকাশে থাকাবস্থায় যতক্ষণ না তা ঢলে যায়।
3. আসরের নামাজ থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

এর প্রমাণ উকবা ইবনে আমের রাযি. এর হাদীস,«তিনটি সময় রয়েছে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নামাজ পড়তে ও মৃত ব্যক্তিদেরকে কবরস্থ করতে নিষেধ করেছেন: সূর্যোদয় থেকে উর্ধ্বে উঠা পর্যন্ত। মধ্যদুপুরে সূর্য ঢলে যাওয়া পর্যন্ত। সূর্য যখন অস্ত যাওয়ার উপক্রম করে তখন থেকে অস্ত যাওয়া পর্যন্ত।» (বর্ণনায় মুসলিম)





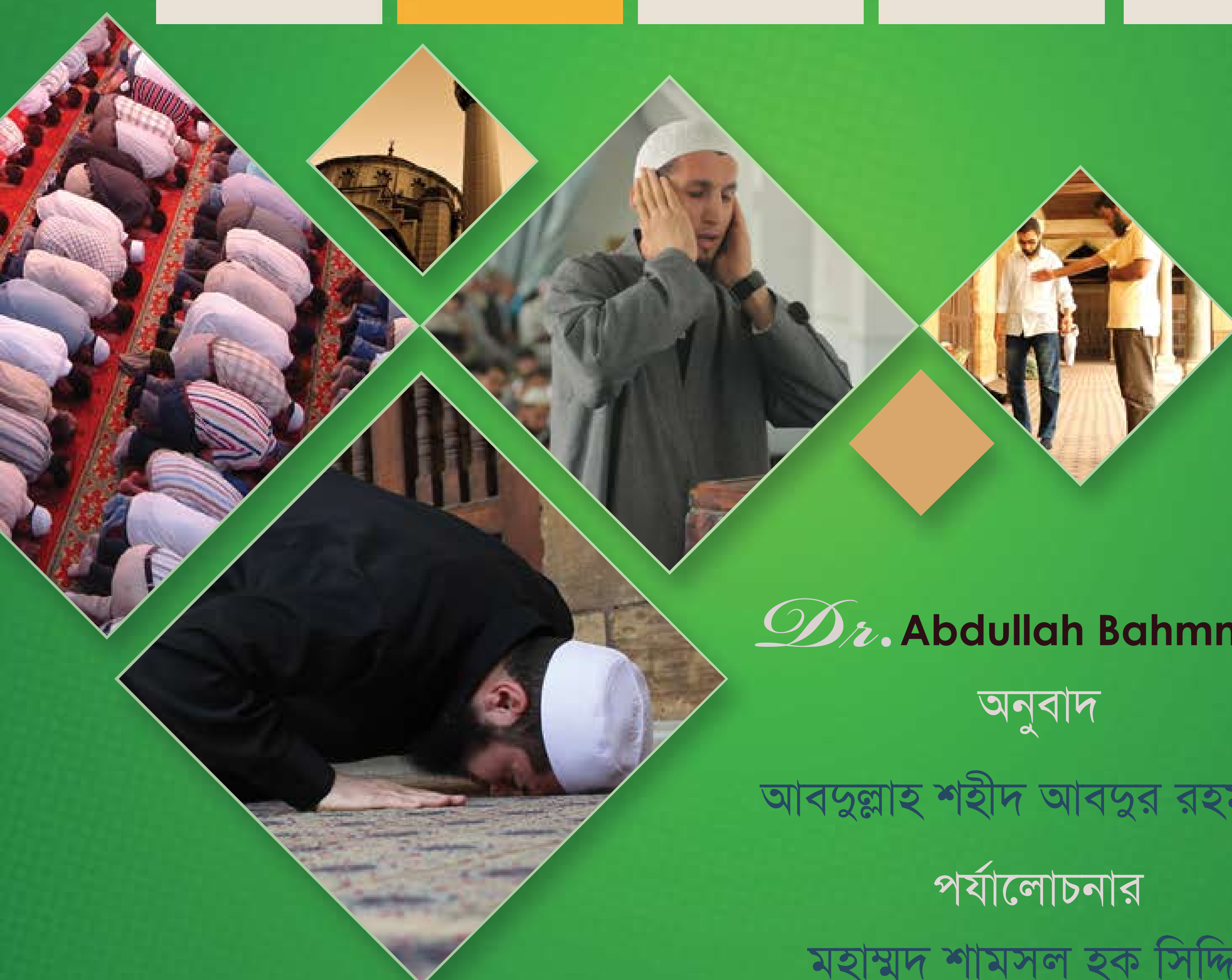




আলোকচিত্রে ইবাদত

সহজ সরল উপায়ে ইসলামের বিধি-বিধান শেখা

পবিত্রতা | নামাজ | রোজা | যাকাত | হজ্ব



Dr. Abdullah Bahmmam

অনুবাদ

আবদুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান

পর্যালোচনার

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

ইস্তিস্কার নামাজ

১৬

ইস্তিস্কার নামাজ



সূচীপত্র

ইস্তিস্কা

অনাবৃষ্টি ও পানি স্বল্পতার সময় আল্লাহর কাছে

ইস্তিস্কার নামাজ শরীয়তভুক্ত হওয়ার দলিল

ইস্তিস্কার নামাজ সুন্নতে মুয়াক্কাদা; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইস্তিস্কার নামাজ আদায় করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে, «রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজের মাঠের দিকে বের হয়ে গেলেন, অতঃপর আল্লাহর কাছে পানি তলব করলেন। তিনি কিবলামুখী হলেন। তাঁর চাদর উল্টিয়ে পরলেন এবং দু রাকাত নামাজ আদায় করলেন।» (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

ইস্তিস্কার নামাজের সময়

যখন জমিন শুকিয়ে যায় অথবা অনাবৃষ্টি শুরু হয় অথবা কূপ ও ঝর্নার পানি কমে যায় অথবা নদী শুকিয়ে যায় তখন সূর্যোদয়ের পর বিশ মিনিটের মতো সময় অতিবাহিত হলে ইস্তিস্কার নামাজ পড়তে হয়, ঈদের নামাজের সময়ের মতোই।

ইস্তিস্কার নামাজের জায়গা

ইস্তিস্কার নামাজ মসজিদে নয় বরং নামাজের মাঠে আদায় করা সুন্নত; কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপই করেছেন। তবে প্রয়োজনের সময় মসজিদেও পড়া যাবে।

ইস্তিস্কার নামাজের বর্ণনা

১. ইস্তিস্কার নামাজ দু রাকাত। আযান ইকামতবিহীন প্রকাশ্য কিরাআতে উক্ত নামাজ আদায় করতে হয়।

২. মুসল্লী প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহরিমার পর সাতবার তাকবীর দেবে। আর দ্বিতীয় রাকাতে পাঁচ বার তাকবীর দেবে।

৩. প্রত্যেক তাকবীরের সময় হাত উঠাবে এবং তাকবীরগুলোর মাঝে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ পড়বে।

৪. নামাজের পর ইমাম খুতবা দিবেন। খুতবায় বেশী বেশী ইস্তেগফার ও কুরআন তিলাওয়াত করবেন। অতঃপর দু»হাত উঠিয়ে মিনতির সঙ্গে দুআ করবেন এবং হাদীসে বর্ণিত দুআগুলো বেশী পড়বেন।

৫. অতঃপর ইমাম কিবলামুখী হয়ে তার চাদর উল্টিয়ে পরবেন, ডান দিকের অংশ বাম দিকে এবং বাম দিকের অংশ ডান দিকে দিবেন, সাথে সাথে চুপে চুপে আল্লাহর কাছে দুআ করতে থাকবেন।

ইস্তিস্কার নামাজের কিছু আহকাম

১. ইস্তিস্কার নামাজের পূর্বে ওয়াজ নসীহত করা, মানুষের হৃদয় গলে এমন কথা বার্তা বলা, যেমন গুনাহ থেকে তাওবা করার গুরুত্ব তুলে ধরা। জুলুম অন্যায়ভাবে হাতিয়ে নেয়া সম্পদ তার হকদারের কাছে পৌঁছে দেয়ার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা; কেননা মানুষের পাপ-গুনাহের কারণেই বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দেয়া হয়। আর তাওবা ইস্তিগফার ও তাকওয়া অর্জন দুআ কবুল হওয়া এবং খায়ের ও বরকত লাভের কারণ। অনুরূপভাবে মানুষদেরকে এ উপলক্ষে দান খয়রাতের ব্যাপারেও উৎসাহ দেয়া; কেননা দান খয়রাত আল্লাহর রহমত আকৃষ্ট করার কারণ।

২. ইস্তিস্কার নামাজের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট দিন ঠিক করা, যাতে মানুষ ওই দিনের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষায় থাকে।

ইস্তিস্কার নামাজে খুশু-খুজু, বিনয়- নম্রতার সাথে গমন করা সুন্নত। সাথে সাথে একমাত্র আল্লাহ তাআলাই যে বান্দার সকল হাজত-প্রয়োজন পূরণ করেন এ মনোভাবও অন্তরে জাগ্রত রাখা উচিত। ইবনে আব্বাস রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইস্তিস্কার নামাজের জন্য বের হওয়ার বর্ণনা দিয়ে বলেন,«নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনাড়ম্বরভাবে, বিনয়-নম্রতা ও আকুতিসহ বের হয়ে নামাজের মাঠে উপস্থিত হয়েছেন। (বর্ণনায় আবু দাউদ)

৩. ইস্তিস্কার খুতবায় হাত উঠিয়ে বেশি বেশি দুআ ও ইস্তিগফার করা।

বৃষ্টিপাত হলে যা করা মুস্তাহাব

বৃষ্টিপাতের শুরুতে বৃষ্টিতে নামা ও ভেজা মুস্তাহাব; হাদীসে এসেছে, আনাস রাযি. বলেন,«রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে থাকা অবস্থায় আমাদেরকে বৃষ্টি পেয়ে বসল। তিনি বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কাপড় গুটালেন। তিনি বৃষ্টিতে ভিজলেন। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি এমন করলেন কেন? তিনি বললেন, কেননা এ বৃষ্টি তার রবের পক্ষ থেকে নতুন এসেছে।» (বর্ণনায় মুসলিম)

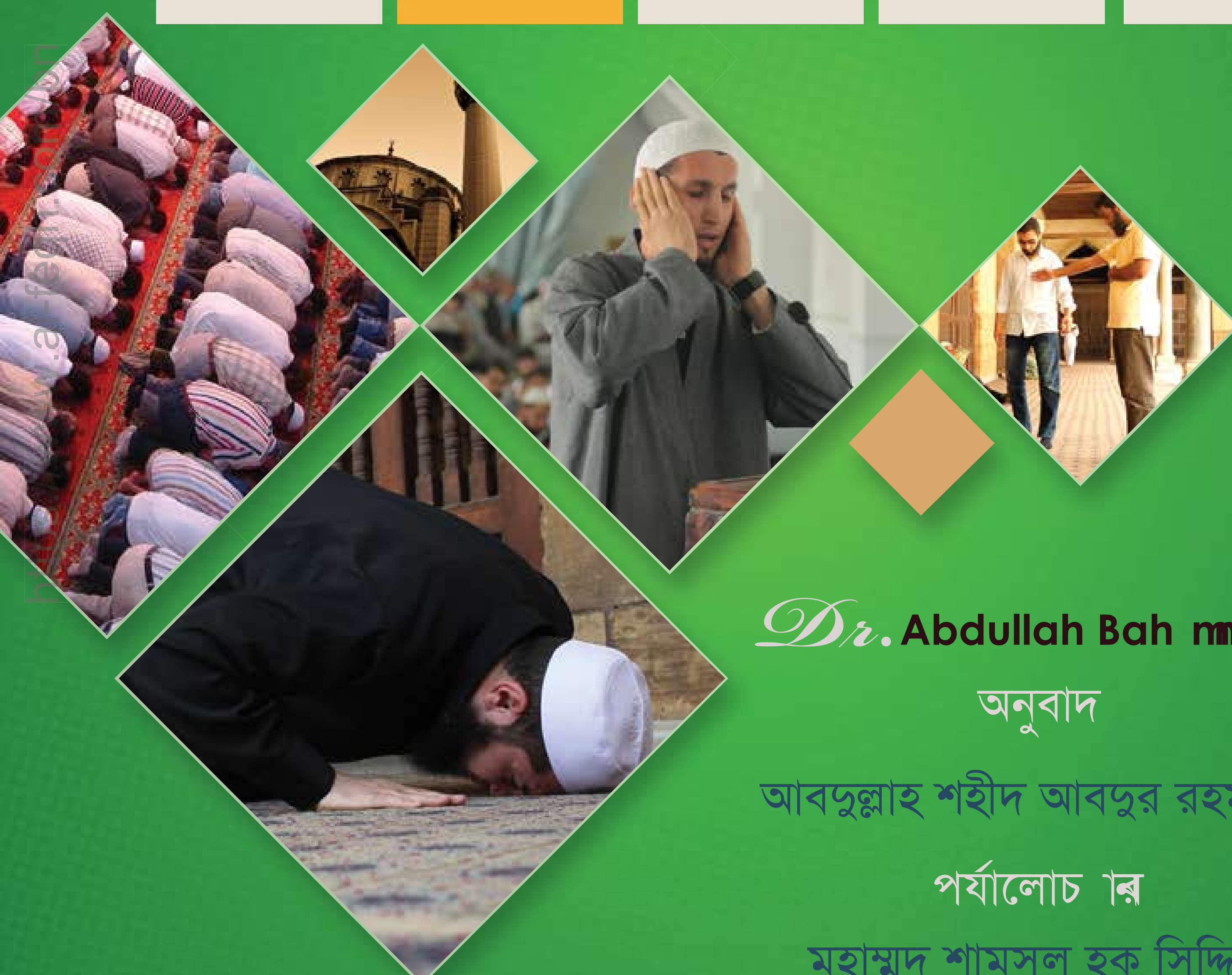
বৃষ্টি একমাত্র আল্লাহ তাআলার দয়া ও করুণা

একজন মুসলমানের বিশ্বাস করা উচিত যে, আল্লাহ তাআলার দয়া ও করুণার ফলেই বৃষ্টি বর্ষিত হয়। যারা বলে যে অমুক গ্রহের কারণে বৃষ্টি হয়েছে তাদের কথা ভুল, এটা বরং শিরক।

আলোকচিত্রে ইবাদত

সহজ সরল উপয়ে ইসলামের বিধি-বিধান শেখা

পবিত্রতা | নামাজ | রোজা | যাকাত | হজ্ব



Dr. Abdullah Bahmmam

অনুবাদ

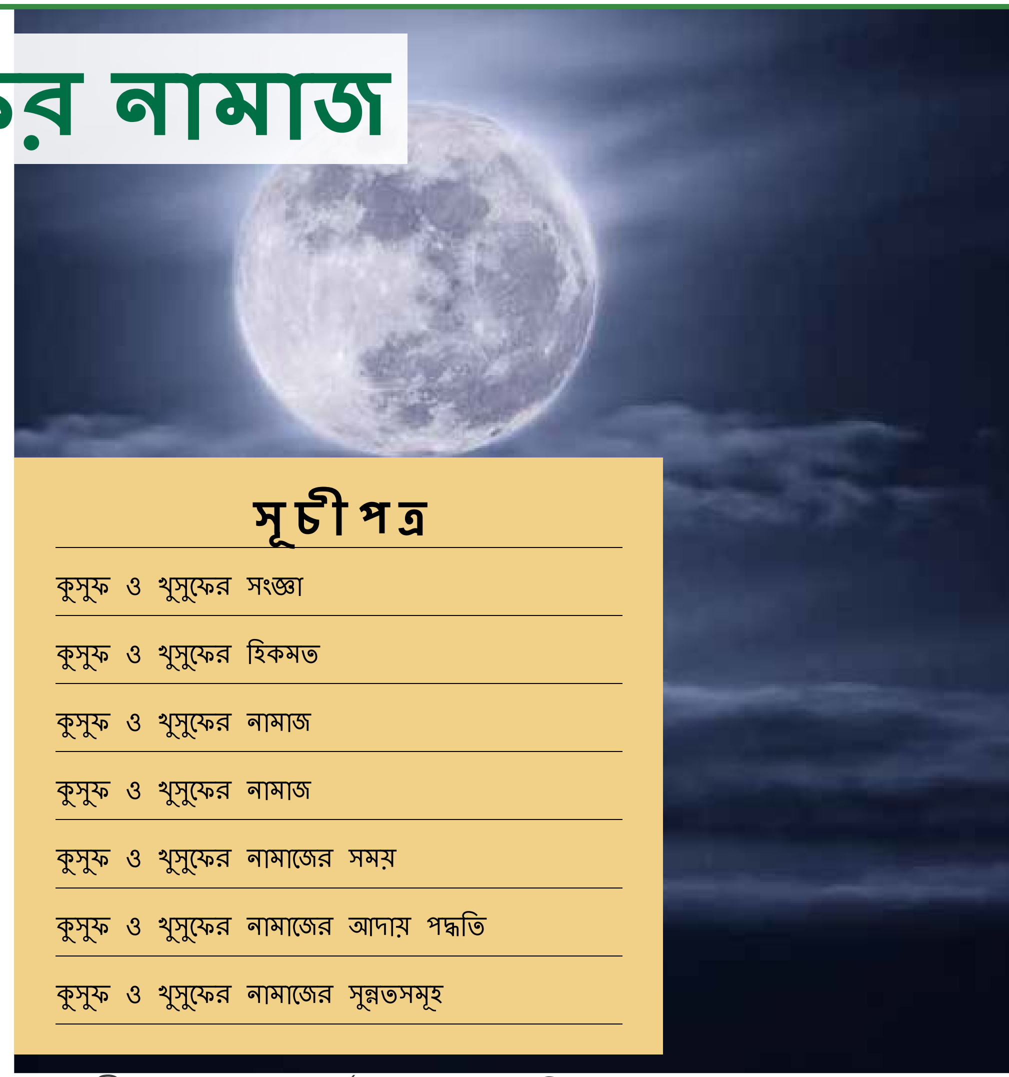
আবদুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান

পর্যালোচনায়

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

কুসুফ ও খুসুফ বা সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের নামায

১৭ কুসুফ ও খুসুফের নামাজ



কুসুফ (সূর্যগ্রহন)
কুসুফ হলো সূর্যের আলো সম্পূর্ণরূপে অথবা আংশিকভাবে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া।

খুসুফ (চন্দ্রগ্রহন)
খুসুফ চাঁদের আলো সম্পূর্ণরূপে অথবা আংশিকভাবে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া।

সূচীপত্র

কুসুফ ও খুসুফের হিকমত

এ দুটি আল্লাহ তাআলার নিদর্শন, যার দ্বারা তিনি তাঁর বান্দাদেরকে ভয় দেখান, যাতে তারা পুনরায় তাঁর কাছে ফিরে যায়। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, «নিশ্চয় সূর্য ও চাঁদ কারও মৃত্যু অথবা জীবিত থাকার কারণে আলোহীন হয় না। এ দুটো বরং আল্লাহ তাআলার নিদর্শনসমূহের মধ্যে দুটি নিদর্শন, যার দ্বারা আল্লাহ তার বান্দাদেরকে ভয় দেখান। অতঃপর যখন এ দুটোয় গ্রহণ লাগে তোমরা তখন নামাজের দিকে দ্রুত আগাও।» (বর্ণনায় আবু দাউদ)

কুসুফ ও খুসুফের নামাজ

কুসুফ ও খুসুফের নামাজের হুকুম

সুন্নতে মুয়াক্কাদা। «হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,«নিশ্চয় চাঁদ ও সূর্য আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে দুটি নিদর্শন। কারও মৃত্যু বা জীবনের কারণে এ দুটোয় গ্রহন লাগে না। অতএব তোমরা যখন তা দেখবে আল্লাহকে ডাকো, তাকবীর দাও, নামাজ পড়ো ও সদকা করো।» (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

কুসুফ ও খুসুফের নামাজের সময়

-কুসুফ ও খুসুফ শুরু হওয়া থেকে শেষ হওয়া পর্যন্ত

- মুসল্লী তার নামাজ পূর্ণ করে নেবে যদিও কুসুফ ও খুসুফ অতিক্রান্ত হয়ে যায়। আর যদি নামাজ পড়ে শেষ করা হয়, কিন্তু কুসুফ ও খুসুফ বলবৎ থাকে তাহলে আবার নামাজ আদায়ের প্রয়োজন নেই। বরং দুআ ও ইস্তিগফারে লিপ্ত থাকলেই চলবে।

কুসুফ ও খুসুফের নামাজের আদায় পদ্ধতি

আয়েশা রাযি. বলেন, (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে একবার সূর্য গ্রহণ লাগল। তখন তিনি লোকজন নিয়ে নামাজ পড়লেন। তিনি দীর্ঘ কিয়াম করলেন। এরপর তিনি রুকু করলেন ও রুকুতে দীর্ঘক্ষণ থাকলেন। অতঃপর তিনি দাঁড়ালেন এবং দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করলেন। এটা রুকুর পূর্বের কিয়ামের অতিরিক্ত। তারপর আবার রুকু করলেন এবং রুকুতে দীর্ঘক্ষণ থাকলেন। এটা প্রথম রুকুর অতিরিক্ত। তারপর তিনি সিজদা করলেন এবং সিজদায় দীর্ঘক্ষণ থাকলেন। তিনি দ্বিতীয় রাকাতেও প্রথম রাকাতের মতোই করলেন। অতঃপর গ্রহণ কেটে যাওয়ার পর তিনি নামাজ বন্ধ করলেন। এরপর তিনি মানুষের সামনে বক্তৃতা করলেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণাবলী বর্ণনা করে বললেন নিশ্চয় সূর্য ও চাঁদ আল্লাহর নিদর্শনসমূহের দু»টি নিদর্শন।কারো মৃত্যু বা জীবনের কারণে এদের গ্রহণ লাগে না। সুতরাং তোমরা যখন তা দেখবে, তখন আল্লাহকে ডাকবে, তাকবীর দেবে, নামাজ পড়বে এবং সদকা করবে।) (বর্ণনায় বুখারী)

অতএব যদি চাঁদ অথবা সূর্য গ্রহণ লাগে, তা হলে «আস্সালাতু জামেয়া অর্থাৎ একত্রে নামাজ আদায় হবে বলে নামাজের জন্য ডাক দিতে হবে।

মানুষ যখন জমায়েত হবে তখন ইমাম তাদের নিয়ে দীর্ঘ দু রাকাত নামাজ পড়বে। প্রকাশ্য আওয়াজে কিরাত পড়বে। প্রথম রাকাতে পড়বে সূরা ফাতিহা এবং অপর একটি দীর্ঘ সূরা। এরপর রুকু দেবে ও দীর্ঘ সময় রুকুতে থাকবে। এরপর سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد বলে মাথা উঠাবে। এরপর সূরা ফাতিহা পড়ে অপর একটি দীর্ঘ সূরা তার সঙ্গে মিলাবে, যা হবে প্রথমটির চেয়ে ছোট। এরপর রুকু দেবে এবং রুকুতে গিয়ে দীর্ঘ সময় থাকবে, তবে প্রথমটির চেয়ে একটু কম সময় থাকবে। এরপর দীর্ঘ দুই সিজদা করবে। এ দুই সিজদার মাঝখানে বসবে। তবে বৈঠক দীর্ঘ করবে না। এরপর দ্বিতীয় সিজদা থেকে তাকবীর দিয়ে মাথা উঠাবে। অতঃপর দ্বিতীয় রাকাত, কিয়াম ও রুকু সিজদায়, প্রথম রাকাতের মতোই আদায় করবে। তবে সবকিছুই পরিমাণে প্রথম রাকাতের চেয়ে কম হবে। এরপর বসবে ও তাশাহহুদ পড়বে ও সালাম ফিরাবে।

আহলে ইলমের কেউ কেউ প্রতি রাকাআতে এক রুকু করার কথা বলেছেন।

কুসুফ ও খুসুফের নামাজের সুন্নতসমূহ

১. কুসুফের নামাজ জামাতের সাথে পড়া হবে। কিন্তু যদি কেউ একাকী পড়তে চায় তবে তাও শুদ্ধ হবে।

২. এ নামাজদ্বয় মসজিদে আদায় করতে হবে। আর নারীরাও এতে অংশ নিতে পারবে।

৩. কিয়াম, রুকু ও সিজদা সবকিছুই দীর্ঘায়িত করে নামাজ পড়বে। তবে যদি গ্রহণ চলে যায় তা হলে দ্রুত শেষ করে দেবে।

৪. নামাজের পর ওয়াজ-নসীহত করবে। আল্লাহর কুদরত ও ক্ষমতার কথা মানুষকে স্মরণ করাবে। কুসুফের হিকমত বর্ণনা করবে। ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি মানুষদেরকে উৎসাহ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকার আহবান জানাবে।

5. বেশি বেশি দুআ, মিনতি, ইস্তিগফার ও দান-খয়রাত ও অন্যান্য ভালো কাজ করবে, যাতে আল্লাহ তাআলা মানুষের ওপর থেকে বালা-মুসিবত উঠিয়ে নেন।

6. কুসুফের ক্ষেত্রে দুআ করার সময় হাত উঠানো বৈধ। আবদুর রহমান ইবনে সামুরা রাযি. বর্ণনা করে বলেন, «অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলাম। আর তিনি ছিলেন নামাজে দাঁড়িয়ে দু হাত উত্তোলন করে দুআ রত।»

দিকনির্দেশনা

১. কুসুফ ও খুসুফ অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে যদি এ ব্যাপারে জানা না যায়, তবে আর নামাজ আদায়ের প্রয়োজন নেই।

২. আধুনিক বিজ্ঞান যদিও কুসুফ ও খুসুফ সংঘটিত হওয়ার কারণ আবিষ্কার করতে পেরেছে। তবে এর অর্থ এটা নয় যে কুসুফ ও খুসুফ আল্লাহর নিদর্শন নয় যা দিয়ে তিনি বান্দাদেরকে ভয় দেখান। অতএব সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণকালে মুসলমানের উচিত ইবাদত-বন্দেগী ও আল্লাহর দরবারে কাকুতি মিনতিতে ব্যস্ত হওয়া। টেলিস্কোপ দিয়ে গ্রহণ প্রক্রিয়া দেখার জন্য মেতে উঠা সমীচীন নয়।

৩. যে ব্যক্তি কুসুফের নামাজের প্রথম রাকাতের প্রথম রুকু ধরতে পারল সে রাকাত পেয়েছে বলে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি দ্বিতীয় রুকুতে ইমামকে পেল সে রাকাত পায়নি বলে ধরা হবে। এমতাবস্থায় ইমামে সালামের পর প্রথম রাকাত নিয়ম অনুযায়ী কাযা করে নিতে হবে।

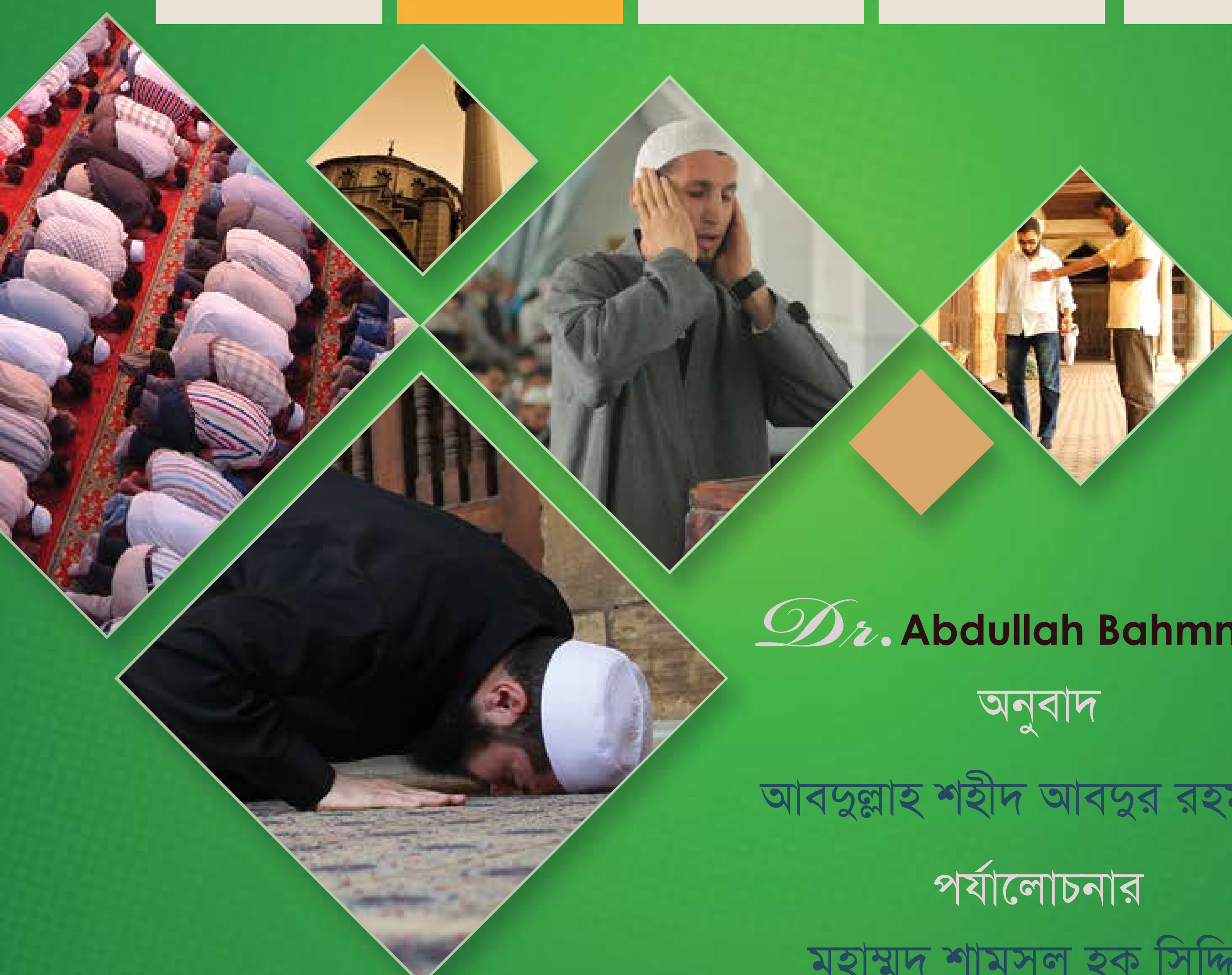
৪. নিষিদ্ধ সময়েও কুসুফের নামাজ আদায় করা শুদ্ধ হবে।

৫. অন্য কারও খবরের ওপর ভিত্তি করে কুসুফ ও খুসুফের নামাজে রত হওয়া শরীয়তসিদ্ধ নয়। বরং নিজেদেরকে স্বচক্ষে তা দেখে নিতে হবে।

আলোকচিত্রে ইবাদত

সহজ সরল উপয়ে ইসলামের বিধি-বিধান শেখা

পবিত্রতা | নামাজ | রোজা | যাকাত | হজ্ব



Dr. Abdullah Bahmmam

অনুবাদ

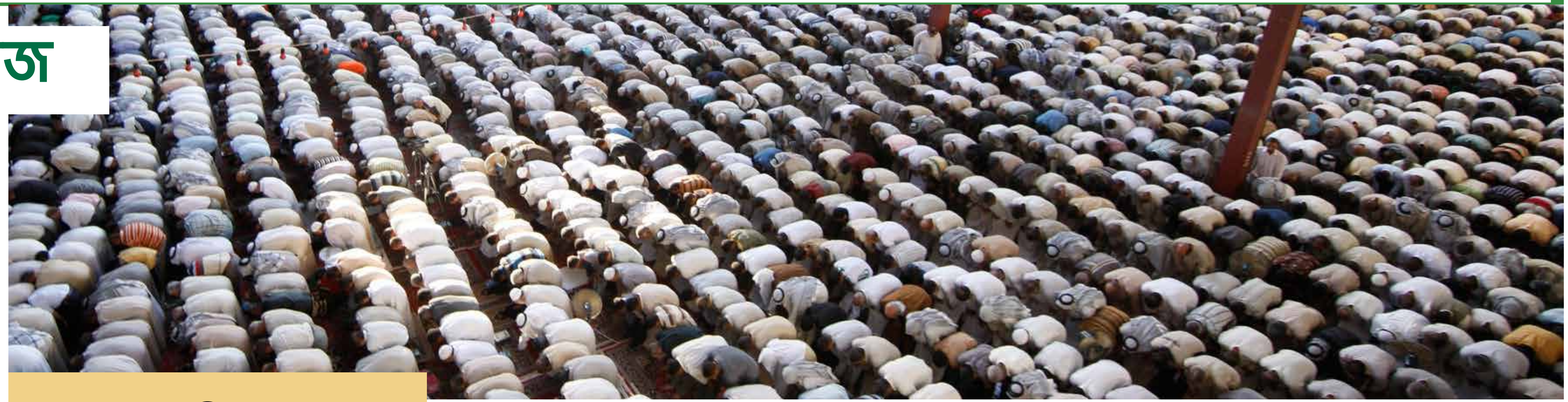
আবদুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান

পর্যালোচনার

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামাজ

১৮ দুই ঈদের নামাজ



মুসলমানদের ঈদ দুটি: একটি হলো রমজানের পর ঈদুল ফিতর । অপরটি হলো আরাফা দিবসের পর ঈদুল আযহা। জাহিলীযুগের উৎসব-পার্বন ও নব আবিষ্কৃত উৎসব-পার্বনের জায়গায় আল্লাহ তাআলা এ দুই ঈদ বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন। আনাস ইবনে মালিক রাযি. বলেন, জাহিলীযুগে বছরে দুটি দিবস ছিল যেখানে তারা খেল-তামাশা করত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় এলেন, তিনি বললেন, «তোমাদের দুটি দিবস ছিল, যাতে তোমরা খেলতে। আল্লাহ তাআলা ওই দুটি পরিবর্তন করে তোমাদের জন্য উত্তম দিবস দিয়েছেন: ঈদুল ফিতর দিবস ও ঈদুল আযহা দিবস।» (বর্ণনায় নাসায়ী) অতএব কাফিরদের ঈদে অংশ নেয়া বৈধ নয়; কেননা তা কোনো ধর্ম, বিধান বা জীবন পদ্ধতির স্পষ্টতম আলামত। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلۡحَقِّۚ لِكُلّٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِرۡعَةٗ وَمِنۡهَاجٗا﴾

ঈদের কিছু বাহ্যদৃশ্য

ঈদ, ইবাদত ও খুশি-আনন্দ প্রকাশ এবং বৈধ খাদ্য গ্রহণের মাঝে সমন্বয় ঘটিয়েছে। এ কারণেই ঈদ খুশি-আনন্দ ও খাওয়া দাওয়ার পর্ব। তবে ঈদের দিন এমন কোনো গর্হিত কাজ করা যাবে না, যা ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের সাথে মিলে না। যেমন নারী-পুরুষের সংমিশ্রণ। নামাজ থেকে গাফেল হওয়া। হারাম পানীয় গ্রহণ করা। হারাম খেলায় মেতে উঠা এবং এ জাতীয় অন্যান্য কাজ যা হারামের আওতাভুক্ত।

আল্লাহ তাআলা ঈদের দিন একটি নামাজ বিধিবদ্ধ করেছেন, যার নাম ঈদের নামাজ। এ নামাজটি হলো ঈদের প্রধান বাহ্যদৃশ্য।

দুই ঈদের নামাজের হুকুম

ঈদের নামাজ ওয়াজিব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ নামাজ পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। বরং তিনি নারী, শিশু ও বৃদ্ধদেরকেও ঈদের নামাজে নিয়ে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি হায়েযগ্রস্ত নারীদেরকেও ঈদের মাঠে নিয়ে যেতে বলেছেন, যদিও তারা নামাজ পড়বে না।

সূচীপত্র

ঈদের নামাজ ওয়াজিব হওয়ার দলিল:

আল্লাহ তাআলার বাণী:

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ ٢﴾

{অতএব তোমার রবের উদ্দেশ্যেই নামাজ পড় এবং নহর কর} [সূরা আল কাউছার:২]

1. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ, যা উম্মে আতিয়া রাযি. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে পাই। উম্মে আতিয়া রাযি. বলেন,«রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহায় নারীদেরকে বের করে নিয়ে যেতে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন: অর্থাৎ যুবতী, হায়েযগ্রস্ত ও কিশোরীদেরকে। তবে হায়েযগ্রস্তরা নামাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে। তারা এ ভালো কর্ম ও মুসলমানদের দুআয় হাজির হবে।

ঈদের নামাজ আদায় পদ্ধতি

১. ঈদের নামাজ দু রাকাত, যাতে আযান ইকামত নেই। ঈদের নামাজের কিরাত প্রকাশ্যে পড়তে হয়। ঈদের নামাজ আদায় পদ্ধতি হলো নিম্নরূপ:

২. প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহরিমা, ছানা পাঠ, আউযুবিল্লাহ পাঠ ও কিরাত পড়ার পর তিন তাকবীর দেবে।

৩. আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়ার পর সূরা ফাতিহা পড়ে এর সাথে অন্য একটি সূরা মিলাবে। সুন্নত হলো সূরা ফাতিহার পর সূরা আল আ»লা পড়া। আর দ্বিতীয় রাকাতে সূরা আল গাশিয়া পড়া। অথবা প্রথম রাকাতে সূরা ক্বাফ পড়া ও দ্বিতীয় রাকাতে সূরা আল কামার পড়া।

৪. দ্বিতীয় রাকাতে কিরাত পড়া শেষে রুকুতে যাওয়ার পূর্বে অতিরিক্ত তিন তাকবীর দেবে। প্রতি তাকবীরের সাথে হাত উঠাবে।

৫. তাকবীরগুলোর মাঝে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরুদ পড়বে।

৬. সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করার পর ইমাম মিম্বারে উঠবে। দুটি খুতবা দেবে। এ দুটির মাঝে সামান্য সময়ের জন্য বসবে। প্রথম খুতবা নয় তাকবীরের সাথে শুরু করবে। আর দ্বিতীয় খুতবা সাত তাকবীরের সাথে শুরু করবে।

৭. ঈদুল ফিতরে মুস্তাহাব হলো মানুষদেরকে সদকায়ে ফিতর সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেয়া। আর ঈদুল আযহায় কুরবানীর হুকুম আহকাম বিষয়ে স্মরণ করিয়ে দেয়া।

ঈদের নামাজ আদায়ের জায়গা

ঈদের নামাজ মসজিদে নয় বরং মাঠে পড়া সুন্নত। প্রয়োজনে যদি মসজিদে পড়া হয় তবে কোনো সমস্যা হবে না।

ঈদের নামাজের মুস্তাহাবসমূহ

১. ইমাম ব্যতীত অন্যান্য মুসুল্লীরা সকাল সকাল ঈদগাহে আসবে এবং প্রথম কাতারের দিকে আগাবে।

২. যদি সম্ভব হয় তাহলে পায়ে হেঁটে এক পথে যাবে এবং অন্য পথে ফিরে আসবে। জাবির রাযি. বর্ণনা করে বলেন, «ঈদের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাওয়া-আসার রাস্তায় পার্থক্য করতেন।» [বর্ণনায় বুখারী]

৩. ঈদুল ফিতরের নামাজের উদ্দেশে বের হওয়ার পূর্বে বেজোড় সংখ্যায় খেজুর খাওয়া (তিনটি অথবা পাঁচটি)। আর ঈদুল আযহায় নামাজ থেকে ফিরে আসার পূর্বে কিছু না খাওয়া।

ঈদুল ফিতরের নামাজ দেরিতে আদায় করা মুস্তাহাব; যাতে মানুষ সদকায়ে ফিতর আদায় করতে ও হকদারদের কাছে তা পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়। পক্ষান্তরে ঈদুল আযহার নামাজ সকাল-সকাল আদায় করা মুস্তাহাব।

দুই ঈদের আহকাম

১. ঈদগাহে, ঈদের নামাজের পূর্বে ও পরে, নফল নামাজ পড়া মাকরুহ। কিন্তু যদি ঈদের নামাজ মসজিদে আদায় করা হয়, তাহলে মসজিদে প্রবেশের সময় তাহিয়াতু মসজিদ পড়া শুদ্ধ রয়েছে।

২. যে ব্যক্তির ঈদের নামাজ পুরোটা বা অংশত ছুটে গেল তার জন্য সুন্নত হলো ঈদের নামাজের আদায় পদ্ধতি অবলম্বন করে তা কাযা করে নেয়া। অর্থাৎ অতিরিক্ত তাকবীরসহ দু রাকাত ঈদের নামাজ আদায় করা। যে অংশ ছুটে গেল সে অংশও ঈদের নামাজের আদায় পদ্ধতি অনুসরণ করে আদায় করে পূর্ণ করে নেয়া।

৩. রমজান শেষে আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের উপর তাকবীর তথা আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণার বিধান রেখেছেন। আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

﴿شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ وَلِتُكۡمِلُواْ ٱلۡعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ١٨٥﴾

{আর যাতে তোমরা সংখ্যা পূরণ কর এবং তিনি তোমাদেরকে যে হিদায়াত দিয়েছেন, তার জন্য আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা কর।}

[সূরা আল বাকারা:১৮৫]

৪. উক্ত আয়াতে, তুকাব্বিরুল্লাহ» এর অর্থ তোমরা যেন তোমাদের হৃদয় থেকে এবং জিহ্বা দিয়ে আল্লাহর বড়ত্বের ঘোষণা করো। নিম্নবর্ণিত শব্দমালা দ্বারা ঈদের মুহূর্তে আল্লাহর বড়ত্বের ঘোষণা তথা তাকবীর দিতে হয়:

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد

৫. পুরুষদের জন্য উঁচু আওয়াজে তাকবীর দেয়া সুন্নত। আর নারীরা দেবে গোপনে। কেননা নারীদেরকে আওয়াজ নিচু রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৬. তাকবীর শুরু হবে ঈদের রাতে সূর্যাস্তের পর থেকে ঈদের নামাজ শুরু হওয়া পর্যন্ত। সূর্যাস্তের পর থেকে তাকবীর শুরু হবে যদি পরদিন ঈদ হবে বলে সূর্যাস্তের পূর্বেই নিশ্চিত হওয়া যায়, যেমন রমজান মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ হয়ে গেল অথবা ঈদের চাঁদ উঠার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেল।

কিছু দিকনির্দেশনা

১. ঈদের সময় মুসলমানদের মাঝে পরস্পর শুভেচ্ছা বিনিময় মুস্তাহাব।

২. ঈদে আনন্দিত হওয়া এবং আনন্দ প্রকাশ করা মুস্তাহাব। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও মুসলিম ভাই বেরাদরকে শুভেচ্ছা বিনিময়ও মুস্তাহাব।

৩. ঈদ একটি সুযোগ, যা আত্মীয়তা-সম্পর্ক জোড়া লাগানো এবং যাদের মধ্যে ঝগড়া হচ্ছে তাদেরকে মিলিয়ে দেয়ার সর্বোত্তম সময়।

৪. ঈদে কবর যিয়ারত করা শরীয়তসম্মত নয়। ঈদের আনন্দের সাথে, তা বরং সাংঘর্ষিক।

ঈদে পরিবারের সদস্যদের জন্য ভালো খাবার ও কাপড় চোপড় ও বৈধ বিনোদনের ব্যবস্থা করা জায়েয। ঈদ হলো খুশি-আনন্দের উপলক্ষ। আল্লাহ তাআলা আনন্দ প্রকাশকে নিষিদ্ধ করেননি। ইরশাদ হয়েছে:

﴿قُلۡ بِفَضۡلِ ٱللَّهِ وَبِرَحۡمَتِهِۦ فَبِذَٰلِكَ فَلۡيَفۡرَحُواْ هُوَ خَيۡرٞ مِّمَّا يَجۡمَعُونَ ٥٨﴾

{বল, «আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমতে। সুতরাং এ নিয়েই যেন তারা খুশি হয়»। এটি যা তারা জমা করে তা থেকে উত্তম।} [সূরা ইউনুস:৫৮]

কাফিরদের ঈদ-পর্বে শুভেচ্ছা জানানো

কাফিরদের ঈদ-পর্বে শুভেচ্ছা জানানো মুসলমানদের জন্য জায়েয নয়; কেননা এর দ্বারা কুফরের নিদর্শনকে মেনে নেয়া হয়। কাফিরদের ঈদ-পার্বনের স্থানসমূহে গমন এবং তাদের আনন্দে অংশ নেয়া বৈধ নয়।



আলোকচিত্রে ইবাদত

সহজ সরল উপয়ে ইসলামের বিধি-বিধান শেখা

পবিত্রতা | নামাজ | রোজা | যাকাত | হজ্ব




Dr. Abdullah Bahmmam

অনুবাদ

আবদুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান

পর্যালোচনার

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

জানাজার নামাজ

১৯

জানাজার নামাজ

মাইয়েতকে প্রস্তুত করণ

মৃত্যুর আলামত প্রকাশ পেয়েছে এমন ব্যক্তির কাছে হাজির হওয়া এবং তাকে কালিমা لا إله إلا الله স্মরণ করিয়ে দেয়া সুন্নত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, «তোমরা তোমাদের মৃত্যুগামী ব্যক্তিদেরকে لا إله إلا الله তালকীন করো।» [বর্ণনায় মুসলিম]

আর যখনে সে মারা যাবে তখন চোখ বন্ধ করে দেয়া হবে, এবং কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়া হবে। গোসল, কাফন, জানাযা ও দাফন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেরে ফেলা হবে।

মাইয়েতকে গোসল দেয়া, তৈরি করা ও দাফন করার হুকুম

মাইয়েতকে গোসল দেয়া, কাফন পরানো, বহন করে নেয়া, মাইয়েতের ওপর জানাজার নামাজ পড়া ও মাইয়েতকে দাফন করা ফরজে কিফায়া যদি যথেষ্ট সংখ্যক মানুষ এ সব কাজ করে নেয়, তবে বাকিরাও দায়িমুক্ত হয়ে যাবে।





সূচীপত্র

মাইয়েতকে গোসল দেয়ার হুকুম

১. মাইয়েতকে গোসল দেয়ার জন্য এমন ব্যক্তিকে বেছে নিতে হবে যে নির্ভরশীল, ইনসাফপূর্ণ, আমানতদার ও গোসল দেয়ার মাসআলা মাসায়েল সম্পর্কে অভিজ্ঞ।

২. মাইয়েত যদি গোসল দেয়ার ব্যাপারে কারও ব্যাপারে উপদেশ দিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তাকেই প্রাধান্য দিতে হবে। এরপর আত্মীয়দের মধ্যে নৈকট্যের বিবেচনায় যে এগিয়ে তাকে প্রাধান্য দিতে হবে। অবশ্য মাইতের গোসল বিষয়ক মাসআলা মাসায়েল সম্পর্কে যদি এদের যথেষ্ট জ্ঞান থাকে তবেই কেবল এদেরকে এগিয়ে দেয়া হবে। আর যদি না থাকে তবে যার আছে তাকে এগিয়ে দিতে হবে।

৩. পুরুষ মাইয়েতকে পুরুষরা গোসল দেবে। আর নারী মাইয়েতকে নারীরা। স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে একে অন্যকে গোসল দেয়াতে পারবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশা রাযি. কে বলেন: «তুমি কি খুশী হবে না, যদি তুমি আগে মারা যাও আর আমি তোমাকে গোসল দিই, কাফন পরাই, তোমার জানাজার নামাজ পড়ি, এরপর তোমাকে দাফন করি।» (বর্ণনায় ইবনে মাজাহ] আর পুরুষ ও নারী উভয়েই সাত বছরের নিচের বাচ্চাদেরকে গোসল দেয়াতে পারবে। কিন্তু কোনো কাফিরকে- মুসলিম নারী অথবা পুরুষ- গোসল দেয়াতে পারবে না। তার জানাজা বহন করতে পারবে না। তাকে কাফন দিতে পারবে না। তার জানাজার নামাজ পড়তে পারবে না। যদি সে পিতা হয় তবুও।

৪. যুদ্ধক্ষেত্রে যারা শহীদ হন তাদেরকে গোসল দেয়া, কাফন পরানো হবে না, এমনকি তাদের উপর জানাজার নামাজও পড়া হবে না। বরং তারা যে কাপড়ে মৃত্যুবরণ করেছেন সে কাপড়েই দাফন করা হবে।

৫. যদি গর্ভপাত হওয়া সন্তান চার মাস বয়সের হয়, তাহলে তাকে গোসল, কাফন ও জানাজা দেয়া হবে; কেননা চার মাস পর সে মানুষে পরিণত হয়েছে বলে ধরা হবে।

৬. মাইয়েতকে যে পানি দিয়ে গোসল দেয়া হবে তা পবিত্র ও বৈধ হতে হবে। আর গোসল দিতে হবে পর্দা দেয়া কোনো জায়গায়। গোসল দেয়ার সাথে যারা জড়িত নয় তাদের সেখানে উপস্থিত থাকা উচিত নয়



মাইয়েতকে গোসল দেয়ার পদ্ধতি

১. গোসল দেয়ার চকিতে মাইয়েতকে রাখা হবে। এরপর তার গুপ্তস্থান ঢেকে দেয়া হবে। তাকে কাপড়-চোপড়মুক্ত করা হবে। তাকে কোনো কক্ষে বা পর্দা দেয়া জায়গায় দৃষ্টির আড়ালে রাখা হবে।

২. গোসল দেয়ার সময় একটি কাপড়খণ্ড হাতে পেঁচিয়ে নেয়া গোসল দাতার জন্য মুস্তাহাব।

৩. গোসল দাতা মাইয়েতের মাথা উঠিয়ে বসার কাছাকাছি অবস্থায় রাখবে, এরপর তার পেটে হাত বুলাবে ও চাপ দেবে। এরপর সামনের ও পিছনের লজ্জাস্থান পরিষ্কার করবে এবং কোনো নাপাকি থেকে থাকলে তা পরিষ্কার করবে।

৪. গোসল দেয়ার নিয়ত করবে ও বিসমিল্লাহ বলবে।

৫. গোসলদাতা নামাজের অজুর ন্যায় মাইয়েতকে অজু করাবে। তবে কুলি করানো ও নাকে পানি দেয়ার সময় মুখ ও নাক মাসেহ করলেই চলবে।

১. মাইয়েতের মাথা ও দাঁড়ি বড়ইয়ের পাতাবিশিষ্ট পানি অথবা সাবান দিয়ে ধৌত করবে।

২. ডান দিক আগে ধৌত করবে, পরে বাম দিক ধৌত করবে। এরপর শরীরের বাকি অংশ ধৌত করবে।

৩. সর্বশেষ বার মাইয়েতের শরীর ধৌত করার সময় কর্পূর ব্যবহার করবে।

৪. মাইয়েতের শরীরের পানি মুছে ফেলা হবে।

৫. মাইয়েতের নখ, বগল ও নাভির নিচের চুল পরিষ্কার করা হবে



কটনের সাদা লিফাফা

সতর্কতা

মাইয়েতের শরীর একবার ধৌত করা ওয়াজিব, যদি একবারেই পরিষ্কার হয়ে যায়। তবে মুস্তাহাব হলো তিনবার ধোয়া যদিও তিনবারের পূর্বেই পরিষ্কার হয়ে যায়।

যদি পানির অভাবে মাইয়েতকে গোসল দেয়া সম্ভব না হয়, অথবা পুড়ে যাওয়া অথবা অন্যকোনো কারণে গোসল দেয়ার অবস্থা না থাকে, তাহলে মাটি দিয়ে তাইয়াম্মুম করিয়ে দেবে।

গোসল দাতার জন্য মুস্তাহাব হলো গোসল দেয়ার পর নিজে গোসল করে নেয়া।

মাইয়েতকে কাফন পরানো

১. পুরুষের ক্ষেত্রে সুন্নত হলো তিনটি সাদা লিফাফা বা কাপড়খণ্ড দিয়ে মাইয়েতকে কাফন দেয়া। কাফন কটনের তৈরি এমন কাপড় দিয়ে দিতে হবে যার ভেতর দিয়ে মাইয়েতের শরীর দেখা যায় না। যা মাইয়েতের সমস্ত শরীর ঢেকে রাখে। তবে এ ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন করা হবে না।



নারীর ক্ষেত্রে সুন্নত হলো কটন দিয়ে তৈরি পাঁচটি কাপড় খণ্ডে কাফন দেয়া। আর তা হলো একটি ইযার তথা কোমড় থেকে পা পর্যন্তের জন্য বস্ত্রখণ্ড। মুখ ঢাকার একটি বস্ত্রখণ্ড। একটি জামা ও দুটি লিফাফা অর্থাৎ সমস্ত শরীর পেঁচানোর জন্য বস্ত্রখণ্ড।

শিশুকে এক কাপড়ে কাফন দেয়া হবে, তবে তিন কাপড়ে দেয়াও বৈধ। আর ছোট মেয়েকে একটি জামা ও দুটি লিফাফায় কাফন দেয়া হবে।

২. কাফনের তিন লিফাফা এনে তাতে ধুপের ধোঁয়া দেয়া। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, «তোমরা যদি মাইয়েতকে সুগন্ধিযুক্ত ধোঁয়া দাও তবে তিনবার দাও। [বর্ণনায় ইবনে হিব্বান]



লিফাফার উপর সুগন্ধি রাখা

৩. লিফাফাগুলো একটার ওপর অন্যটা পেঁচানো হবে। একটি পেঁচানোর পর তার ওপর আম্বর, কর্পূর ও মিসক ইত্যাদির সুগন্ধি দেয়া হবে। তবে যদি মাইয়েত হজ্ব অথবা উমরার ইহরামে থাকে তাহলে তার কাপড়ে ধুপের ধোঁয়া দেয়া হবে না। কিন্তু মাইয়েতের শরীরে কোনো সুগন্ধি লাগানো হবে না। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, «তোমরা তাকে সুগন্ধি স্পর্শ করিও না»। [বর্ণনায় বুখারী] (বর্ণনায় বুখারী)

৪. মাইয়েতকে লিফাফাসমূহের উপরে শোয়ানো হবে। এরপর বাম দিক থেকে প্রথম লিফাফার উপরের দিক ডান দিকে এনে ফেলতে হবে। এরপর ডান দিক থেকে একই রূপে প্রথম লিফাফার অংশ বাম দিকে এনে ফেলবে। একইরূপে দ্বিতীয় ও তৃতীয় লিফাফাটি পেঁচাবে। এরপর মাথার কাছে অতিরিক্ত অংশ রাখবে এবং তা বেঁধে দেবে, যাতে বিক্ষিপ্ত না হয়ে যায়। অবশ্য দাফনের সময় তা আবার খুলে দিতে হবে।

ওয়াজিব হলো সমস্ত শরীর ঢেকে দেয়া। কিন্তু যদি সমস্ত শরীর ঢাকার মতো কাপড় না থাকে, তাহলে প্রথমে মাথা ঢাকবে, এরপর শরীরে যতদূর দেয়া যায় দেবে। আর পায়ের উপর ইযখির দিয়ে দেবে। ইযখির হলো সুগন্ধিযুক্ত একপ্রকার উদ্ভিদ। [বর্ণনায় বুখারী]

যে ব্যক্তি মুহরিম অবস্থায় মারা গেল, ইহরামের যে কাপড়ে সে মারা গিয়েছে, সে কাপড়েই তাকে দাফন করা হবে। পুরুষ মুহরিমের মাথা ঢাকা হবে না; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, «তোমরা তাকে পানি ও বড়ই পাতা দিয়ে গোসল করাও। তাকে দুই কাপড়ে কাফন দাও। আর তাকে সুগন্ধিযুক্ত করো না। মাথায় কাপড় আবৃত করো না; কেননা কেয়ামতের ময়দানে সে তালবিয়ারত অবস্থায় উঠবে।» (বর্ণনায় বুখারী) মাইয়েতকে লফিাফাসমূহরে উপরে শোয়ানো হব।ে এরপর বাম দকি থকেে প্রথম লফিাফার উপররে দকি ডান দকিে এনে ফলেতে হব।ে এরপর ডান দকি থকেে একই রূপে প্রথম লফিাফার অংশ বাম দকিে এনে ফলেব।ে একইরূপে দ্বতিীয় ও তৃতীয় লফিাফাটি পঁচোব।ে এরপর মাথার কাছে অতরিক্তি অংশ রাখবে এবং তা বঁধেে দবে,ে যাতে বক্ষিপ্তি না হয়ে যায়। অবশ্য দাফনরে সময় তা আবার খুলে দতিে হব।ে

৫. ওয়াজবি হলো সমস্ত শরীর ঢকেে দয়ো। কন্তিু যদি সমস্ত শরীর ঢাকার মতো কাপড় না থাক,ে তাহলে প্রথমে মাথা ঢাকব,ে এরপর শরীরে যতদূর দয়ো যায় দবে।ে আর পায়রে উপর ইযখরি দয়িে দবে। ইযখরি হলো সুগন্ধযিুক্ত একপ্রকার উদ্ভদি।

৬. যে ব্যক্তি মুহরমি অবস্থায় মারা গলে, ইহরামরে যে কাপড়ে সে মারা গয়িছে,ে সে কাপড়ইে তাকে দাফন করা হব।ে পুরুষ মুহরমিরে মাথা ঢাকা হবে না; কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে,«তোমরা তাকে পানি ও বড়ই পাতা দয়িে গোসল করাও। তাকে দুই কাপড়ে কাফন দাও। আর তাকে সুগন্ধযিুক্ত করো না। মাথায় কাপড় আবৃত করো না; কনেনা কয়োমতরে ময়দানে সে তালবয়িারত অবস্থায় উঠব।েটোর ওপর অন্যটা পঁচোনো হব।ে একটি পঁচোনোর পর তার ওপর আম্বর, র্কপূর ও মসিক ইত্যাদরি সুগন্ধি দয়ো হব।ে তবে যদি মাইয়তে হজ্ব অথবা উমরার ইহরামে থাকে তাহলে তার কাপড়ে ধুপরে ধোঁয়া দয়ো হবে না। কন্তিু মাইয়তেরে শরীরে কোনো সুগন্ধি লাগানো হবে না। হাদীসে এসছে,ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে,«তোমরা তাকে সুগন্ধি স্পর্শ করওি না»।

৪. মাইয়তেকে লফিাফাসমূহরে উপরে শোয়ানো হবা।ে এরপর বাম দকি থকেে প্রথম লফিাফার উপররে দকি ডান দকিে এনে ফলেতে হবা।ে এরপর ডান দকি থকেে একই রূপে প্রথম লফিাফার অংশ বাম দকিে এনে ফলেব।ে একইরূপে দ্বতিীয় ও তৃতীয় লফিাফাটি পঁচোব।ে এরপর মাথার কাছে অতরিক্তি অংশ রাখবে এবং তা বঁধে দবে,ে যাতে বক্ষিপ্তি না হয়ে» (বর্ণনায় বুখারী)

জানাজার নামাজ

জানাজার নামাজের আরকান

১. সক্ষম ব্যক্তিদের দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া।

২. চার তাকবীর

৩. সূরা ফাতিহা পড়া৪. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরুদ পড়া।

৫. মাইয়েতের জন্য দুআ করা

৬. সালাম ফেরানো



জানাজার নামাজের সুন্নত

৭. কিরাতের পূর্বে বিসমিল্লাহ বলা।

৮. নিজের জন্য ও মুসলমানদের জন্য দুআ করা।

৯. গোপনে কিরাত পড়া।

১০. কাতার বাড়িয়ে দেয়া। কমপক্ষে তিন কাতার করা।

জানাজার নামাজের পদ্ধতি

১. ইমাম মাইয়েতের বুক বরাবর দাঁড়াবে, মাইয়েত পুরুষ হোক বা নারী। আর মুক্তাদীরা তার পেছনে দাঁড়াবে অন্যান্য নামাজের মতোই। এরপর চার তাকবীর দেবে নিম্নবর্ণিতভাবে:

২. প্রথম তাকবীর তথা তাকবীরে তাহরিমা দেয়ার পর সূরা ফাতিহা পড়বে।

৩. দ্বিতীয় তাকবীর দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরুদ পড়বে, অন্যান্য নামাজের শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পর যে দরুদ পড়া হয় সে দরুদ পড়বে।

৪. তৃতীয় তাকবীর দিয়ে মাইয়েতের জন্য, নিজের জন্য ও মুসলমানদের জন্য দুআ করবে। বলবে:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا ، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا ، وَأُنْثَانَا وَذَكَرِنَا ، اللَّهُمَّ مَنْ تَوَفَّيْتَ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِيمَانِ ، وَمَنْ أَحْيَيْتَهُ فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلامِ ، اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ ، وَلا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ

আর যদি মাইয়েত নারী হয়, তাহলে শেষ দুটি বাক্যের সর্বনাম পরিবর্তন করে বলবে : (বর্ণনায় মুসলিম)

اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنَا أَجْرَهَا ، وَلا تُضِلَّنَا بَعْدَهَا

মাইয়েত যদি শিশু হয়, গর্ভপাতজনিত শিশু হয়, তাহলে বলবে, (বর্ণনায় বুখারী)

اللهم اجعله ذخراً لوالديه، وفرَطاً، وأجراً، وشفيعاً مجاباً

৫. চতুর্থ তাকবীর দিয়ে সামান্য সময়ের জন্য চুপ থাকবে। এরপর ডানে-বামে সালাম দেবে।

মাইয়েতকে বহন করা, মাইয়েতের সাথে যাওয়া এবং দাফন করা

জানাজার নামাজ শেষ হলে সুন্নত হলো মাইয়েতকে বহন করে কবরে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নেয়া। আর যে ব্যক্তি জানাজার সাথে যাবে তার জন্য মুস্তাহাব হলো জানাজা বহনে শরীক হওয়া। আর যে মাইয়েতকে কবরে প্রবেশ করাবে, তার জন্য সুন্নত হলো بسم الله، وعلى ملة رسول الله বলা। কবরে ডান পাঁজরের উপর কাঁত করে কিবলামুখী করে মাইয়েতকে রাখা। এরপর কাফনের বাঁধ খুলে দেয়া। এরপর লাহদ কবর হলে তার ফাঁক বন্দ করে দেয়া।

যে দাফন কর্মে উপস্থিত হবে, তার জন্য সুন্নত হলো দুই হাতের চুল্লি মাটি দিয়ে ভরে নেয়া এবং তা তিনবার কবরে নিক্ষেপ করা। এরপর মাটি দিয়ে কবর ঢেকে দেয়া। সমতল থেকে কবর এক বিঘত পরিমাণ উঁচু করে দেয়া। এরপর কবরের ওপর কঙ্কর কিংবা পাথর রাখা। পানির ছিটা দেওয়া। কবরের এক দিকে অথবা উভয় দিকে বড় পাথর রাখাতে কোনো অসুবিধা নেই। যাতে তা কবরের আলামত হিসেবে থেকে যায়।

তাযিয়া

মৃত ব্যক্তির পরিবার পরিজনকে তাযিয়া বা সহমর্মিতা জানানো সুন্নত; কেননা তাদের হৃদয় জুড়ানো, তাদের বিপদ হালকা করা এবং ধৈর্যধারণের প্রতি উৎসাহ দেয়ার জন্য এটি একটি মাধ্যম।

لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى


জানাজার নামাজে শরীক হওয়া


লাহদ


দুই হাতের চুল্লি মাটি দিয়ে ভরবে ও কবরে নিক্ষেপ করবে


কবরের আলামত সরূপ

(দেয়া-নেয়া আল্লাহর অধিকারভুক্ত। আর আল্লাহর কাছে প্রতিটি বিষয়ই সুনির্দিষ্ট সময়ের সাথে বাঁধা।» (বর্ণনায় বুখারী)

কবর যিয়ারত

পুরুষদের জন্য মৃত্যু থেকে উপদেশ গ্রহণ ও মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ করার উদ্দেশ্যে কবর যিয়ারত করা সুন্নত। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,«আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত থেকে নিষেধ করেছি, এখন তোমরা যিয়ারত করো; কেননা তা তোমাদেরকে পরকাল স্মরণ করিয়ে দেয়।» (বর্ণনায় মুসলিম)

ঈদের দিন কবরস্থান যিয়ারত করা

কবরস্থান যিয়ারতের জন্য ঈদের দিনকে নির্দিষ্ট করা এবং এটাকে শরীয়তসম্মত মনে করা বিদআত। কেননা এ কাজের পক্ষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কোনো হাদীস আসেনি।

কবর যিয়ারতের সময় যেসব দুআর কথা এসেছে তন্মধ্যে কয়েকটি হলো নিম্নরূপ:

السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون

«আপনাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, মুমিন সম্প্রদায়ের আবাস স্থল। আমরা আপনাদের সাথে যুক্ত হব ইনশাআল্লাহ।» (বর্ণনায় মুসলিম)

السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون

আপনাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক হে অত্র জায়গায় বসবাসকারী মুমিন-মুসলিমগণ। আর আল্লাহ তাআলা রহম করুন যারা পূর্বে গত হয়েছেন এবং যারা পববর্তীতে গত হয়েছেন। আমরা আপনাদের সাথে যুক্ত হব, ইনশাআল্লাহ। আমাদের জন্য ও আপনাদের জন্য আল্লাহর দরবারে পরিত্রাণ কামনা করি। [বর্ণনায় মুসলিম]

أسأل الله لنا ولكم العافية

,আল্লাহর কাছে আমাদরে জন্য এবং আপনাদরে জন্য পরত্রিাণ প্রার্থনা কর।ি (বর্ণনায় মুসলিম)

১. কবরে বাতি জ্বালানো : ইবনে আব্বাস রাযি. বর্ণনা করে বলেন: «কবর যিয়ারতকারী নারী এবং যারা কবরকে মসজিদে পরিণত করে এবং যারা কবরে বাতি জ্বালায় তাদের সবার উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লানত করেছেন।» (বর্ণনায় তিরমিযী)

২. বরকত হবে ধারণা করে কবরের কোনোকিছু স্পর্শ করা, কবরের চার পাশে তাওয়াফ করা, মাইয়েতের কাছে কোনোকিছু চাওয়া ইত্যাদি শিরক যদি এ বিশ্বাস থাকে যে এ কবর কোনো উপকার বা অপকার করতে সক্ষম; কেননা উপকার বা অপকার করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তাআলাই রাখেন। ইরশাদ হয়েছে

﴿قُل لَّآ أَمۡلِكُ لِنَفۡسِي نَفۡعٗا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۚ﴾

{বল, «আমি আমার নিজের কোন উপকার ও ক্ষতির ক্ষমতা রাখি না, তবে আল্লাহ যা চান।} [সূরা আল আরাফ:১৮৮]

৩. মসজিদে দাফন করা বা কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করা অথবা কবর সামনে রেখে নামাজ আদায় করা: হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, «আল্লাহ তাআলা ইহুদী ও নাসারাদেরকে লানত করেছেন; কেননা তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে।» (বর্ণনায় বুখারী)

জানাজার কিছু আহকাম

১. যে ব্যক্তি জানাজার নামাজ পেল না, সে কবরের কাছে দাফনের পূর্বে বা পরে জানাজার নামাজ পড়তে পারবে। যে নারী মসজিদ পরিষ্কার করত সে যখন মারা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কবরের উপর জানাজার নামাজ পড়েছেন।

২. মাইয়েতের পরিবারের জন্য খাবার তৈরি করা মুস্তাহাব। কেননা তাদের উপর পতিত বিপদই তাদেরকে ব্যস্ত রাখে। বর্ণনায় এসেছে যে, জাফর পরিবারের কেউ মারা গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,«তোমরা আলে জাফরের জন্য খাবার তৈরি করো; কেননা তাদেরকে ব্যস্ত রাখে এমন একটি বিষয় তাদের উপর পতিত হয়েছে।» (বর্ণনায় আবু দাউদ) – মাইয়েতের জন্য কাঁদা যাবে তবে তা হতে হবে আওয়াজ উঁচু না করে, মাইয়েতের প্রশংসকীর্তন না করে এবং বিরক্তিভাব প্রকাশ না করে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছেলে ইবরাহীম যখন মারা যান, তখন তিনি বলেছেন,

৩. «নিশ্চয় চোখ অশ্রুসিক্ত হয়, অন্তর ভারাক্রান্ত হয়, তবে আল্লাহ যাতে খুশি হবেন না এমন কথা আমরা বলি না। আর হে ইবরাহীম, নিশ্চয় আমরা তোমার বিচ্ছেদে চিন্তাগ্রস্ত।» (বর্ণনায় বুখারী)



কবরের চারপাশে তাওয়াফ করা অবৈধ

৪. জিহাদের ময়দানে যিনি শহীদ হন তিনি যে পোশাকে শহীদ হন সে পোশাকেই তাকে দাফন করা হবে। তাঁকে গোসল দেয়া হবে না এবং তার জানাজার নামাজও পড়া হবে না। হাদীসে এসেছে, কবর যিয়ারতের সময় যদি কবরবাসীদের জন্য রহমত, মাগফিরাত ইত্যাদির দুআ করা হয় তবে তা জায়েয হবে।

জানাজায় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ

১. কেঁদে কেঁদে মাইয়েতের প্রশংসকীর্তন করা এবং উচ্চস্বরে মাইয়েতের জন্য কান্না করা, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা প্রকাশ এবং আল্লাহর ফয়সালায় বিরক্তি জাহির করা। হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, «মাইয়েতের জন্য উঁচু আওয়াজে ক্রন্দনকারী নারী যদি তার মৃত্যুর পূর্বে তাওবা না করে, তাহলে কিয়ামতের দিন তাকে গলিত তামার পোশাক পরিহিতা অবস্থায় উঠানো হবে।» (বর্ণনায় মুসলিম)

২. কাপড় ফাড়া, গাল চাপড়ানো, চিল্লানো ও চুল উপড়ানো অথবা চেঁছে ফেলা। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, «যে গাল চাপড়াল অথবা পকেট ফাড়ল, অথবা জাহিলীযুগীয় কোনো আহবানে ডাকাডাকি করল সে আমাদের দলভুক্ত নয়।» [বর্ণনায় মুসলিম]

১. কবরে বাতি জ্বালানো : ইবনে আব্বাস রাযি. বর্ণনা করে বলেন: «কবর যিয়ারতকারী নারী এবং যারা কবরকে মসজিদে পরিণত করে এবং যারা কবরে বাতি জ্বালায় তাদের সবার উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লানত করেছেন।» (বর্ণনায় তিরমিযী)

২. বরকত হবে ধারণা করে কবরের কোনোকিছু স্পর্শ করা, কবরের চার পাশে তাওয়াফ করা, মাইয়েতের কাছে

জানাজার সাথে নারীদের বের হওয়া

জানাজার সাথে নারীদের বের হওয়া শরীয়তসম্মত নয়; কেননা উম্মে আতিয়া রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, «আমাদেরকে জানাজার সাথে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে



কবরে বাতি দেয়া অথবা তেল মাখানো জায়েয নয়



মাইয়েতের পরিবার পরিজনের জন্য খাবার তৈরি করা



শহীদকে তাঁর কাপড়েই দাফন করা



গোসলদাতা মাইয়েতের মাথা ওঠাবে



গোসলদাতা তার হাতে একটি নেকড়া পেঁচিয়ে নেবে



মাইয়েতকে গোসল দেয়ার চকিতে রাখা হবে



গোসলদাতা মাইয়েতের পেটে চাপ দেবে ও তা নিংড়াবে



গোসলদাতা মাইয়েতকে নামাজের ওযুর ন্যায় ওযু করাবে



মাইয়েতের মাথা ও দাড়ি, পানি ও কুলপাতা দ্বারা ধুইবে



ডান অংশ আগে ধুইবে এরপর বাম অংশ

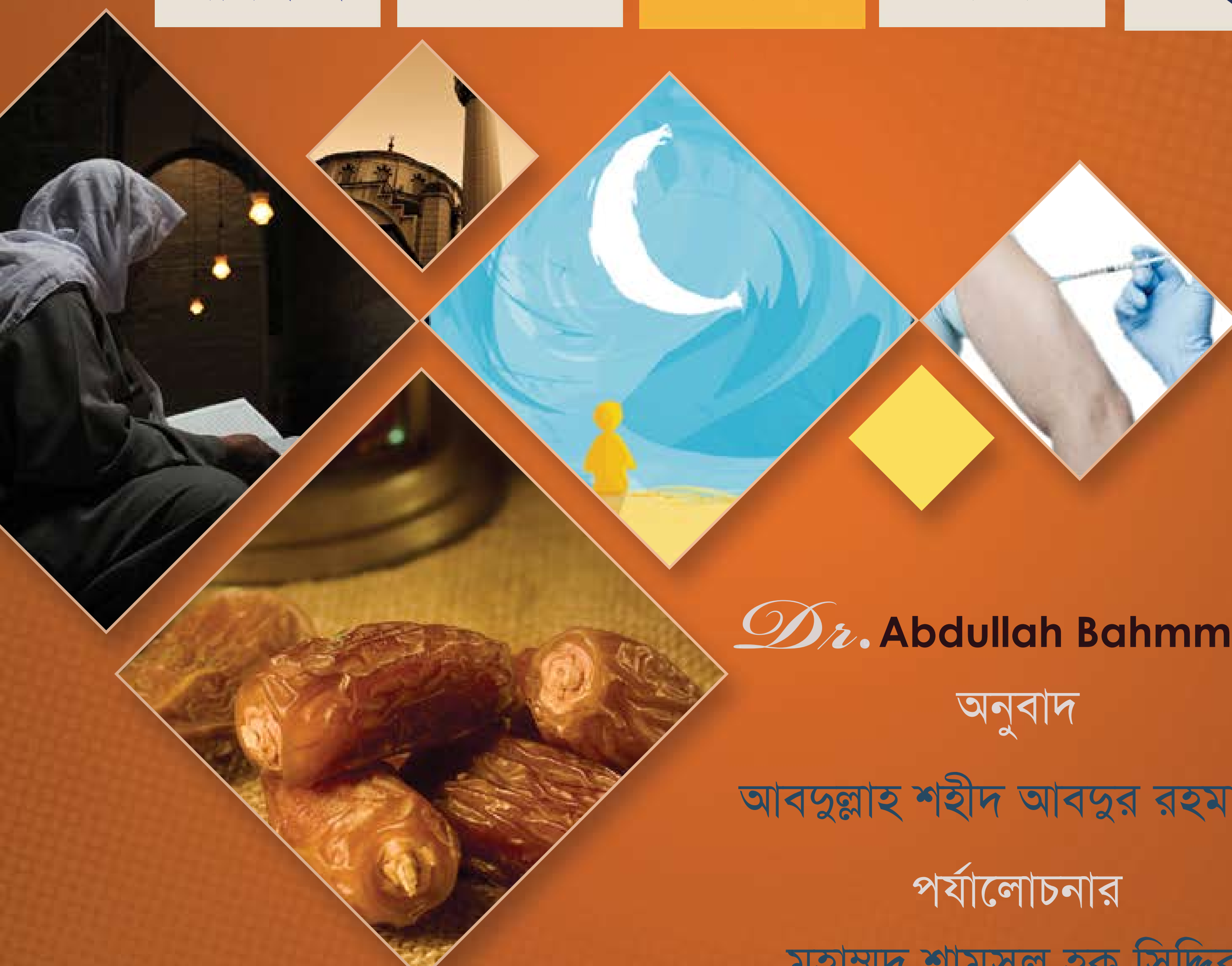


মাইয়েতের গায়ের পানি মুছে ফেলবে

আলোকচিত্রে ইবাদত

সহজ সরল উপয়ে ইসলামের বিধি-বিধান শেখা

পবিত্রতা | নামাজ | রোজা | যাকাত | হজ্ব



Dr. Abdullah Bahmmam

অনুবাদ

আবদুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান

পর্যালোচনার

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

সিয়াম বা রোজার ফজিলত ও হিকমত

১ সিয়াম বা রোজার ফজিলত ও হিকমত

সূচীপত্র

আভিধানিক অর্থে সিয়াম

কোনোকিছু থেকে বিরত হওয়া

শরয়ী পরিভাষায় সিয়াম

সুবেহ সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খাদ্য, পানীয় স্বামী-স্ত্রীর মিলন হতে বিরত থেকে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করা।

রোজার ফজিলত

রোজার ফজিলত অঢেল, এর ছাওয়াব বহুগুণে বর্ধিত। আল্লাহ তাআলা রোজাকে তাঁর একান্ত বিষয় বলে উল্লেখ করে এ ইবাদতটিকে মহিমান্বিত করেছেন, এর আযমত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে কুদসীতে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আদম সন্তানের প্রতিটি আমলের ছাওয়াবই দ্বিগুণ করে দেয়া হয়। প্রতিটি সৎকাজ দশগুণ থেকে সাতশগুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন: তবে রোজা ব্যতীত; কেননা রোজা কেবল আমার এবং আমিই এর প্রতিদান দিই। রোজাদার আমার জন্য তার লালসা ও খাদ্য পরিত্যাগ করে। রোজাদারের দুটি আনন্দ রয়েছে: একটি হলো রোজা ছাড়ার সময়, আর অন্যটি হলো তার রবের সাথে সাক্ষাতের সময়। আর রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট কস্তুরির সুগন্ধি থেকেও প্রিয়। (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম।)

রোজা শরীয়তভুক্ত হওয়ার হিকমত

১ - আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়ন ও শরীয়তের বিধানাবলি অনুসরণ করে তাকওয়া অর্জন করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٨٣﴾

{আশা করা যায় তোমরা মুত্তাকী হবে।}

[আল বাকারা:১৮৩]

২ - সবর ও ধৈর্যের অভ্যাস গড়ে তোলা ও প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে ইচ্ছাশক্তিকে শাণিত করা।

৩ - দরিদ্র ও নিঃস্বদের প্রতি দয়া ও মমতা প্রদর্শনের প্রতি মানুষকে অভ্যস্ত করে তোলা; কেননা ব্যক্তি যখন ক্ষুধার্থ থাকার যাতনা অনুভব করবে, অভাবগ্রস্তদের প্রতি তার অন্তর ও অনুভূতি কোমল হবে।

৪ - রোজার মাধ্যমে শরীরের আরাম ও সুস্থতা নিশ্চিত করা।



রোজার হুকুম

রোজার প্রকারভেদ

বাধ্যতামূলক রোজা:

আর তা দু'প্রকার:

ক. আল্লাহ তাআলা কর্তৃক বান্দার ওপর মৌলিকভাবে ফরজ করে দেয়া রোজা, আর তা হলো রমজানের রোজা। এ রোজা ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের একটি।

খ. এমন রোজা যা বান্দা নিজের ওপর ওয়াজিব করে নিয়েছে, যেমন মানত ও কাফফারার রোজা।

মুস্তাহাব রোজা

আর তা হলো প্রত্যেক ওই রোজা যা শরীয়ত প্রবর্তকের কাছে পছন্দনীয়। যেমন সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোজা, প্রতিমাসে তিন রোজা, আশুরার রোজা, যিলহজ্ব মাসের প্রথম দশকের রোজা ও আরাফা দিবসের রোজা।

রোজা বাধ্যতামূলক হওয়ার শর্ত

১ - ইসলাম : অতএব অমুসলিমের ওপর রোজা রাখা ফরজ নয়।

২ - প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া: অতএব অপ্রাপ্তবয়স্কের ওপর রোজা রাখা ফরজ নয়। তবে যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকা রোজা রাখতে সক্ষম হয় তবে রোজা রাখার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য এ ব্যাপারে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হবে।

৩- সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী হওয়া: অতএব পাগলের ওপর রোজা রাখা ফরজ নয়।

৪ - রোজা রাখতে সক্ষম হওয়া: অতএব যে রোজা রাখতে অপারগ তার ওপর রোজা রাখা ফরজ নয়।



অপ্রাপ্তবয়স্কের ওপর রোজা রাখা ফরজ নয়



রোজা রাখতে অপারগ অসুস্থ ব্যক্তির ওপর রোজা রাখা ফরজ নয়

রোজায় নিয়ত

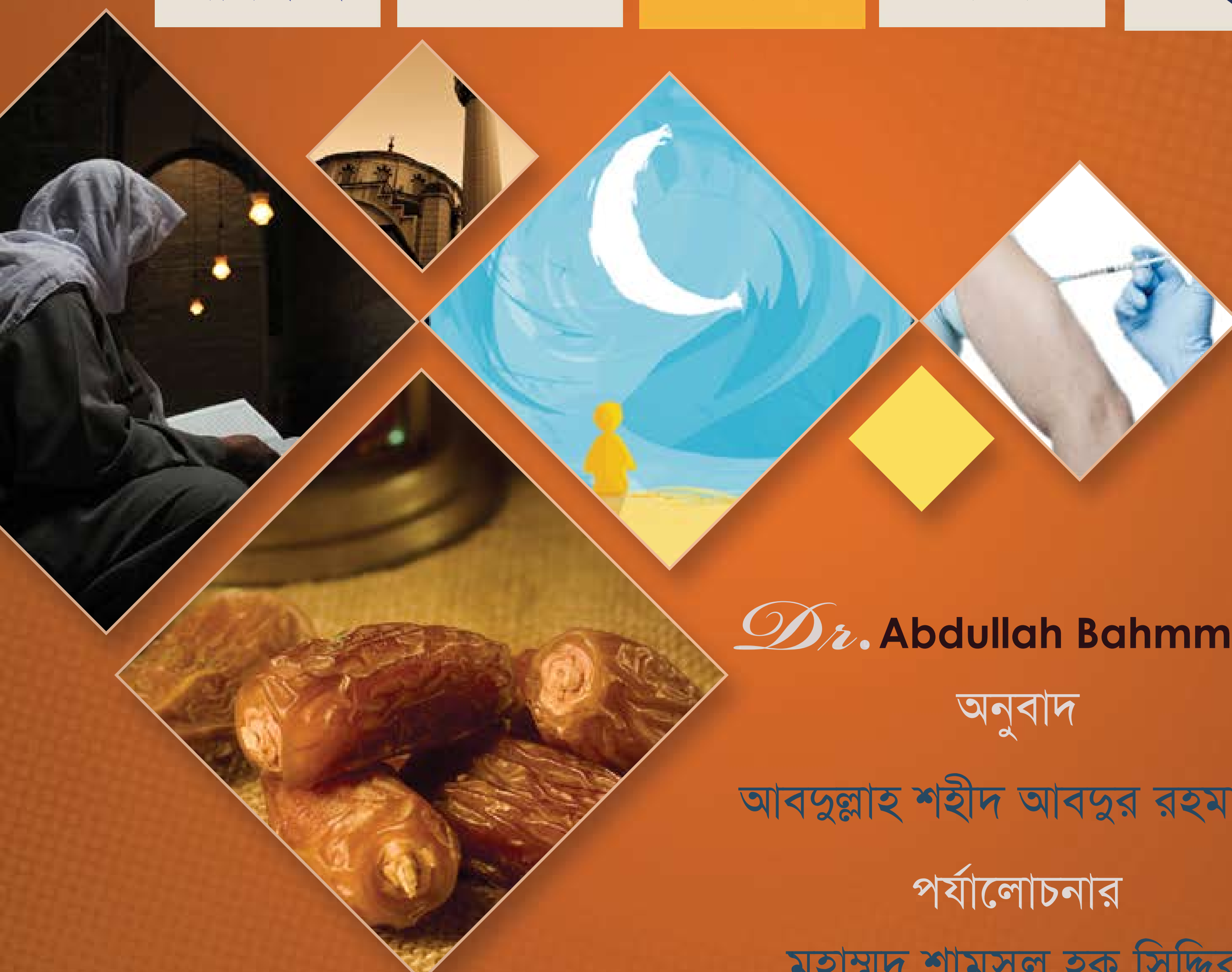
ফরজ ও ওয়াজিব রোজার ক্ষেত্রে রাত থেকে রোজার নিয়ত করা আবশ্যক। আর যদি নফল রোজা হয়, তবে রাত থেকে নিয়ত করা ওয়াজিব নয়, বরং দিনের বেলায় সূর্য ঢলে যাওয়ার পূর্বে নিয়ত করে নিলেই রোজা রাখা শুদ্ধ হবে, যদি সুবেহ সাদেকের পর থেকে এমনকিছু গ্রহণ না করা হয় যা রোজা ভেঙ্গে দেয়। উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,'একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে এলেন ও জিজ্ঞাসা করলেন,'তোমাদের কাছে কি কোনো (খাবার) আছে?' আমরা বললাম,' না, নেই।' তিনি বললেন: তাহলে আমি রোজা রাখলাম।'(বর্ণনায় মুসলিম)



আলোকচিত্রে ইবাদত

সহজ সরল উপয়ে ইসলামের বিধি-বিধান শেখা

পবিত্রতা | নামাজ | রোজা | যাকাত | হজ্ব



Dr. Abdullah Bahmmam

অনুবাদ

আবদুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান

পর্যালোচনার

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

রোজার রুকন, মুস্তাহাব, মাকরুহ ও রোজাভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

রোজার রুকন, রোজায় যা বধৈ, রোজার মুস্তাহাব, মাকরুহ ও রোজাভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

সূচীপত্র

রোজার রুকনসমূহ

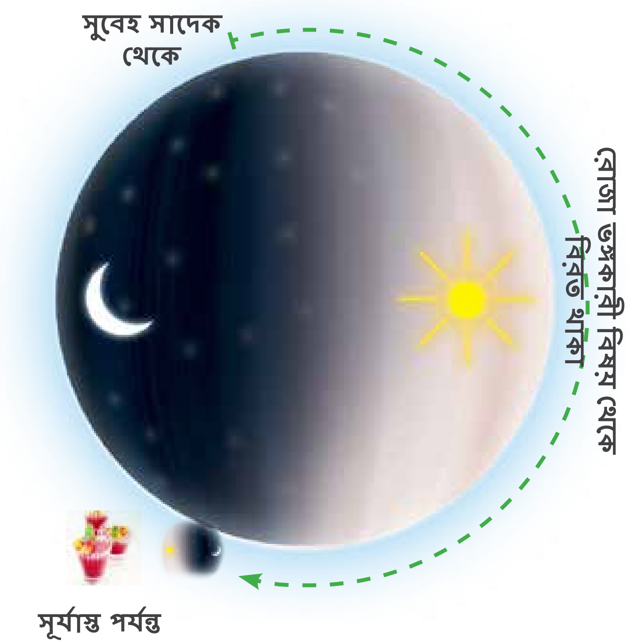
প্রথম রুকন: সুবেহ সাদেক উদয় হওয়ার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোজাভঙ্গকারী বিষয় থেকে বিরত থাকা।

ইরশাদ হয়েছে:

﴿وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ﴾

{এবং তোমরা আহার কর ও পান কর যতক্ষণ না ফজরের সাদা রেখা কাল রেখা থেকে স্পষ্ট হয়। অতঃপর রাত পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর।} [সূরা আল বাকারা:১৮৭]

সাদা ও কালো রেখার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: দিনের শুভ্রতা ও রাতের কৃষ্ণতা।



দ্বিতীয় রুকন : নিয়ত

অর্থাৎ রোজাদার ব্যক্তি রোজাভঙ্গকারী-বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করার নিয়ত করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'নিশ্চয় আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল, আর প্রত্যেকের জন্য তাই নির্ধারিত যা সে নিয়ত করেছে।'(বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

যে ব্যক্তি ভুল করে রোজা ভঙ্গ করল

সূর্যাস্ত সম্পন্ন হয়েছে অথবা সুবেহ সাদেক উদয় হয়নি বলে ধারণা করে যে ব্যক্তি খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করল, কিন্তু পরবর্তীতে প্রকাশ পেল যে তার ধারণা ভুল ছিল, এমতাবস্থায় ওই রোজা কাজা করা আবশ্যক হবে না। এর প্রমাণ আল্লাহ তাআলার বাণী:

﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞﴾

{আর এ বিষয়ে তোমরা কোন ভুল করলে তোমাদের কোনো পাপ নেই; কিন্তু তোমাদের অন্তরে সংকল্প থাকলে (পাপ হবে)। আর আল্লাহ অধিক ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।} [সূরা আল আহযাব:৫]

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,'নিশ্চয় আল্লাহ আমার উম্মাতের ওপর ভুল ও ভুলে যাওয়া ও বাধ্য হয়ে-কৃত বিষয়গুলো ক্ষমা করে দিয়েছেন।' (বর্ণনায় ইবনে মাজাহ)

রোজায় যা বৈধ

১ - গোসল করা, ঠান্ডা পানিতে বসা

২ - মুখের থুতু ও কাশ গিলে ফেলা

৩ - জিহ্বা দিয়ে কোনো খাদ্যের কেবল াদ পরীক্ষা করে দেখা। তবে শর্ত হলো কোনোকিছুই যেন কণ্ঠের নিচে প্রবেশ না করে।

৪- আতর-সুগন্ধি ইত্যাদির ঘ্রাণ নেয়া


খাদ্যের স্বাদ পরীক্ষা করে দেখা রোজাদারের জন্য বৈধ


আতর ও সুগন্ধির ঘ্রাণ নেয়া রোজাদারের জন্য বৈধ


রোজাদারের জন্য গোসল করা বৈধ

রোজাদারের মেসওয়াক ব্যবহার

যেকোনো সময় মেসওয়াক ব্যবহার করা বৈধ, হোক তা সূর্যে ঢলে যাওয়ার পূর্বে অথবা পরে। হোক তা তাজা অথবা শুষ্ক। তবে মেসওয়াক তাজা হওয়ার ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে তা যেন কণ্ঠের নিচে চলে না যায়; কেননা এরূপ হলে রোজা ভেঙ্গে যাবে।

রোজার সুন্নত-মুস্তাহাবসমূহ

১ - সেহরি খাওয়া এবং তা দেরি করে ফজরের আযানের কিছু সময় পূর্বে খাওয়া।

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,'তোমরা সেহরি খাও; কেননা সেহরিতে বরকত রয়েছে।' (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

অল্প ও বেশি উভয় পরিমাণ খাবার দিয়েই সেহরি সম্পন্ন হয়। এমনকি এক ঢোক পানি দিয়েও সেহরি সপন্ন হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'সেহরি হলো বরকতময়। তাই তোমরা সেহরি খাওয়া ছেড়ো না। এমনকি যদি এক ঢোক পানি দিয়ে হয় তবু; কারণ আল্লাহ তাআলা সেহরি গ্রহণকারীদের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন ও ফেরেশতারা তাদের জন্য দুআ করেন।'(বর্ণনায় আহমদ)

সেহরি দেরি করে করা মুস্তাহাব; যায়েদ ইবনে ছাবেত রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,'আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সেহরি করলাম অতঃপর ফজরের নামাজের উদ্দেশ্যে দাঁড়ালাম। আনাস ইবনে মালেক রাযি. বলেন: আমি বললাম: সেহরি ও ফজরের নামাজের মধ্যে কতটুকু সময় ছিল? তিনি বললেন: পঞ্চাশ আয়াত পড়ার পরিমাণ সময়।'(বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

আযানের মুহূর্তে পান করা

যদি আযান শুরু হয়ে যায় আর কোনো ব্যক্তি পানি পানরত থাকে, তবে সে অবশিষ্ট পানি পান করে শেষ করতে পারে। আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ আযান শুনে আর পাত্র তার হাতে থাকে, তবে সে যেন তার প্রয়োজন শেষ হওয়ার আগে তা রেখে না দেয়।'

২ - দ্রুত ইফতার করা

রোজাদারের জন্য মুস্তাহাব হলো দ্রুত ইফতার করা। অর্থাৎ সূর্যাস্ত যাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হলে সাথে সাথে ইফতার করা। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম বলেছেন,'মানুষ ভালো থাকবে যতক্ষণ তারা দ্রুত ইফতার করে যাবে।' (বর্ণনায় আবু দাউদ)

তাজা খেজুর দিয়ে ইফতার করা মুস্তাহাব। তাজা খেজুর না পাওয়া গেলে শুকনো খেজুর দিয়ে ইফতার করা। খেজুর বেজোড় সংখ্যায় হওয়া। যদি খেজুর না পাওয়া যায় তবে কয়েক ঢোক পানি দিয়ে ইফতার করা। আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে,'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজের পূর্বে বেজোড় সংখ্যক তাজা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। তাজা খেজুর না পেলে শুকনো খেজুর দিয়ে। আর খেজুর না পেলে তিনি কয়েক ঢোক পানি পান করে ইফতার করতেন।'(বর্ণনায় তিরমিযী)

৩- ইফতারের সময় দুআ

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইফতার করতেন, বলতেন,

«ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ»

'তৃষ্ণা চলে গেছে, শিরাগুলো আদ্র হয়েছে আর ছাওয়াব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনত্র বলেছেন, 'নিশ্চয় ইফতারের সময় রোজাদারের দুআ ফিরিয়ে দেয়া হয় না।' (বর্ণনায় ইবনে মাজাহ)

৪- অহেতুক ও অশ্লীল কথা পরিত্যাগ করা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যখন রোজা রাখবে তখন সে যেন অশ্লীল কথা বর্জন করে, ঝগড়া ও হট্টগোল বর্জন করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হয় তখন সে যেন বলে, আমি রোজাদার।'(বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

৫- বেশি বেশি ইবাদত করা

যেমন কুরআন তিলাওয়াত, আল্লাহর যিকর করা, তারাবির নামাজ পড়া, তাহাজ্জুদের নামাজ পড়া, লাইলাতুল কদর যাপন করা, ফরজ নামাজের আগে-পড়ের সুন্নতগুলো আদায় করা, দান-সদকা করা, ভালো কাজ সম্পাদনে অর্থ ও শ্রম ব্যয় করা, রোজাদারদেরকে ইফতার করানো ও মাহে রমজানে উমরা আদায় করা; কেননা মাহে রমজানে নেক আমলের ছাওয়াব বাড়িয়ে দেয়া হয়। ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব থেকে বেশি দানশীল ছিলেন, আর তিনি মাহে রমজানে সমধিক দানশীল হতেন, যখন জিব্রীল তার সাথে সাক্ষাৎ করতেন। আর জিব্রীল রমজানের প্রতি রাতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাঁকে কুরআন চর্চা করাতেন। যখন জিব্রীল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করতেন তখন তিনি দান-খয়রাতে উন্মুক্ত বাতাস থেকেও অধিক বেগবান হতেন।'(বর্ণনায় বুখারী)

রোজা রাখা অবস্থায় যা মাকরূহ

১ - কুলি করা ও নাকে পানি দেয়ায় অতিরঞ্জন করা

কেননা এরূপ করলে পেটে পানি চলে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। এতদসংক্রান্ত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আর নাকে পানি দেয়ায় তুমি অতিরঞ্জন করো, তবে যদি রোজাদার হও।' (বর্ণনায় আবু দাউদ)

২ - যৌনোত্তেজনাসহ চুম্বন করা

রোজাদার ব্যক্তি যদি বীর্যপাত অথবা উত্তেজনা বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা করে তবে তার পক্ষে চুম্বন করা মাকরূহ হবে। আর রোজাদার ব্যক্তির উচিত হবে এমনসব বিষয় বর্জন করা যার দ্বারা যৌনাত্তেজনা আন্দোলিত হয়। হাঁ, যদি রোজা ভঙ্গ হবে

না বলে আত্মবিশ্বাস থাকে, তবে তার কথা ভিন্ন। আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,,'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোজা রাখা অবস্থায় চুম্বন করতেন, আলিঙ্গন করতেন। আর তিনি ছিলেন তোমাদের মধ্যে সবথেকে বেশি তার প্রয়োজনকে নিয়ন্ত্রণকারী।'(বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম) এ কারণেই যুবকদের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর একে অন্যের সাথে জড়িয়ে থাকা মাকরুহ। অবশ্য বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে মাকরুহ নয়। আবু হুরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত, 'এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বামী-স্ত্রীর একে অন্যের সাথে জড়িয়ে থাকা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাকে অনুমতি দিলেন। অন্যএক ব্যক্তি এসে অভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করল, তবে তিনি তাকে নিষেধ করলেন। দেখা গেল, তিনি যাকে অনুমতি দিলেন সে ছিল বৃদ্ধ। আর যাকে অনুমতি দিলেন না সে ছিল যুবক।' [বর্ণনায় আবু দাউদ]

রোজাভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

১ - রোজা রাখাবস্থায় ইচ্ছা করে খাবার ও পানীয় গ্রহণ

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ﴾

{এবং তোমরা আহার কর ও পান কর যতক্ষণ না ফজরের সাদা রেখা কাল রেখা থেকে স্পষ্ট হয়। অতঃপর রাত পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর।} [সূরা আল বাকারা:১৮৭]

কাজের কারণে রোজা ভঙ্গ করা

যে ব্যক্তি চুল্লিতে অথবা অন্যকোনো কঠিন কাজে নিয়োজিত তার জন্য রোজা ভাঙ্গা বৈধ হবে না; কেননা সে অন্যদের মতোই রোজা রাখার নির্দেশের আওতাভুক্ত।





দ্রষ্টব্য

যে ব্যক্তি রোজা রাখার কথা ভুলে গিয়ে খেল বা পান করল তার রোজা শুদ্ধ হবে। তবে মনে হওয়ার সাথে সাথে খাবার ও পানীয় বর্জন করতে হবে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রোজার কথা ভুলে গেল, অতঃপর খেল ও পান করল, সে যেন তার রোজা পূর্ণ করে; কেননা আল্লাহ তাআলাই তাকে খাইয়েছেন ও পান করিয়েছেন।'(বর্ণনায় মুসলিম)



ইচ্ছাকৃতভাবে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করা রোজা ভঙ্গের কারণ

যা কিছু খাবার ও পানীয় বলে গণ্য তা যদি মুখ অথবা নাকের পথ হয়ে পেটে প্রবেশ করে তবে রোজা ভেঙ্গে যাবে, যেমন খাদ্যজাতীয় ইনজেকশন। তবে যে ইনজেকশন খাদ্যজাতীয় নয়, যেমন ইনসোলিন ইত্যাদি রোজাভঙ্গকারী বলে বিবেচিত নয়; কেননা তা খাদ্য ও পানীয়ের মধ্যে পড়ে না।



খাদ্যজাতীয় ইনজেকশন রোজা ভঙ্গের কারণ



ইনসোলিন ইনজেকশন রোজাভঙ্গকারী নয়



খাদ্যজাতীয় ওষুধ ব্যবহার করা রোজা ভঙ্গের কারণ

প্রয়োজনের তাগিদে মুখ দিয়ে মেডিকেল স্প্যাকুলাম প্রবেশ করালে অথবা ইনহেইলার ব্যবহার করলে রোজা ভঙ্গ হবে না। তদ্রূপভাবে সুরমা অথবা চোখ ও কানে ওষুধের ড্রপ ব্যবহার করলে রোজা ভঙ্গ হবে না; কেননা এর দ্বারা রোজা ভঙ্গ হওয়ার কোনো দলিল পাওয়া যায় না। উপরন্তু চোখ, খাদ্য ও পানীয় গ্রহণের স্বাভাবিক পথ নয়। কান ও নাকের ড্রপের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। তবে নাকের ড্রপের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উত্তম; কেননা রোজাদারের ক্ষেত্রে নাকে পানি দেয়ায়

অতিরঞ্জন থেকে বারণ করা হয়েছে। উপরন্তু নাক পাকস্থলির প্রবেশপথ বলেও গণ্য।

আর যদি রোজাদার ব্যক্তি এমন কোনো জিনিস গ্রহণ করে যা খাদ্য নয়, অথবা যা ক্ষতিকর, যেমন বিড়ি-সিগারেট, তবে তা রোজাভঙ্গকারী বলে বিবেচিত হবে। কেননা সে তা খাদ্যগ্রহণের স্বাভাবিক পথ দিয়ে গ্রহণ করেছে। আর তা হলো মুখ। উপরন্তু এটা খাদ্য ও পানীয়ের মতোই।

যা থেকে বেঁচে থাকা অসম্ভব, যেমন রাস্তার ধুলোবালি, দাঁতের ফাঁকে লেগে-থাকা খাদ্য ইত্যাদির দ্বারা রোজা ভঙ্গ হবে না।



বিড়ি-সিগারেট রোজাভঙ্গকারী



ইনহেইলার রোজা ভঙ্গের কারণ নয়



দাঁতের ফাঁকে লেগে-থাকা খাদ্য রোজাভঙ্গকারী নয়



সুরমা রোজা ভঙ্গকারী নয়

২ - রতিক্রিয়া

আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ﴾

{সিয়ামের রাতে তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীদের নিকট গমন হালাল করা হয়েছে।}

[আল বাকারা: ১৮৭]

অতএব রমজান মাসে দিনের বেলায় রতিক্রিয়ায় লিপ্ত হলে রোজা ভেঙ্গে যাবে এবং কাযা ও কঠিন কাফফারা উভয়টাই আবশ্যক হবে। আর এ ক্ষেত্রে কাফফারা হলো গোলাম আযাদ করা। গোলাম আযাদ করতে অপারগ হলে দু মাস লাগাতার রোজা রাখা। রোজা রাখতে অপারগ হলে ষাটজন মিসকীনকে খাবার খাওয়ানো। আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, 'এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, 'আমি ধ্বংস হয়ে গেছি।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'কেন, কি হয়েছে?' লোকটি বলল, 'রোজা অবস্থায় স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়েছি।' তিনি বললেন, 'তুমি কি একটি গোলাম আযাদের সামার্থ্য রাখো?' লোকটি বলল, 'না', তিনি বললেন, 'তুমি কি দু'মাস লাগাতার রোজা রাখতে পারবে? লোকটি বলল, 'না', তিনি বললেন, 'তুমি কি ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াতে পারবে?' লোকটি বলল, 'না', তিনি বললেন, 'বসো'। লোকটি বসল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বড় একটি মাপ-পাত্র নিয়ে এলেন যাতে খেজুর ছিল। তিনি বললেন, 'নাও, এগুলো সদকা করে দাও।' লোকটি বলল, 'আমাদের চেয়েও দরিদ্রকে দান করব?!' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসলেন, এমনকি তাঁর দান্দান মুবারক উন্মোচিত হয়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেন, 'এগুলো তোমার পরিবারকে খাওয়াও।'(বর্ণনায় তিরমিযী)

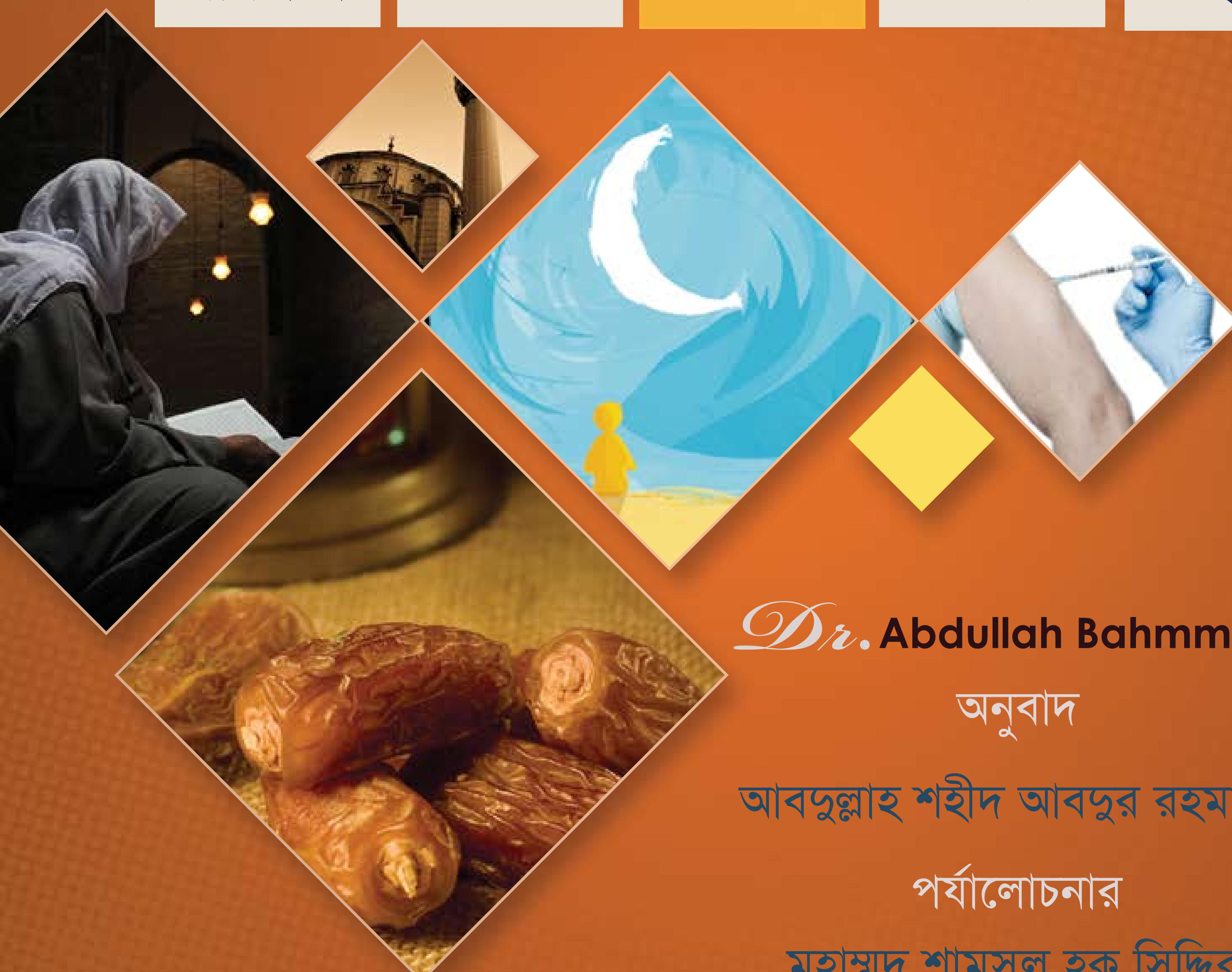
রোজার কাফফারা হবে উপরে বর্ণিত অনুক্রম অনুযায়ী। অর্থাৎ যদি রোজা রাখতে অপারগ হয় তবেই কেবল মিসকীনকে খাদ্যদানের সুযোগ গ্রহণ করা যাবে। আর যদি গোলাম আযাদের সক্ষমতা থাকে তবে রোজা রাখার সুযোগ নেয়া বৈধ হবে না।

আর নারী যদি রতিক্রিয়ায় পুরুষের সাথে সায় দেয় তাহলে নারীকেও কাফফারা দিতে হবে। কিন্তু যদি নারীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও পুরুষ তাকে বাধ্য করে, তবে নারীর রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং তা কাযা করতে হবে তবে কাফফারা দিতে হবে না।

আলোকচিত্রে ইবাদত

সহজ সরল উপয়ে ইসলামের বিধি-বিধান শেখা

পবিত্রতা | নামাজ | রোজা | যাকাত | হজ্ব



Dr. Abdullah Bahmmam

অনুবাদ

আবদুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান

পর্যালোচনায়

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

রমজানের রোজা

৩

রমজানের রোজা



সূচীপত্র

রমজানের রোজা

রমজানের রোজা ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের একটি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার ওপর ফরজ করে দেওয়া একটি ফরজ। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝١٨٣﴾

{হে মুমিনগণ, তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর।} [সূরা আল বাকারা:১৮৩]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,'ইসলাম পাঁচটি বিষয়ের ওপর নির্মিত হয়েছে' এ-পাঁচটির মধ্যে তিনি উল্লেখ করেছেন(রমজানের রোজা)

রমজানের ফজিলত

১ - রমজান মাসে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়। এ মাসে শয়তানকে শিকল পরিয়ে বেঁধে রাখা হয় এবং মানুষের হৃদয়ে ভালো কাজ করার প্রেরণা জাগ্রত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যখন রমজান প্রবেশ করে আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়, আর শয়তানদেরকে শিকল পরিয়ে দেয়া হয়।'

(বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

২- ছাওয়াবপ্রাপ্তির দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে ও আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় যে ব্যক্তি রমজান মাসে সিয়াম-কিয়াম চর্চা করে আল্লাহ তার অতীতের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,'যে ব্যক্তি ছাওয়াবপ্রাপ্তির দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে ও আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় রোজা রাখে তার অতীতের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।'(বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

অন্যএক হাদীসে এসেছে,'যে ব্যক্তি রমজান মাসে ছাওয়াবপ্রাপ্তির দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে ও আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় রমজানের রাতযাপন করে আল্লাহ তাআলা তার অতীতের গুনাহসমূহ মাফ করে দেন।'(বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

৩- মাহে রমজানে লায়লাতুল কদর রয়েছে, যার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

﴿لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝٣﴾

{লায়লাতুল কদর এক হাজার মাস থেকে উত্তম।} [সূরা আল কাদ্র: ৩]

আর যে ব্যক্তি ছাওয়াবপ্রাপ্তির দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে ও আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় লায়লাতুল কদর যাপন করবে তার অতীতের গুনাহসমূহ আল্লাহ তাআলা মাফ করে দিবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,'যে ব্যক্তি ছাওয়াবপ্রাপ্তির

দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে ও আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় লায়লাতুল কদর যাপন করল আল্লাহ তাআলা তার অতীতের সকল গুনাহ মাফ করে দিলেন।'(বর্ণনায় মুসলিম)

৫- রমজান মাস কুরআনের মাস। এ মাসেই নাযিল হয়েছে মহিমান্বিত কুরআন। তাই এ মাসে বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করা প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ﴾

{রমজান মাস, যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের জন্য হিদায়েত স্বরূপ এবং হিদায়েতের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে।} [সূরা আল বাকারা:১৮৫]

৬ - রমজান মাস সদকা ও দানখয়রাতের মাস, ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবথেকে বেশি দানশীল ছিলেন, আর তিনি মাহে রমজানে সমধিক দানশীল হতেন যখন জিব্রীল তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। আর জিব্রীল রমজানের প্রতি রাতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাঁকে কুরআন চর্চা করাতেন। যখন জিব্রীল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করতেন তখন তিনি দান-খয়রাতে উন্মুক্ত বাতাস থেকেও অধিক বেগবান হতেন।'(বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

রমজানে রোজা ভঙ্গ করা

রমজানে রোজা ভঙ্গ করা হারাম ও বড় গুনাহ। আর যে ব্যক্তি ওযর ব্যতীত রমজানের কোনো একদিনের রোজা ভেঙ্গে ফেলল এবং তাওবা করল না, সারা জীবনের রোজাও এ দিনের ক্ষতিপূরণ হিসেবে যথেষ্ট হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,'যে ব্যক্তি রমজানের কোনো একদিন, আল্লাহ তাআলার দেয়া সুযোগ ব্যতীত রোজা ভঙ্গ করল, আজীবনের রোজাও তার কাযা হিসেবে যথেষ্ট হবে না।'(বর্ণনায় আবু দাউদ) আর রোজা ভঙ্গের শাস্তিও অনেক কঠিন। আবু উমামা আল-বাহেলী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,'আমি ঘুমন্ত ছিলাম, এ সময় দু'ব্যক্তি এলেন..... অতঃপর আমাকে নিয়ে রওয়ানা হলেন। পরবর্তীতে আমি কিছু লোক দেখতে পেলাম যাদেরকে পায়ের রগে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, যাদের মুখের চোয়াল ছিল ফাঁটা যাত্থেকে রক্ত ঝরছিল। তিনি বললেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওরা করা?' তিনি বললেন,'ওরা হলো যারা রোজা ভঙ্গের সময় আসার পূর্বেই রোজা ভঙ্গ করত।' (বর্ণনায় ইবনে হিব্বান)

রমজান শুরু হয়েছে তা কিভাবে নিশ্চিত হওয়া যাবে?

রমজান শুরু হয়েছে তা নিশ্চিত হওয়া যাবে চাঁদ দেখার মাধ্যমে। যদি শাবান মাসের উনত্রিশ তারিখের সূর্যাস্তের পর চাঁদ দেখা যায় তাহলে এটাই হবে রমজান শুরুর নিশ্চিত দলিল। আর যদি এ দিন চাঁদ দেখা না যায় অথবা মেঘ, ধুলো অথবা ধোঁয়া ইত্যাদি চাঁদ দেখাকে বাধাগ্রস্ত করে, তবে শাবান মাস ত্রিশদিন পূর্ণ করতে হবে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,'তোমরা চাঁদ দেখে রোজা রাখো এবং চাঁদ দেখে রোজা ভঙ্গ করো। আর যদি এ মাসের চাঁদ দেখা সম্ভব না হয় তবে শাবান মাস ত্রিশদিন হিসাব করো।'(বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

রোজা ভঙ্গের ওযরসমূহ

১ - অসুস্থতা

অসুস্থ ব্যক্তির জন্য রমজান মাসে রোজা ভঙ্গ করা বৈধ। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۚ﴾

{(আর যে অসুস্থ হবে অথবা সফরে থাকবে তবে অন্যান্য দিবসে সংখ্যা পূরণ করে নেবে।} [সূরা আল বাকারা:১৮৪]

যে অসুস্থতার কারণে রমজান মাসে রোজা ভঙ্গ করা চলে তা হলো এমন অসুস্থতা যার কারণে রোজা রাখা অনেক কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায় অথবা রোজা রাখলে নিশ্চিত ক্ষতির আশঙ্কা থাকে।



অসুস্থ ব্যক্তির রোজা ভঙ্গ করা

যদি অসুস্থ ব্যক্তি রোজা ভঙ্গ করে আর তার অসুস্থতা এমন হয় যা সুস্থ হবে বলে আশা থাকে, তাহলে সুস্থ হওয়ার পর যেসব রোজা ছুটে গেছে তা কাযা করতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

{আর যে অসুস্থ হবে অথবা সফরে থাকবে তবে অন্যান্য দিবসে সংখ্যা পূরণ করে নেবে।} [সূরা আল বাকারা:১৮৪]

যে রোগ ভালো হওয়ার আশা নেই - যেমন জীবনব্যাপী অসুস্থতা অথবা এমন বার্ধাক্য

যার কারণে ব্যক্তি স্থায়ীভাবে রোজা রাখতে অপারগ হয়ে যায় - এমতাবস্থায় প্রতিদিনের রোজার পরিবর্তে একজন মিসকীনকে অর্ধ সা' চাউল অথবা অন্যকোনো দেশীয় খাবার দান করতে হবে।

২- সফর

মুসাফির ব্যক্তির জন্য রমজান মাসে রোজা ভঙ্গ করা বৈধ। তবে ভাঙ্গা রোজাগুলো পরবর্তীতে অবশ্যই কাযা করতে হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

{আর যে অসুস্থ হবে অথবা সফরে থাকবে তবে অন্যান্য দিবসে সংখ্যা পূরণ করে নেবে।} [সূরা আল বাকারা:১৮৪]

যে সফরে রোজা ভঙ্গ করা চলে তা হলো একই ধরনের সফর যার কারণে নামাজ কসর করা চলে।

কিন্তু যদি মুসাফির ব্যক্তি রোজা রাখে তবে তার রোজা শুদ্ধ হবে। আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,'আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সফর করতাম। যে ব্যক্তি রোজা রাখত তাকেও তিনি দোষারোপ করতেন না, আবার যে রোজা রাখত না তাকেও দোষারোপ করতেন না।'(বর্ণনায় বুখারী)

তবে শর্ত হলো রোজা যেন মুসাফিরের জন্য খুব কষ্টকর না হয়। আর যদি রোজা রাখা খুব কষ্টকর হয় অথবা ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাহলে রোজা ভঙ্গ করাই উত্তম হবে; কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফরাবস্থায় এক রোজাদার ব্যক্তিকে দেখলেন যে প্রচন্ড গরমের কারণে তাকে ছায়া দেয়া হচ্ছে এবং লোকজন তার চারপাশে ভিড় করছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'সফর অবস্থায় রোজা রাখা উত্তম কাজের মধ্যে শামিল নয়।' (বর্ণনায় বুখারী)



৩- গর্ভ ও দুগ্ধদান

গর্ভাবস্থা অথবা দুগ্ধদান অবস্থায় নারী যদি তার ক্ষতির আশঙ্কা করে তবে তার জন্য রোজা ভঙ্গ করা বৈধ হবে। তবে তাকে কাযা করতে হবে অসুস্থ ব্যক্তির মতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মুসাফির ব্যক্তির উপর থেকে রোজা এবং নামাজের একাংশ উঠিয়ে নিয়েছেন। আর গর্ভধারী ও দুগ্ধদানকারী নারীর ওপর থেকে তিনি রোজা উঠিয়ে নিয়েছেন।' (বর্ণনায় তিরমিযী)

আর যদি নিজের ক্ষতির কোনো ভয় না থাকে, কিন্তু বাচ্চার ক্ষতির আশঙ্কা থাকে তাহলেও রোজা ভঙ্গ করা বৈধ হবে, তবে তাকে কাযা করতে হবে ও প্রতিদিনের রোজার পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্যদান করতে হবে। ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন,'দুগ্ধদানকারী ও গর্ভধারী নারী যদি তার সন্তানের ব্যাপারে আশঙ্কা করে তাহলে সে রোজা ভঙ্গ করবে ও মিসকীনকে খাদ্যদান করবে।'(বর্ণনায় আবু দাউদ)



৪- হায়েয ও নিফাস

যে নারী হায়েয ও নিফাসগ্রস্ত হয়েছে সে আবশ্যিকভাবে রোজা ভঙ্গ করবে। এ অবস্থায় রোজা রাখা হারাম হবে। এমতাবস্থায় রোজা রাখলে তা শুদ্ধ হবে না। তবে ভাঙ্গা রোজাগুলো পরবর্তীতে কাযা করতে হবে। এর প্রমাণ, আয়েশা রাযি.-কে হায়েযগ্রস্ত নারী রোজা কাযা করবে কি না, এ-ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন,'বিষয়টি আমাদেরকেও স্পর্শ করত, অতঃপর আমাদেরকে রোজা কাযা করার নির্দেশ দেয়া হত তবে নামাজ কাযা করার নির্দেশ দেয়া হত না।'(বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)



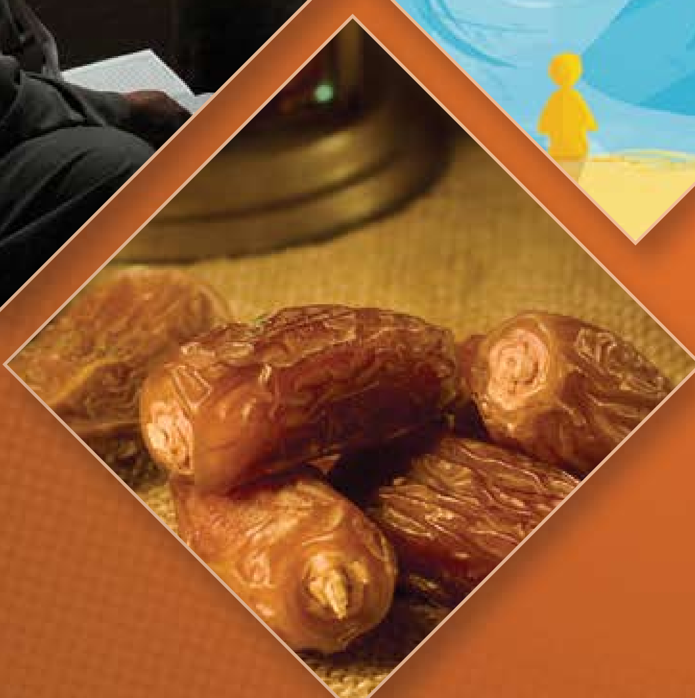
আলোকচিত্রে ইবাদত

সহজ সরল উপয়ে ইসলামের বিধি-বিধান শেখা

পবিত্রতা | নামাজ | রোজা | যাকাত | হজ্ব







Dr. Abdullah Bahmmam

অনুবাদ

আবদুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান

পর্যালোচনার

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

নফল রোজা

৪ নফল রোজা

নফল রোজা

আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য, ফরজ-ওয়াজিব নয়, এমন রোজা পালনকেই নফল রোজা বলে।

সূচীপত্র

নফল রোজার অনেক বড় ফজিলত ও ছাওয়াব রয়েছে। আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে কুদসীতে এসেছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,,'আদম সন্তানের প্রতিটি আমলের ছাওয়াবই দ্বিগুণ করে দেয়া হয়। পুণ্যকর্মের ছাওয়াব দশগুণ থেকে সাতশ'গুণ বাড়িয়ে দেয়া হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,'তবে রোজা ব্যতীত; কারণ রোজা আমার আর আমিই এর প্রতিদান দিই।'(বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

যেসব দিনের রোজা রাখা সুন্নত

১– শাওয়াল মাসের ছয় রোজা



রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয় সাল্লাম বলেছেন,'যে ব্যক্তি রমজানের রোজা রাখল, অতঃপর এর পেছনে শাওয়াল মাসে ছয়দিন রোজা রাখল সে যেন সারা বছর রোজা রাখল।'(বর্ণনায় মুসলিম)শাওয়ালের ছয় রোজা একসাথেও রাখা যায় আবার ভিন্ন ভিন্ন ভাবেও রাখা যায়।

২ – যিলহজ্বের শুরুতে নয়দিন রোজা রাখা

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,'এই দশদিনের তুলনায় আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় আমলের অন্যকোনো দিবস নেই। অর্থাৎ যিলহজ্বের দশদিন। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করে বললেন, 'এমনকি আল্লাহর পথে জিহাদও না? হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন,'এমনকি আল্লাহর পথে জিহাদও না, কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি তার জান-মাল নিয়ে বের হয়ে যায় আর কোনো কিছু নিয়ে ফিরে না আসে, তবে তার কথা ভিন্ন।'(বর্ণনায় বুখারী) তবে এ দশদিনের মধ্যে, যে ব্যক্তি হজ্বরত অবস্থায় নয়, তার ক্ষেত্রে আরাফা দিবসের রোজা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আরাফা দিবস সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,'আরাফা দিবসের রোজা তার একবছর পূর্বের ও পরের গুনাহের কাফফারা বলে আল্লাহর কাছে আশা করি।' (বর্ণনায় মুসলিম)



৩– আশুরা দিবসের রোজা, এর আগের দিনের রোজাসহ

আশুরা

মহররম মাসের দশ তারিখকেই আশুরা বলা হয়

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,'আশুরা দিবসের রোজা এর পূর্বের এক বছরের গুনাহের কাফফারা হবে বলে আল্লাহর কাছে আশা করি।'(বর্ণনায় মুসলিম)

আশুরার রোজা কেন রাখা হবে এ ব্যাপারে

প্রতি চান্দ্র মাসের তেরো, চৌদ্দ ও পনের তারিখকে আইয়ামুল বিয বলে। এ তিনদিনের রাতগুলো চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত থাকে বলে এ দিনগুলোকে আইয়ামুল বিয বা শুভ্রদিন বলে



আখ্যায়িত করা হয়েছে।, 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় এলেন। তিনি দেখতে পেলেন, ইহুদিরা আশুরা দিবসে রোজা রাখছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,'এটা কী?' তারা বলল, এটি একটি ভালো দিন। এ দিন আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাইলকে তাদের শত্রুদের থেকে মুক্তি দিয়েছেন, অতঃপর মূসা আলাইহিস সালাম এ দিন রোজা রেখেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,'মূসা আ. এর ব্যাপারে তোমাদের থেকে আমার অধিকার বেশি, অতঃপর তিনি এ দিবসের রোজা রাখলেন এবং অন্যদেরকেও এ দিবসের রোজা রাখার নির্দেশ দিলেন।'(বর্ণনায় মুসলিম)

৪- প্রতিমাসের আইয়ামুল বিয

আইয়ামুল বিয

প্রতি চান্দ্র মাসের তেরো, চৌদ্দ ও পনের তারিখকে আইয়ামুল বিয বলে। এ তিনদিনের রাতগুলো চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত থাকে বলে এ দিনগুলোকে আইয়ামুল বিয বা শুভ্রদিন বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আবদুল মালিক ইবনে মিনহাল তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলেন। তিনি বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে আইয়ামুল বিয এর রোজা রাখার নির্দেশ দিতেন এবং বলতেন,'এটাই হলো বছরব্যাপী রোজা রাখা।' (বর্ণনায় বুখারী)

৫- প্রতি সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোজা রাখা

আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,সোমবার ও বৃহস্পতিবার আমল উপস্থাপন করা হয়, অতএব আমি পছন্দ করি যে, আমার আমল এ অবস্থায় উপস্থাপন করা হোক যে আমি রোজাদার।'(বর্ণনায় মুসলিম)

৬- একদিন পর পর রোজা রাখা

সর্বোত্তম নফল রোজা হলো দাউদ আলাইহিস সালামের রোজা। তিনি একদিন রোজা রাখতেন ও অপর দিন ভঙ্গ করতেন। আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,'নিশ্চয় আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় রোজা হলো দাউদ - এর রোজা। তিনি একদিন রোজা রাখতেন ও একদিন ভঙ্গ করতেন।'

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,'নিশ্চয় আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় রোজা হলো দাউদ - এর রোজা। তিনি একদিন রোজা রাখাতেন ও একদিন ভঙ্গ করতেন।'(বর্ণনায় ইবনে হিব্বান)

৭ - মহররম মাসে রোজা

আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,'রমজানের পর সর্বোত্তম রোজা হলো মহররম মাসের রোজা।'(বর্ণনায় তিরমিযী)

৮- শাবান মাসে রোজা

উসামা ইবনে যায়েদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম,'হে আল্লাহর রাসূল, আমি আপনাকে শাবানের মতো অন্যকোনো মাসে রোজা রাখতে দেখি না? তিনি বললেন, রজব ও রমজানের মাঝের এ মাসটি সম্পর্কে মানুষ গাফেল থাকে। আর এ মাসে রাব্বুল আলামীনের দরবারে আমল ওঠানো হয়। রোজা পালন অবস্থায় আমার আমল ওঠানো হোক এটা আমার পছন্দ।'(বর্ণনায় নাসায়ী)

নফল রোজার নিয়ত

রাতের বেলা থেকে নফল রোজার নিয়ত করা জরুরি নয়। বরং যদি দিনের বেলায় কোনোকিছু খাওয়ার আগে নফল রোজা রাখার ইচ্ছা হয়, তখন থেকেই ওইদিনের রোজা রাখা চলবে। আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন আমাকে বললেন, 'হে আয়েশা, তোমাদের কাছে কি কোনো (খাবার) আছে? আয়েশা রাযি. বলেন, 'আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের কাছে কোনোকিছু নেই। তিনি বললেন,'তাহলে আমি রোজা রাখলাম।'(বর্ণনায় মুসলিম)

চিকিৎসাবিজ্ঞানের আলোকে রোজা

চর্মরোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে রোজা উপকারী। এর কারণ রোজা রক্তের মাঝে পানির অংশ কমিয়ে দেয়, অতঃপর ত্বকের মধ্যেও এর পরিমাণ কমে যায় এবং ফলে সংক্রামক জার্ম ও রোগব্যাধি থেকে ত্বকের প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যায়।







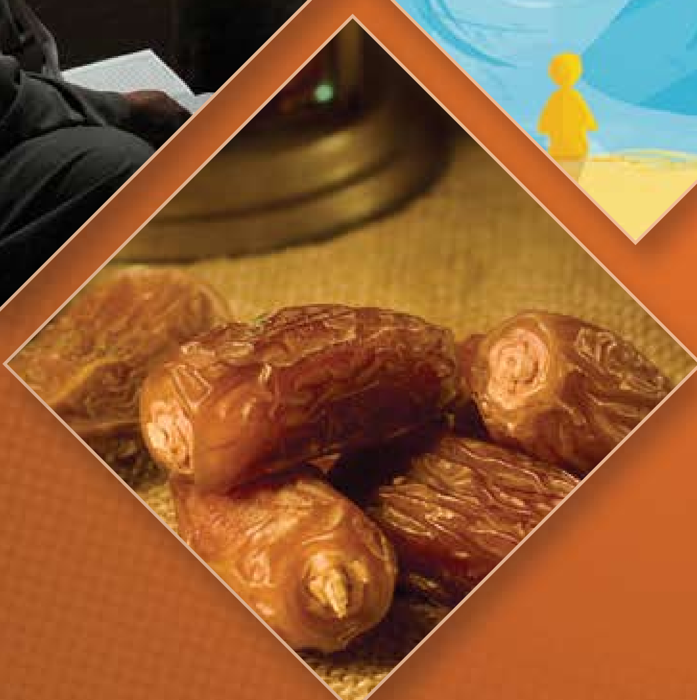
আলোকচিত্রে ইবাদত

সহজ সরল উপয়ে ইসলামের বিধি-বিধান শেখা

পবিত্রতা | নামাজ | রোজা | যাকাত | হজ্ব







Dr. Abdullah Bahmmam

অনুবাদ

আবদুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান

পর্যালোচনায়

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

লাইলাতুল কদর বা শবে কদরের ফজিলত ও আমল

৫

লায়লাতুল কদর



সূচীপত্র

লায়লাতুল কদর নামকরণের কারণ কি?

১ - কদরের এক অর্থ সম্মান। ইরশাদ হয়েছে :

﴿وَمَا قَدَرُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦٓ﴾

{আর তারা আল্লাহকে যথার্থ সম্মান দেয়নি} [সূরা আল আনআম:৯১]

সে হিসেবে লায়লাতুল কদর অর্থ হবে সম্মানিত রাত; কেননা এ রাতে কুরআন নাযিল হয়েছে, এ রাতে ফেরেশতাগণ নেমে আসেন এবং এ রাতে রবকত-রহমত-মাগফিরাত নাযিল হয়।

২ - কদরের আরেক অর্থ সংকীর্ণকরণ, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ﴾

{আর যার রিযক সংকীর্ণ করা হয়েছে সে যেন আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তা হতে ব্যয় করে।} [সূরা আত-তালাক:৭]

লায়লাতুল কদরের ক্ষেত্রে সংকীর্ণকরণের অর্থ হবে লায়লাতুল কদর সংঘটিত হওয়ার সুনির্দিষ্ট তারিখ গোপন করে রাখা।

৩ - কাদ্র কাদার থেকেও উৎকলিত হতে পারে, যার অর্থ হবে এ রাতে আল্লাহ তাআলা সে বছরের সকল আহকাম নির্ধারণ করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾

{সে রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়} [সূরা আদ-দুখান:৪]

লায়লাতুল কদরের ফজিলত ও মর্যাদা

১- লায়লাতুল কদরেই পবিত্র কুরআন নাযিল করা হয়েছে

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ﴾

{নিশ্চয় আমি এটি নাযিল করেছি 'লাইলাতুল কদরে।}[সূরা আল কাদ্র:১]

২ – লায়লাতুল কদর হাজার মাস থেকেও উত্তম

আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿لَيۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ خَيۡرٞ مِّنۡ أَلۡفِ شَهۡرٖ﴾

{লায়লাতুল কদর এক হাজার মাস থেকে উত্তম} [সূরা আল-কাদ্র:৩] অর্থাৎ লায়লাতুল কদরে আমল করা লায়লাতুল কদরের বাইরে এক হাজার মাস আমল করার চেয়েও উত্তম।

৩– লায়লাতুল কদরে ফেরেশতা ও জিব্রীল এর অবতরণ

আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿تَنَزَّلُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذۡنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمۡرٖ﴾

{সে রাতে ফেরেশতারা ও রূহ (জিব্রীল) তাদের রবের অনুমতিক্রমে সকল সিদ্ধান্ত নিয়ে অবতরণ করে।}[সূরা আল কাদ্র:৪]

আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,'লায়লাতুল কদর হলো সাতাশ তারিখ অথবা ঊনত্রিশ তারিখের রাত, আর ফেরেশতাগণ এ রাতে পৃথিবীতে কঙ্করের সংখ্যা থেকেও বেশি থাকেন।'

৪ – লায়লাতুল কদর হলো শান্তির রাত

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿سَلَٰمٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطۡلَعِ ٱلۡفَجۡرِ ۝٥﴾

{শান্তিময় সেই রাত, ফজরের সূচনা পর্যন্ত।}

[সূরা আল কাদ্র:৫]

অর্থাৎ লায়লাতুল কদরের পুরোটাই ভালো, এর শুরু থেকে সুবেহ সাদেক পর্যন্ত আদৌ কোনো অনুত্তম বিষয় নেই।

৫– লায়লাতুল কদর মুবারক রাত

আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ فِي لَيۡلَةٖ مُّبَٰرَكَةٍۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ۝٣﴾

{নিশ্চয় আমি এটি নাযিল করেছি বরকতময় রাতে; নিশ্চয় আমি সতর্ককারী।}

[সূরা আদ-দুখান:৩]

উক্ত আয়াতে 'লায়লাতুম্ মুবারাকা'- এর অর্থ ইবনে আব্বাস রাযি. এর নিকট 'লায়লাতুল কদর।'

৬ - এ রাতে এক বছরের সকল প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়া হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿فِيهَا يُفۡرَقُ كُلُّ أَمۡرٍ حَكِيمٍ﴾

{সে রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়।} [সূরা আদ-দুখান:৪]

৭ – যে ব্যক্তি ছাওয়াবপ্রাপ্তির দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে ও আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় লায়লাতুল কদর যাপন করবে তার অতীতের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি ছাওয়াবপ্রাপ্তির দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে ও আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় লায়লাতুল কদর যাপন করল, তার অতীতের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হলো।'(বর্ণনায় ইবনে খুযায়মাহ)

কোন রাত লায়লাতুল কদর?

আল্লাহ তাআলা এ রাতকে গোপন করে রেখেছেন, যাতে মুসলিম ব্যক্তি রমজানের শেষ দশদিনে অধিক শ্রম ব্যয় করে, বিশেষ করে বেজোড় রাতগুলোয়। আর সেগুলো হলো ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ তারিখের রাত। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা রমজানের শেষ দশের বেজোড় রাতগুলোতে লায়লাতুল কদর অনুসন্ধান করো।'(বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

আলেমদের কেউ কেউ বিভিন্ন দলিলের মাধ্যে সমন্বয় করতে গিয়ে বলেছেন, এ রাতগুলোর এককেটায় এককে সময় লায়লাতুল কদর সংঘটিত হয়ে থাকে।(বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

লায়লাতুল কদরে যেসব আমল মুস্তাহাব

১ - ইতিকাফ : রমজানের শেষ দশকের পুরোটাতেই ইতিকাফ করতে হয়, শুধু লায়লাতুল কদরে নয়। আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমজানের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন।' (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

২ - ছাওয়াবপ্রাপ্তির দৃঢ় বিশ্বাসসহ ও আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় লায়লাতুল কদর যাপন করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ছাওয়াবপ্রাপ্তির দৃঢ় বিশ্বাসসহ ও আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় লায়লাতুল কদর যাপন করল, তার অতীতের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হলো।'(বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

৩ - দুআ : আয়েশা রাযি. বলেন,' আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমি যদি লায়লাতুল কদর পাই তবে কি দুআ করব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি বলো,' اللهم إنك عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ، فاعْفُ عَنِّي অর্থাৎ হে আল্লাহ, আপনি অতি ক্ষমাশীল ও দয়ালু, আপনি ক্ষমা করাকে পছন্দ করেন, তাই আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন।

লায়লাতুল কদরের আলামত

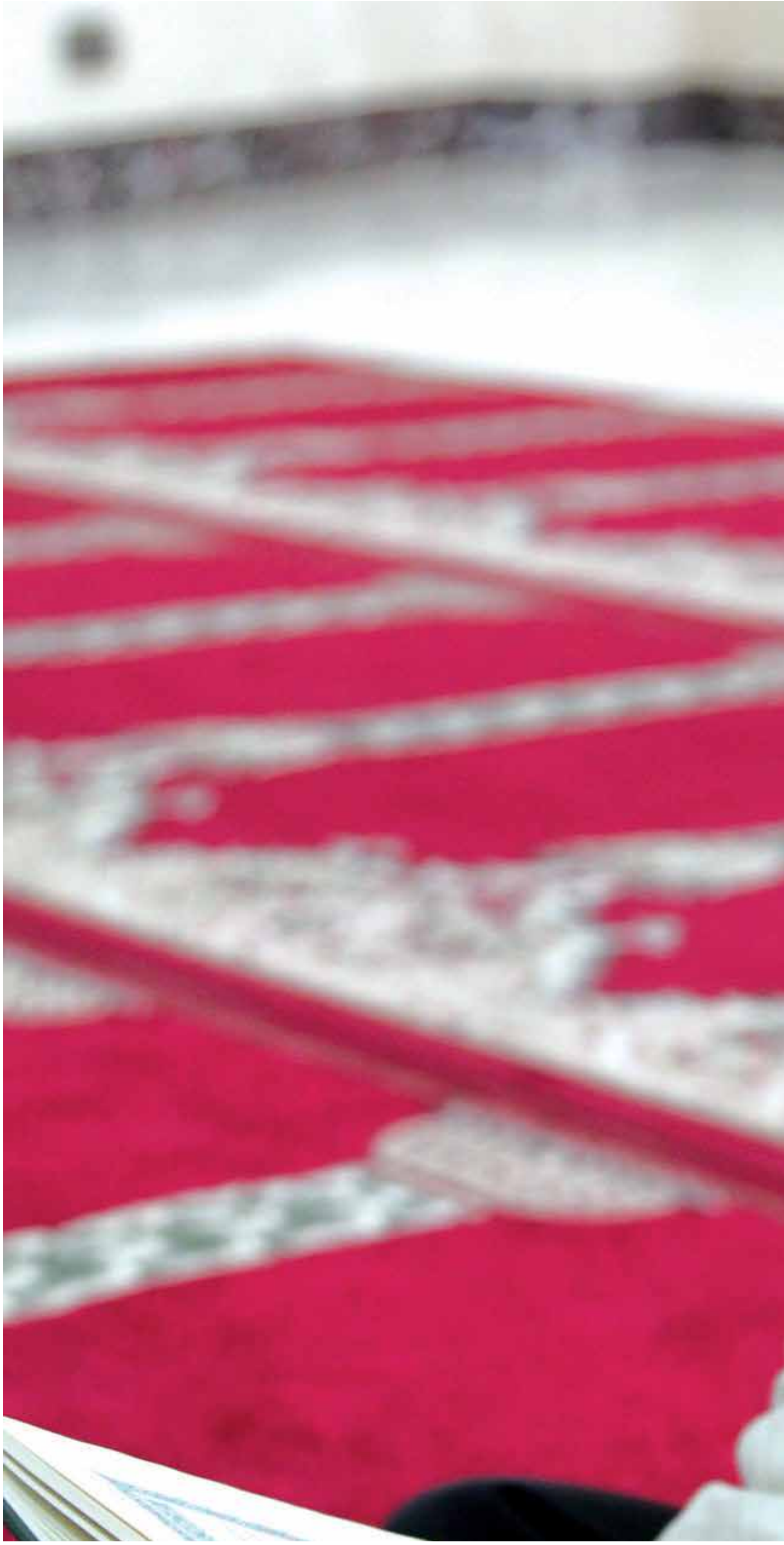
১ - এ রাত বেশি ঠাণ্ডাও হয় না, বেশি গরমও হয় না, বরং তা হয় উজ্জ্বল

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমাকে লায়লাতুল কদর দেখানো হয়েছিল, তবে পরবর্তীতে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। এ রাত হলো রমজানের শেষ দশদিনের রাতগুলোয়। এ রাত হলো মুক্ত ও উজ্জ্বল, যা ঠাণ্ডাও না গরমও না।'(বর্ণনায় তিরমিযী)

২- লায়লাতুল কদর শেষে সকালের সূর্য আলোকরশ্মি ব্যতীত সাদা হয়ে উদিত হয়।

উবায় ইবনে কা'ব রাযি. কে যখন লায়লাতুল কদরের আলামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় তখন তিনি বলেছেন,'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে নিদর্শনের কথা বলেছেন, তার দ্বারা আমরা লায়লাতুল কদর চিনতে পারি, অর্থাৎ ওইদিন সূর্যোদয় হয় রশ্মিবিহীন আকারে।' (বর্ণনায় ইবনে খুযায়মাহ)

সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, 'আলোকরশ্মিবিহীন সাদা আকারে।' (বর্ণনায় তিরমিযী)





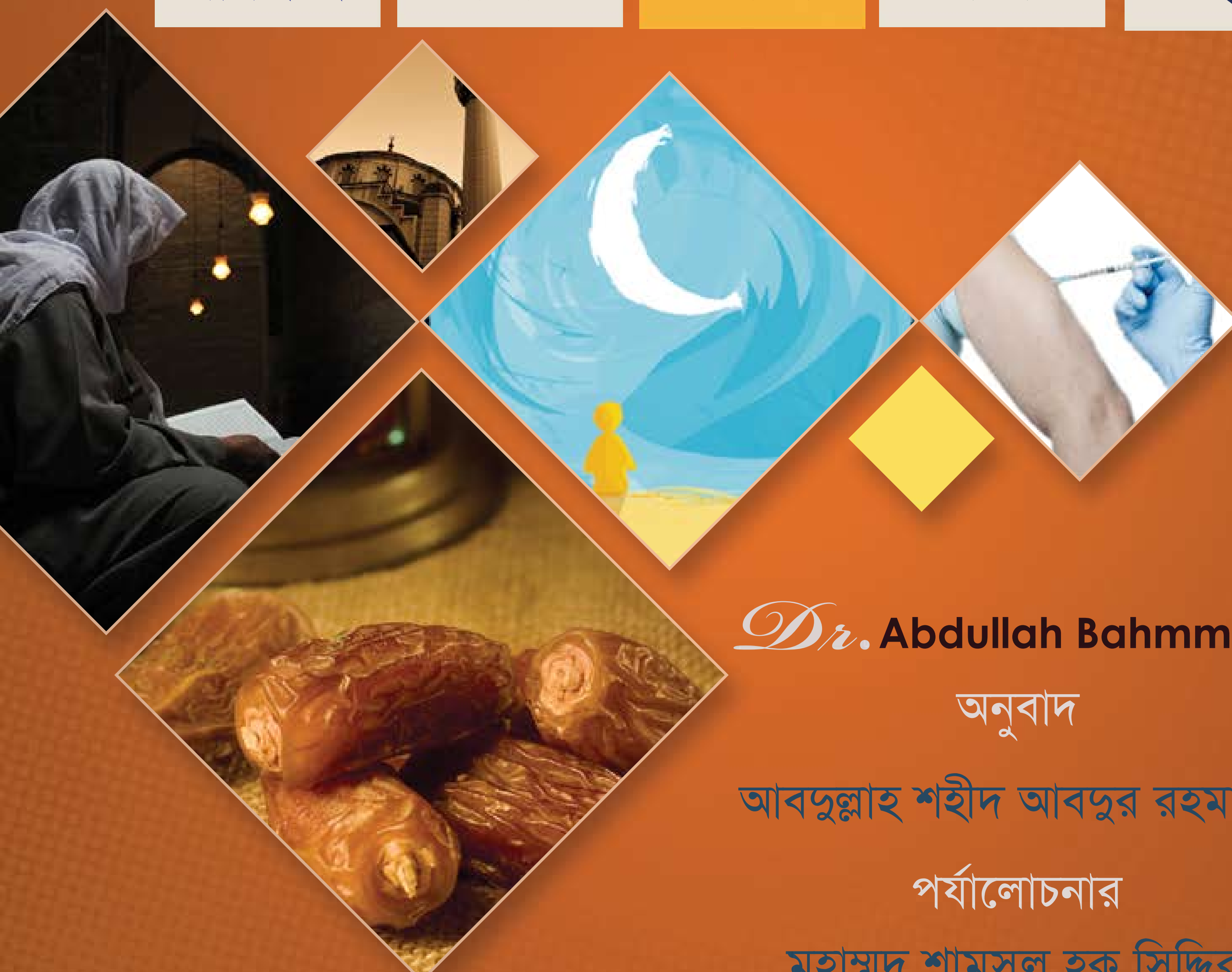
https://www.al-feqh.com/bn/category/রোজা



আলোকচিত্রে ইবাদত

সহজ সরল উপয়ে ইসলামের বিধি-বিধান শেখা

পবিত্রতা	নামাজ	রোজা	যাকাত	হজ্ব



Dr. Abdullah Bahmmam

অনুবাদ

আবদুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান

পর্যালোচনার

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

ইতিকাফের ফজিলত ও বিধান

৬ ইতিকাফ

সূচীপত্র

আভিধানিক অর্থে ইতিকাফ

কোনোকিছুতে এঁটে থাকা ও তার মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ করে ফেলা।

শরয়ী পরিভাষায় ইতিকাফ

আল্লাহ তাআলার ইবাদতের উদ্দেশে মসজিদে নিজেকে আবদ্ধ করে ফেলা

ইতিকাফের শরীয়তভুক্ত হওয়া

ইতিকাফ উত্তম ও ফজিলতপূর্ণ ইবাদতের মধ্যে একটি। আয়শা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমজানের শেষ দশকে আমরণ ইতিকাফ করে গেছেন।'(বর্ণনায় বুখারী)

ইতিকাফ আমাদের জন্য ও আমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য আল্লাহ তাআলা বিধানভুক্ত করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

﴿وَعَهِدْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَٰعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْعَٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ١٢٥﴾

{এবং (আদেশ দিলাম যে,) 'তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর।' আর আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম যে, 'তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, 'ইতিকাফকারী ও রুকূকারী-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র কর।} [সূরা আল বাকারা:১২৫]

ইতিকাফের হুকুম

ইতিকাফ সারা বছরই সুন্নত তবে রমজানের শেষ দশকে ইতিকাফ করাই উত্তম। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমজানের শেষ দশদিন সবসময় ইতিকাফ করে গেছেন।

ইতিকাফের শর্তসমূহ

১- নিয়ত

ইতিকাফকারী আল্লাহর ইবাদত ও সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশে মসজিদে অবস্থানের নিয়ত করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'নিশ্চয় নিয়তের ওপর আমলের নির্ভরতা।'(বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

২- যে মসজিদে ইতিকাফ করা হবে তা জামে মসজিদ হতে হবে

জামে মসজিদ অর্থ এমন মসজিদ যাতে জুমার নামাজ পড়া হয় এবং যাতে যেকোনো এলাকার মুসাল্লীদের নামাজ আদায়ের অধিকার উন্মুক্ত থাকে।



জামে মসজিদ

৩ - বড় অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জন

অতএব জুনুবী ব্যক্তি এবং হায়েয ও নিফাসগ্রস্ত নারীর ক্ষেত্রে ইতিকাফ করা শুদ্ধ হবে না; কেননা এদের মসজিদে অবস্থান করা বৈধ নয়।

ইতিকাফের জন্য রোজা শর্ত নয়

ইতিকাফের জন্য রোজা শর্ত নয়; ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর রাযি. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করে বললেন, 'আমি জাহিলীযুগে মানত করেছিলাম যে একরাত মসজিদুল হারামে ইতিকাফ করব। উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তুমি তোমার মানত পুরা করো।' সে হিসেবে যদি রোজা রাখা শর্ত হতো তাহলে রাতের বেলায় ইতিকাফ শুদ্ধ হত না। কেননা রাতের ইতিকাফে কোনো রোজা নেই। এ ক্ষেত্রে আরেকটি দলিল এই যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাওয়ালের প্রথম দশদিন ইতিকাফ করেছেন বলে এক বর্ণনায় এসেছে। আর এটা সবার জানা যে, শাওয়ালের প্রথম দশদিনের মধ্যে ঈদের দিন রয়েছে, যাতে রোজা রাখা বৈধ নয়। আরেকটি বিষয় এই যে, রোজা ও ইতিকাফ দুটি ভিন্ন ইবাদত। কাজেই একটির জন্য অন্যটি শর্ত হবে না।



ইতিকাফের সময়

যেকোনো দিন ইতিকাফ করা শুদ্ধ। যেকোনো সময়সীমার জন্যও ইতিকাফ করা শুদ্ধ। তবে উত্তম হলো একদিন একরাতের কম না হওয়া; কেননা একদিন একরাতের কম ইতিকাফ করা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম কারও থেকেই প্রমাণিত নেই।

রমজানের শেষ দশদিন ইতিকাফ করা

এ দশদিন হলো ইতিকাফ করার সর্বোত্তম সময়; আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমজানের শেষ দশদিন ইতিকাফ করতেন। আমরণ তিনি তা করে গেছেন।

যে ব্যক্তি রমজানের শেষ দশদিনে ইতিকাফের নিয়ত করবে সে রমজানের একুশ তারিখে, যে মসজিদে ইতিকাফ করতে চায়, সে মসজিদে ফজরের নামাজ পড়বে। এরপর ইতিকাফের জায়গায় প্রবেশ করবে। আয়শা রাযি. 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি রমজানেই ইতিকাফ করতেন। তিনি যখন ফজরের নামাজ আদায় করতেন তখন ইতিকাফের স্থলে প্রবেশ করতেন।' [বর্ণনায় বুখারী]

রমজানের শেষ দিনের সূর্যাস্ত যাওয়ার সাথে সাথে ইতিকাফ শেষ হয়ে যায়, তবে উত্তম হলো ঈদের দিন সকালে ইতিকাফ থেকে বের হওয়া। সালাফদের অনেকেই এরূপ করেছেন।



ইতিকাফকারীর জন্য যা বৈধ

১ - একান্ত প্রয়োজনে মসজিদ থেকে বের হওয়া, যেমন খাওয়া ও পান করার প্রয়োজনে মসজিদ থেকে বের হওয়া যদি তা মসজিদে হাজির করার জন্য কেউ না থাকে। পেশাব পায়খানার প্রয়োজনেও মসজিদ থেকে বের হওয়া যাবে। আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইতিকাফ করতেন, তিনি তাঁর মাথা আমার দিকে হেলিয়ে দিতেন, অতঃপর আমি তা আঁচড়িয়ে দিতাম। আর তিনি মানবিক প্রয়োজন ব্যতীত বাড়িতে প্রবেশ করতেন না।'(বর্ণনায় মুসলিম)

২ - চুল ভাঁজ করা ও আঁচড়ানো বৈধ; উল্লেখিত হাদীস এর প্রমাণ ।

৩ - মানুষের সাথে উপকারী কথাবার্তা বলা। তারা কেমন আছে না আছে ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করা। কিন্তু অতিমাত্রায় এসব কথাবার্তা বলা উচিত হবে না। কেননা তা ইতিকাফের উদ্দেশের সাথে সাংঘর্ষিক।

৪ - আত্মীয়স্বজন ইতিকাফকারীর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আসতে পারবে। এমনকি তাদেরকে বিদায় দেয়ার জন্য ইতিকাফের জায়গা থেকে বের হওয়াও বৈধ রয়েছে। সাফিইয়া বিনতে হুআই রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইতিকাফরত অবস্থায় আমি তাঁর সাথে রাতের বেলায় সাক্ষাৎ করতে এলাম। আমি তার সাথে কথা বললাম। এরপর যখন চলে যাওয়ার উদ্দেশে দাঁড়ালাম তিনি আমাকে বিদায় দেয়ার জন্য দাঁড়ালেন।'(বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

ইতিকাফ বাতিলকারী-বিষয়সমূহ

১ - প্রয়োজন ব্যতীত ইচ্ছাকৃতভাবে মসজিদ থেকে বের হওয়া, যদিও তা অল্প সময়ের জন্য হয়; আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানবিক প্রয়োজন ব্যতীত মসজিদ থেকে বের হতেন না।'

(বর্ণনায় মুসলিম) উপরন্তু মসজিদ থেকে বের হওয়ার অর্থ ইতিকাফস্থলে অবস্থান করার যে নীতি রয়েছে তা ভঙ্গ হওয়া। আর ইতিকাফস্থলে অবস্থান করা ইতিকাফের একটি রুকন।

২ - স্বামী-স্ত্রীর মিলন, যদিও তা রাতের বেলা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿ وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمۡ عَٰكِفُونَ فِي ٱلۡمَسَٰجِدِۗ ﴾

{আর তোমরা মাসজিদে ইতিকাফরত অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে মিলিত হয়ো না।}

[সূরা আল বাকারা:১৮৭]

স্বামী-স্ত্রীর মিলনের সাথে যুক্ত হবে উত্তেজনাসহ যেকোনো উপায়ে বীর্যপাত ঘটানো, যেমন হস্তমৈথুন অথবা স্ত্রীর অন্যকোনো শরীরাংশে ঘর্ষণের মাধ্যমে বীর্যপাত|

৩ - ইতিকাফ ভঙ্গ করার দৃঢ় ইচ্ছা ব্যক্ত করা।

যদি কোনো মুসলিম সুনির্দিষ্ট দিনের ইতিকাফের নিয়ত করে, এরপর ইতিকাফ ভঙ্গ করে ফেলে তবে তার জন্য ইতিকাফ কাযা করা বৈধ হবে। আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইতিকাফের নিয়ত করতেন, তিনি ফজরের নামাজ পড়তেন, অতঃপর তিনি ইতিকাফস্থলে প্রবেশ করতেন। (একবার) তিনি তাঁর তাঁবু টানানোর নির্দেশ দিলেন, অতঃপর তাঁবু টানানো হলো - অর্থাৎ যখন তিনি রমজানের শেষ দশদিনের ইতিকাফ করার ইচ্ছা করলেন তখন- যয়নাব রাযি. তাঁর তাঁবু টানানোর নির্দেশ দিলেন, অতঃপর টানানো হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্যান্য স্ত্রীগণও তাঁবু টানানোর নির্দেশ দিলেন, অতঃপর টানানো হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ফজরের নামাজ পড়লেন, তিনি বহু তাঁবু দেখতে পেলেন। তিনি বললেন,'তোমরা কি ভালো চাও? এরপর তিনি তাঁর তাঁবু গুটিয়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন, অতঃপর তা গুটিয়ে ফেলা হলো। তিনি রমজানে ইতিকাফ করা ছেড়ে দিলেন এবং শাওয়ালের প্রথম দশদিন ইতিকাফ করলেন।' অন্য এক বর্ণনা অনুযায়ী 'শাওয়ালের শেষ দশদিন ইতিকাফ করলেন।'(বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)ইতিকাফকারী ব্যক্তি রোগী দেখতে যাবে না। জানাযায়ও শরীক হবে না, বরং সে আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশে ইতিকাফস্থলে অবস্থান করবে।



আলোকচিত্রে ইবাদত

সহজ সরল উপয়ে ইসলামের বিধি-বিধান শেখা

পবিত্রতা | নামাজ | রোজা | যাকাত | হজ্ব



Dr. Abdullah Bah mmam

অনুবাদ

আবদুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান

পর্যালোচনার

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

যাকাতের হুকুম ও শর্ত

১ যাকাতের হুকুম ও শর্ত

আভিধানিক অর্থে যাকাত

বৃদ্ধি পাওয়া, বর্ধিত হওয়া

শরয়ী পরিভাষায় যাকাত

নির্দিষ্ট পরিমান সম্পদ যা সুনির্দিষ্ট সময় বিশেষ মানবগোষ্ঠিকে প্রদান করা হয়।

যাকাতের অবস্থান

যাকাত ইসলামের ফরজকর্মসমূহের একটি এবং ইসলামের তৃতীয় রুকন। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ﴾ [النور:65]

{তোমরা নামাজ প্রতিষ্ঠা করো ও যাকাত প্রদান করো।} [সূরা আন-নূর:৫৬]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,'ইসলাম পাঁচটি বিষয়ের ওপর নির্মিত: এ সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। নামাজ প্রতিষ্ঠা করা। যাকাত প্রদান করা। বায়তুল্লাহর হজ্ব করা ও রমজানের রোজা রাখা।'(বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

যাকাত অনাদায়কারীর হুকুম

যাকাত অনাদায়কারী হয়তো অস্বীকৃতিবশত অথবা কৃপণতা হেতু যাকাত প্রদান করে না।

১ - অস্বীকৃতিবশত যাকাত অনাদায়কারী

যে ব্যক্তি জেনেশুনে যাকাত অস্বীকার করল সে সর্বসম্মতিক্রমে কুফরি করল; কেননা সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ অমান্য করল।

যাকাত আদায়ে অীকৃতিজ্ঞাপনকারীদের উদ্দেশে আবু বকর সিদ্দীক রাযি. বলেছিলেন,'আল্লাহর কসম, যারা নামাজ ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করল তাদের বিরুদ্ধে আমি অবশ্যই লড়াই করব। কারণ যাকাত হলো সম্পদের ওপর আরোপিত অধিকার। আল্লাহর কসম, তারা যদি আমাকে একটি রশি অর্পণ করতেও অস্বীকার করে, যা তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অর্পণ করত, তবে আমি এর জন্য তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই লড়াই করব।'(বর্ণনায় বুখারী)

সূচীপত্র

২ - কৃপণতাবশত যাকাত অনাদায়কারী

যে ব্যক্তি কৃপণতাবশত যাকাত প্রদান করল না, তার কাছ থেকে শক্তিপ্রয়োগ করে হলেও যাকাত আদায় করা হবে। তবে এ আচরণের কারণে তাকে কাফের বলা হবে না। যদিও সে স্বেচ্ছায় যাকাত আদায় না করে একটি বড় অন্যায় ও পাপকর্ম করে ফেলেছে। এর প্রমাণ, যাকাত অনাদায়কারীর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী,,'সোনা-রুপার মালিক যদি এ সবের হক আদায় না করে, তবে তা দিয়ে কিয়ামতের দিন আগুনের পাত তৈরি করা হবে, অতঃপর তা আগুনে গরম করা হবে এবং তা দিয়ে তার পার্শ্বদেশে, কপালে ও পিঠে ছেঁকা দেয়া হবে। পাত ঠান্ডা হয়ে গেলে আবারও তা গরম করে আনা হবে। আর এটা হবে এমন এক দিনে, যা হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের পরিমাণ দীর্ঘ। বান্দাদের মাঝে শেষ ফয়সালা হওয়া পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া চলমান থাকবে। ফয়সালা শেষ হলে তাদের একদলকে জন্নাতের ও অপর দলকে জাহান্নামের পথ দেখিয়ে দেয়া হবে।'(বর্ণনায় মুসলিম)

আর যদি মানুষেরা যাকাত না দেয়ার উদ্দেশ্যে লড়াইয়ে লিপ্ত হয় তবে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যেতে হবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশ মানতে সম্মত হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ﴾ [التوبة:5]

{তবে যদি তারা তাওবা করে এবং সালাত কায়েম করে, আর যাকাত দেয়, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।} [সূরা আত-তাওবা:৫]

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমাকে মানুষের বিরুদ্ধে লড়াই করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। যদি তারা এরূপ করে তবে আমার পক্ষ থেকে তাদের জান-মালের নিরাপত্তা রয়েছে, তবে ইসলামের হক ব্যতীত। আর তাদের হিসাব আল্লাহর কাছে।'(বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

যাকাত ফরজ করার হিকমত

১- কৃপণতা, পাপ ও অন্যায় থেকে মানব-অন্তর পবিত্র করা। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ [التوبة:301].

{তাদের সম্পদ থেকে সদকা নাও। এর মাধ্যমে তাদেরকে তুমি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে।}[সূরা আত-তাওবা:১০৩]

২- সম্পদ পবিত্র ও বৃদ্ধি করা এবং তাতে বরকত আকৃষ্ট করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'সদকা কোনো সম্পদকে কমিয়ে দেয়নি।'(বর্ণনায় মুসলিম)

৩- আল্লাহ তাআলার নির্দেশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মানুষ আনুগত্য প্রকাশ করে কি না, আল্লাহর ভালোবাসাকে সম্পদের ভালোবাসার ওপর প্রাধান্য দেয় কি না, এ ব্যাপারে পরীক্ষা করে দেখা।

৪- দরিদ্রদের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন ও অভাবীদের প্রয়োজন পূরণ করা। এর মাধ্যমে মুসলমানদের পরস্পরের মাঝে মহব্বত বৃদ্ধি পায় এবং মুসলিম সমাজের সদস্যদের মাঝে সর্বোচ্চ পর্যায়ের সামাজিক সহযোগিতা কায়েম হয়।

৫- আল্লাহর পথে দান-খয়রাত ও সম্পদ ব্যয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা।

যাকাতের ফজিলত

১- যাকাত আল্লাহর রহমত লাভের কারণ। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَرَحۡمَتِي وَسِعَتۡ كُلَّ شَيۡءٖۚ فَسَأَكۡتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ﴾ [الأعراف:651]

{আর আমার রহমত সব বস্তুকে পরিব্যাপ্ত করেছে। সুতরাং আমি তা লিখে দেব তাদের জন্য যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যাকাত প্রদান করে।} [সূরা আল আরাফ:১৫৬]



২- যাকাত প্রদান আল্লাহর সাহায্য লাভের শর্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ﴾ [الحج: 40-41]

{আর আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন, যে তাকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। তারা এমন যাদেরকে আমি জমিনে ক্ষমতা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে...।} [সূরা আল হাজ্জ: ৪০-৪১]

৩- যাকাত প্রদান গুনাহ মাফ হওয়ার কারণ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'সদকা গুনাহকে নিভিয়ে দেয় যেভাবে পানি আগুন নেভায়।'(বর্ণনায় বুখারী)

যাকাত ফরজ হওয়ার শর্তাবলী

১ - ইসলাম

অতএব অমুসলিমের পক্ষ থেকে যাকাত প্রদান শুদ্ধ হবে না; কেননা আল্লাহ তাআলা অমুসলিমদের আমল কবুল করেন না।

২- স্বাধীনতা

অতএব দাসের ওপর যাকাত ফরজ হবে না; কেননা দাসের সম্পদের মালিক তার মনিব।

৩- নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া

নিসাব হলো

সুনির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ যা অর্জিত হলে যাকাত ফরজ হয়।

যেসব সম্পদে যাকাত ফরজ



জমিন থেকে উৎপন্ন দ্রব্য | সোনা ও রুপা | ব্যবসায়িক সম্পদ | গবাদিপশু

নিসাবের শর্তাবলী

ক. নিসাব পরিমাণ সম্পদ ব্যক্তির অবশ্য প্রয়োজনীয় সম্পদের বাইরে হতে হবে, যেমন খাদ্য, পরিধেয় পোশাক, থাকার ঘর ইত্যাদি; কেননা যাকাত ফরজ হয় গরীবদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশের উদ্দেশে। তাই সম্পদের মালিককে অবশ্যই অমুখাপেক্ষী হতে হবে।

খ. নিসাব পরিমাণ সম্পদ ব্যক্তিমালিকানাধীন হতে হবে, অতএব এমন সম্পদে যাকাত ফরজ হবে না যা সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির মালিকানাধীন নয়, যেমন মসজিদের জন্য জমাকৃত টাকা অথবা জনস্বার্থে ব্যয়ের জন্য বরাদ্দকৃত টাকা অথবা যে সম্পদ সেবামূলক সংস্থার ফান্ডে জমা রয়েছে।

৪. সম্পদের উপর এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া।

এক বছর অর্থ

হিজরী বর্ষের পূর্ণ এক বছর

অর্থাৎ নিসাব পরিমাণ সম্পদ ব্যক্তির মালিকানায় চান্দ্রমাস হিসাবে বারো মাস অতিক্রান্ত হতে হবে। অবশ্য এ শর্ত সোনা-রুপা, ব্যবসায়িক সম্পদ, গবাদিপশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে ফসল, ফলফলাদি, খনিজদ্রব্য ও গুপ্তধনের ক্ষেত্রে এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া শর্ত নয়।

যাকাত আদায়

যাকাত আদায় করার সময়

যাকাত প্রদানে সক্ষম ব্যক্তির যাকাত ফরজ হওয়ার সাথে সাথে তা আদায় করে দেয়া ফরজ। বিশেষ কোনো সমস্যা ব্যতীত যাকাত ফরজ হওয়ার মুহূর্ত থেকে আদায়প্রক্রিয়া বিলম্বিত করা বৈধ নয়, যেমন সম্পদ বিদেশে থাকা অথবা আটককৃত অবস্থায় থাকা।

এর দলিল আল্লাহ তাআলার বাণী :

﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ﴾ [الأنعام: 141]

{এবং ফল কাটার দিনেই তার হক দিয়ে দাও।} [সূরা আল আনআম: ১৪১]

﴿وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ﴾ [النور: 65]

{আর তোমরা যাকাত আদায় করো} [সূরা আন-নূর:৫৬]

এখানে আল্লাহ তাআলা অনুজ্ঞাসূচক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন, যার দাবি হলো অনতিবিলম্বে বাস্তবায়ন করা।

সময় আসার পূর্বেই যাকাত আদায় প্রসঙ্গ

মুসলমানদের বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিলে সময় আসার পূর্বেই যাকাত আদায় করে দেয়া বৈধ রয়েছে। ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন উমর রাযি. কে যাকাত সংগ্রহের জন্য পাঠান, তিনি ফিরে এসে আব্বাস রযি. এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন, 'আব্বাস আমাকে তার যাকাত প্রদান করেনি'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,'হে উমর, আব্বাসের কাছ থেকে আমরা দু বছরের যাকাত অগ্রীম নিয়ে নিয়েছি।'(বর্ণনায় দারাকুতনী)

যাকাত বন্টনের জায়গা

উত্তম হলো যে দেশে সম্পদ সে দেশবাসীর মধ্যেই যাকাত বণ্টন করে দেয়া, তবে প্রয়োজন দেখা দিলে কাছের অথবা দূরের যেকোনো দেশে যাকাতের টাকা পাঠিয়ে দেয়া চলে। উদাহরণস্বরূপ দূরবর্তী দেশ অধিক দরিদ্র অথবা দূরবর্তী দেশে যাকাত প্রদানকারীর আত্মীয়-স্বজন রয়েছে, যারা যাকাত প্রদানকারীর দেশের দরিদ্রদের মতোই দরিদ্র, এমতাবস্থায় আত্মীয়-স্বজনকে প্রদান করাটা অধিক উপকারী বলে বিবেচিত হবে; কেননা এক্ষেত্রে একদিকে আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষা হবে, অন্যদিকে যাকাতও আদায় হয়ে যাবে।

যাকাত পাওয়ার বেশি হকদার কে?

যাকাত পাওয়ার বেশি হকদার ও অধিক প্রয়োজনগ্রস্ত কে, তা অনুসন্ধান করে বের করতে যাকাত প্রদানকারীকে শ্রম দিতে হবে। যাকাত পাওয়ার হকদারির গুণ যার মধ্যে বেশি পাওয়া যাবে তাকে যাকাত প্রদান করা অধিক উত্তম হবে, যেমন নিকটবর্তী গরীব অথবা তালেবে ইলম ইত্যাদি।

আলোকচিত্রে ইবাদত

সহজ সরল উপয়ে ইসলামের বিধি-বিধান শেখা

পবিত্রতা | নামাজ | রোজা | যাকাত | হজ্ব



Dr. Abdullah Bah mmam

অনুবাদ

আবদুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান

পর্যালোচনার

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

খাদ্যশস্য ও ভূমি থেকে উৎপন্ন বস্তুর যাকাত

২ ভূমি থেকে উৎপন্ন বস্তুর যাকাত

ভূমি থেকে উৎপন্ন বস্তু

যা ভূমি থেকে উৎপন্ন হয় এবং উপকারে আসে।

প্রথমত: শস্য ও ফলফলাদি

খাদ্যশস্য

ভবিষ্যতের জন্য রেখে দেয়া যায় এমনসব খাদ্যশস্য, যেমন যব, গম, ধান ইত্যাদি।

ফল

ভবিষ্যতের জন্য রেখে দেয়া যায় এমনসব ফল, যেমন খেজুর, কিশমিশ ও কাঠবাদাম

সূচীপত্র



খাদ্যশস্য ও ফলের যাকাত প্রদানের হুকুম

খাদ্যশস্য ও ফলের যাকাত প্রদান করা ফরজ। আল্লাহ তাআলা বলেন:

(এবং ফল কাটার দিনই তার হক আদায় করে দাও) [সূরা আলআনআম: ১৪১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: 'যা আকাশ অথবা ঝর্নার পানি দ্বারা উৎপন্ন অথবা যা সেচ ব্যতীতই উৎপন্ন তাতে ১০% এবং যা নিজেদের শ্রম ব্যয় করে সেচ দেয়া হয়েছে তাতে ৫% যাকাত দিতে হবে।'(বর্ণনায় বুখারী)

খাদ্যশস্য ও ফলে যাকাত ফরজ হওয়ার শর্তাবলী

১ - তা ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষিত হতে হবে। সে হিসেবে যদি ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষিত না হয় অথবা নিত্যদিনের খাবারে ব্যবহৃত হয়, তাহলে তাতে যাকাত ফরজ হবে না। কেননা যা ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করা যায় না, তা সম্পদ হওয়ার বৈশিষ্ট্যে পুরোপুরি উত্তীর্ণ হয় না।

২ - পরিমাপ-পাত্র দিয়ে মাপার উপযোগী হতে হবে। অর্থাৎ এমন হতে হবে যা মেপে ওসকের হিসাব বের করা যায়; কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'খাদ্যশস্য অথবা খেজুরে পাঁচ ওসকের নিচে যাকাত নেই।'(বর্ণনায় মুসলিম)আর যদি পরিমাপ-পাত্র দিয়ে মাপা না যায়, যেমন শাকসবজি, শিম, মটরশুঁটি ইত্যাদি তবে এগুলোতে যাকাত ফরজ হবে না।

৩ - বস্তুটি এমন হতে হবে যা মানুষ উৎপন্ন করে। সে হিসেবে যা নিজে নিজে উৎপন্ন হয় তাতে যাকাত নেই।

৪ - নিসাব পরিমাণ হওয়া:

এ ক্ষেত্রে নিসাব হলো পাঁচ ওসক। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

'খাদ্যশস্য অথবা খেজুরে পাঁচ ওসকের নিচে যাকাত নেই।'(বর্ণনায় মুসলিম) 'খাদ্যশস্য অথবা খেজুরে পাঁচ ওসকের নিচে যাকাত নেই।'।

শর্ত নয়

খাদ্যশস্য ও ফলের যাকাতে এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া শর্ত নয়। এর প্রমাণ আল্লাহ তাআলার বাণী:

﴿وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ﴾ [الأنعام:141]

{এবং তোমরা ফল কাটার দিনই তার হক আদায় করে দাও} [সূরা আল আনআম: ১৪১]

খাদ্যশস্য ও ফলের যাকাত ফরজ হওয়ার সময়

খাদ্যশস্য যখন শক্ত হয়ে ব্যবহারোপযোগী হয় আর ফল যখন পরিপক্ক হয়ে খাওয়ার উপযোগী হয় তখন তাতে যাকাত ফরজ হয়ে যায়। অতএব যদি কেউ যাকাত ফরজ হওয়ার পর খাদ্যশস্য বা ফল বিক্রি করে দেয়, তবুও তার কাঁধে যাকাত দেয়ার দায়িত্ব বহাল থেকে যাবে; কেননা যাকাত ফরজ হওয়ার সময় সে তার মালিক ছিল।

খাদ্যশস্য ও ফলে ফরজ হওয়া যাকাতের পরিমাণ

১ - বিনা পরিশ্রমে বৃষ্টি অথবা ঝর্নার পানির প্রাকৃতিক সেচে উৎপন্ন ফসলে যাকাতের পরিমাণ হলো উশর তথা (১০%)।

২ - শ্রমনির্ভর সেচ, যেমন কূপ ইত্যাদি থেকে পানি এনে সেচ দেয়া সাপেক্ষে যে ফসল উৎপন্ন হয় তাতে যাকাতের পরিমাণ হলো (৫%)।

৩ - আর উভয় ধরনের সেচ অর্থাৎ কখনো প্রাকৃতিক ও কখনো শ্রমনির্ভর সেচের মাধ্যমে উৎপন্ন ফসলে যাকাতের পরিমাণ হলো (৭.৫%)।

এর দলিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস, 'যা আকাশ, নদী ও ঝর্না দ্বারা সেচকৃত তাতে উশর(১০%) এবং যা কূপ থেকে সেচ দেয়া হলো তাতে অর্ধ-উশর(৫%)।'(বর্ণনায় মুসলিম)

খাদ্যশস্য ও ফল ধ্বংস হয়ে যাওয়া

যদি খাদ্যশস্য ও ফল ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোনো কারসাজি বা হস্তক্ষেপ ব্যতীত ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে যাকাত রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি যাকাত ফরজ হওয়ার পর ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোনো কারসাজি বা হস্তক্ষেপের ফলে ধ্বংস হয় তবে যাকাত রহিত হবে না। বরং তা বলবৎ থাকবে।

মাসায়েল

১ - মধুর যাকাত নেই; কেননা এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কোনো নির্দেশ আসেনি। তবে যদি কেউ স্বেচ্ছায় যাকাত প্রদান করে তবে তা উত্তম হবে এবং তা মৌমাছি ও মধু বেড়ে যাওয়ার কারণ হবে। কিন্তু তা বাধ্যতামূলক নয়, যা পরিত্যাগ করলে কেউ গুনাহগার হবে।

২ - যে ব্যক্তি অন্যকারও ভূমি ভাড়া নিল এবং তাতে ফল উৎপন্ন করল, এমতাবস্থায় ভাড়াটে ব্যক্তির ওপর যাকাত ফরজ হবে, মূল মালিকের ওপর নয়।

৩ - যাকাত হিসেবে সরাসরি দ্রব্য না নিয়ে তার মূল্য নেওয়াও বৈধ রয়েছে। বরং প্রয়োজন ও জনস্বার্থের বিবেচনায় তাই হবে শরীয়তসিদ্ধ।



খনিজদ্রব্য ও গুপ্তধন

খনিজদ্রব্য

ভূমিজাত নয়, এমন যে দ্রব্যসমূহ ভূমি থেকে বের করা হয়, যেমন সোনা- রুপা, লোহা, সীসা এবং এ ধরনের অন্যান্য কাচামাল।

গুপ্তধন

অর্থাৎ মানুষ কর্তৃক ভূমিতে গচ্ছিত কোনো দ্রব্য, যেমন সোনা-রুপা ইত্যাদি।

খনিজদ্রব্য ও গুপ্তধনের যাকাতের হুকুম

এ সবের যাকাত দেয়া ফরজ। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ ٢٦٧﴾ [البقرة:762]

{হে মুমিনগণ, তোমরা ব্যয় কর উত্তম বস্তু, তোমরা যা অর্জন করেছ এবং আমি জমিন থেকে তোমাদের জন্য যা উৎপন্ন করেছি তা থেকে} [সূরা আল বাকারা:২৬৭]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'গুপ্তধনে খুমুস (২০%) প্রদেয়।

গুপ্তধনের যাকাতের শর্তাবলী

গুপ্তধনের যাকাতের কোনো শর্ত নেই। যদি কোনো ব্যক্তি তার মালিক হয়ে থাকে তবে সরাসরি সে তার যাকাত প্রদান করবে।

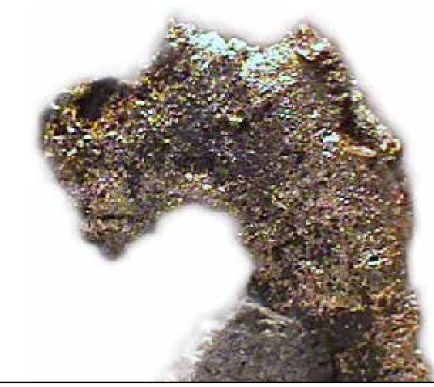
খনিজদ্রব্য ও গুপ্তধনের যাকাতের পরিমাণ

এ জাতীয় দ্রব্য অল্প হোক বেশি হোক তাতে খুমুস তথা ২০% যাকাত প্রদেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী 'গুপ্তধনে একপঞ্চমাংশ প্রদেয়' এর প্রতিই নির্দেশ করে।

সোনা



অশোধিত রুপা



অশোধিত সীসা



অশোধিত লোহা



আলোকচিত্রে ইবাদত

সহজ সরল উপয়ে ইসলামের বিধি-বিধান শেখা

পবিত্রতা | নামাজ | রোজা | যাকাত | হজ্ব



Dr. Abdullah Bahmmam

অনুবাদ

আবদুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান

পর্যালোচনার

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

সোনা-রুপার যাকাত



সোনা-রুপার যাকাত

সূচীপত্র

সোনা-রুপা

সোনা-রুপা এবং যা কিছু এর স্থলাভিষিক্ত, যেমন বর্তমানযুগে প্রচলিত কাগুজে টাকা।

সোনা-রুপার যাকাতের হুকুম

সোনা-রুপার যাকাত দেয়া ফরজ; ইরশাদ হয়েছে:

﴿وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ٣٤﴾ [التوبة:43]

{এবং যারা সোনা ও রূপা পুঞ্জীভূত করে রাখে, আর তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, তুমি তাদের বেদনাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও।} [সূরা তাওবা:৩৪]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 'সোনা-রুপার মালিক যদি এ সবের হক আদায় না করে, তবে তা দিয়ে কিয়ামতের দিন আগুনের পাত তৈরি করা হবে, অতঃপর তা আগুনে গরম করা হবে এবং তা দিয়ে তার পার্শ্বদেশে, কপালে ও পিঠে ছেঁকা দেয়া হবে। পাত ঠান্ডা হয়ে গেলে আবারও তা গরম করে আনা হবে। আর এটা হবে এমন এক দিনে, যা হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের পরিমাণ দীর্ঘ। বান্দাদের মাঝে শেষ ফয়সালা হওয়া পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া চলমান থাকবে। ফয়সালা শেষ হলে তাদের একদলকে জান্নাতের ও অপর দলকে জাহান্নামের পথ দেখিয়ে দেয়া হবে।' (বর্ণনায় মুসলিম)

সোনা-রুপার ওপর যাকাত ফরজ হওয়ার শর্তাবলী

১ -এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া

২ - পূর্ণ মালিকানা

৩ - নিসাব পূর্তি



অর্থকড়ি



রুপা



সোনা

সোনা-রুপার নিসাব

১ - সোনার নিসাব বিশ দিনার তথা (৮৫) গ্রাম। একদিনার পরিমাণ = ৪.২৫ গ্রাম। অতএব যাকাতের নিসাব হবে: ৪.২৫*২০=৮৫ গ্রাম নিরেট সোনা।

রুপার নিসাব হলো দু'শ দিরহাম অর্থাৎ (৫৯৫) গ্রাম। রুপার এক দিরহামের পরিমাণ হলো ২.৯৭৫ গ্রাম, তাই রুপার নিসাব হবে ২.৯৭৫*২০০= ৫৯৫ গ্রাম নিরেট রুপা।

৩ -টাকাকড়ির যাকাত আদায়ের মুহুর্তে, সোনা অথবা রুপার মূল্যের ভিত্তিতে নির্ণয় করতে হবে। যদি টাকাকড়ি এ দুটির যেকোনো একটির নিসাবের সমান হয় তাহলে যাকাত ফরজ হবে।

উদাহরণত: যদি এক গ্রাম সোনার মূল্য ৩০ ডলার হয়, এবং কোনো ব্যক্তির কাছে অবশ্য প্রয়োজনীয় খরচের বাইরে (৮৫*৩০=২৫৫০) দু হাজার পাঁচশ পঞ্চাশ ডলার জমা থাকে এবং এর ওপর এক বছর অতিক্রান্ত হয়, তবে তাতে যাকাত ফরজ হবে।

সোন-রুপায় যাকাতের পরিমাণ

সোনা-রুপা ও টাকাকড়িতে ফরজ হওয়া যাকাতের পরিমাণ হলো রুবউল উশর অর্থাৎ (২.৫%)। সে হিসেবে প্রতি বিশ দিনারে যাকাত হবে অর্ধ দিনার। আর যা এর অতিরিক্ত হবে, তা কম হোক বা বেশি হোক, এ অনুপাতেই হিসাব করে যাকাত দিতে হবে।

রুপার ক্ষেত্রে প্রতি দু'শ দিরহামে পাঁচ দিরহাম যাকাত হিসেবে বের করতে হবে। আর যা এর অতিরিক্ত হবে তা এ অনুপাতে হিসাব করে যাকাত দিতে হবে। এর প্রমাণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী, 'যদি তুমি দু'শ দিরহামের মালিক হও এবং এর উপর এক বছর পার হয়ে যায়, তবে তাতে পাঁচ দিরহাম দিতে হবে। আর সোনার ক্ষেত্রে যতক্ষণ তুমি বিশ দিনারের মালিক না হবে তোমাকে কিছু দিতে হবে না। তাই যখন তোমার কাছে বিশ দিনার হয়ে যাবে এবং এর ওপর এক বছর অতিক্রান্ত হবে তাতে অর্ধ দিনার যাকাত দিতে হবে। আর যা এর অতিরিক্ত হবে, তা সে অনুপাতে হিসাব করে যাকাত দিতে হবে।' [বর্ণনায় আবু দাউদ]

একটি প্রায়োগিক উদাহরণ

এক ব্যক্তির কাছে (৯০০০) নয় হাজার ডলার রয়েছে এবং তা তার মালিকানায় থাকাবস্থায় এক বছর পার হয়েছে। এমতাবস্থায় কি তার উপর যাকাত ফরজ হবে?

এ ক্ষেত্রে প্রথমে আমরা সোনা অথবা রুপার আলোকে নিসাব হিসাব করব। আর তা হবে নিম্নরূপ:

নিসাব : পঁচাশি গ্রাম নিরেট সোনা

= ৮৫* যাকাত ফরজ হওয়ার দিন এক গ্রাম সোনার মূল্য। ধরে নিলাম যে তা ৩০ ডলার।

= ৮৫*৩০= ২৫৫০ ডলার।

তাহলে নিসাব হলো ২৫৫০ ডলার। অতএব উল্লিখিত ব্যক্তির সম্পদ নেসাব পরিমাণ হয়েছে এবং এর ওপর এক বছর অতিক্রান্তও হয়েছে। অতঃপর তার ওপর যাকাত ফরজ হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: প্রদেয় যাকাতের পরিমাণ বের করব নিম্নবর্ণিতভাবে:

প্রদেয় যাকাতের পরিমাণ : ২.৫%

=৯০০০*২.৫ ÷ ১০০ = ২২৫ ডলার.

তাহলে উল্লিখিত ব্যক্তির সম্পদে প্রদেয় যাকাতের পরিমাণ হলো ২২৫ ডলার।

অলংকারের যাকাত

অলংকার দু'প্রকার: সোনা-রুপার অলংকার। সোনা-রুপা ব্যতীত অন্যকোনো ধাতুর অলংকার।

১- সোনা-রুপার অলংকার

প্রথম প্রকার: সঞ্চয় ও সংরক্ষণের জন্য তৈরিকৃত অলংকার অথবা এমন অলংকার যা ব্যবসার উদ্দেশে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ ধরনের অলংকারে যাকাত দিতে হবে।

ব্যবহারের জন্য তৈরিকৃত অলংকার। এ প্রকৃতির অলংকারেও জিম্মাদারি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য যাকাত প্রদান করা উত্তম। জনৈক নারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন। সাথে ছিল তার মেয়ে। মেয়ের হাতে সোনার দুটি পুরো চুড়ি ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন,'তুমি কি এর যাকাত দাও? সে বলল,'না।' তিনি বললেন,'তোমার কি ভালো লাগবে, যদি আল্লাহ তাআলা এ দুটির পরিবর্তে পরকালে তোমাকে দুটি আগুনের চুড়ি পরিয়ে দেন?' বর্ণনাকারী বলেন 'অতঃপর মেয়েটি চুড়ি দুটি খুলে ফেলল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সোপর্দ করল ও বলল,'এ দুটি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য।' (বর্ণনায় আবু দাউদ)

আলেমদের কেউ কেউ অলংকারে যাকাত নেই বলে মন্তব্য করেছেন; তাদের যুক্তি অলংকার এমন সম্পদ নয় যা (লাভের আশায়) পরিবর্ধিত করার জন্য সংরক্ষণ করা হয়। বরং তা কেবল ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য রাখা হয়, পোশাক, ফার্নিচার ও ঘরের আসবাপত্রের মতোই। উপরন্তু অলংকার হলো সৌন্দর্য অর্জনার্থে নারীর প্রয়োজনীয় বিষয়। আর যাকাতের ক্ষেত্রে মূল বিবেচনার বিষয় হলো সম্পদের বর্ধনশীলতা, যা যাকাত প্রয়োগের জন্য জরুরি।

তবে সতর্কতার দাবি হলো সৌন্দর্যলাভ ও বৈধ ব্যবহারের জন্য তৈরিকৃত অলংকারের যাকাত দেয়া। যাকাতের জিম্মাদারি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এটাই উত্তম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,'যাতে তোমার সন্দেহ লাগে তা পরিত্যাগ করে যা তোমার কাছে নিঃসন্দেহ মনে হয় তা ধরো।'(বর্ণনায় বুখারী)



সোনার অলংকার



রুপার অলংকার

২- সোনা-রুপা ব্যতীত অন্যকোনো অলংকারে যাকাত

যেমন ব্রোঞ্জ, মতি-মুক্তা ইত্যাদির ক্ষেত্রে যাকাত প্রযোজ্য হবে না, এসবের মূল্য যতোই হোক না কেন। তবে যদি ব্যবসায়িক উদ্দেশে ব্যবহৃত হয় তাহলে ব্যবসায়িক পণ্য হিসেবে তাতে যাকাত আরোপিত হবে।

মুক্তা



ইয়াকুত পাথর



ব্রোঞ্জ





আলোকচিত্রে ইবাদত

সহজ সরল উপয়ে ইসলামের বিধি-বিধান শেখা

পবিত্রতা | নামাজ | রোজা | যাকাত | হজ্ব



Dr. Abdullah Bahmmam

অনুবাদ

আবদুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান

পর্যালোচনার

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাত

৪ ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাত

ব্যবসায়িক পণ্য

যা ক্রয়-বিক্রয় করে লাভ অর্জনের আশায় প্রস্তুত রাখা হয়



টাকা-পয়সা ব্যতীত সকলপ্রকার সম্পদই ব্যবসায়িক সম্পদ হতে পারে, যেমন গাড়ী, পোশাক, কাপড়, লোহা, কাঠ ইত্যাদি যা ব্যবসায়িক উদ্দেশে তৈরি অথবা সংরক্ষণ করা হয়।

ব্যবসায়িক পণ্যে যাকাতের হুকুম

ব্যবসায়িক পণ্যে যাকাত ফরজ; এর প্রমাণ আল্লাহ তাআলার বাণী :

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ﴾ [البقرة:762]

{হে মুমিনগণ, তোমরা ব্যয় কর উত্তম বস্তু, তোমরা যা অর্জন করেছ} [আল বাকারা:২৬৭]

আলেমগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে ব্যবসায়িক পণ্যের কথা বলেছেন। আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন:

﴿خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ﴾ [التوبة:301]

সূচীপত্র

{তাদের সম্পদ থেকে সদকা নাও। এর মাধ্যমে তাদেরকে তুমি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে।} [সূরা আত-তাওবা:১০৩]

আর ব্যবসায়িক সম্পদ হলো প্রকাশ্য সম্পদের মধ্যে একটি। সে হিসেবে এতে যাকাত ফরজ হওয়াটা স্বাভাবিক।

ব্যবসায়িক পণ্যে যাকাত ফরজ হওয়ার শর্তাবলী

১- ব্যবসায়িক পণ্য নিসাব পরিমাণ হওয়া। আর নিসাব হিসাব করতে হবে সোনা ও রুপার মূল্যের নিরিখে।

২- এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া।

৩- যা ব্যবসার উদ্দেশে রাখা হয়, অর্থাৎ যা বেচাকেনা করে অর্থোপার্জন উদ্দেশ্য হয়। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আমলের নির্ভরতা নিয়তের ওপর।'(বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম) আর যদি কেউ ব্যবসার উদ্দেশ্য বাতিল করে দিয়ে ব্যক্তিগত ব্যবহারের নিয়ত করে নেয় তবে যাকাতের বছর কর্তিত হয়ে যাবে। এরপর যদি আবার ব্যবসার নিয়তে ফিরে আসে তবে এ সময় থেকে নতুনভাবে বছর গোনা শুরু করতে হবে। আর যদি এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ছলচাতুরী করা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে বছর কর্তিত হয়নি বলে ধরা হবে।

লোহা



গাড়ী



কাঠ



পোশাক



উদাহরণত: যদি কেউ মহররম মাসে ব্যবসায়িক উদ্দেশে একখণ্ড জায়গা খরিদ করে, এরপর শাবান মাসে নিয়ত পরিবর্তন করে তাতে নিজের থাকার বাড়ি তৈরি করার ইচ্ছাপোষণ করে, তাহলে যাকাতের বছর কর্তিত হয়ে যাবে। এরপর যদি শাওয়াল মাসে আবার ব্যবসার নিয়তে ফিরে আসে তাহলে এ মাস থেকে নতুন বছর শুরু হবে। কিন্তু যদি যাকাত থেকে অব্যাহতি নেয়ার জন্য ছলচাতুরীমূলক এরূপ করে থাকে, তবে যাকাতের বছর কর্তিত হয়নি বলে ধরা হবে এবং মহররম মাস থেকেই যাকাতের বছর হিসাব হবে।

ব্যবসায়িক পণ্য থেকে যেভাবে যাকাত বের করতে হবে

যখন এক বছর অতিক্রান্ত হবে, বিক্রেয় পণ্যগুলোর বর্তমান বাজারমূল্য কত তা হিসাব করতে হবে। এরপর গরীবদের প্রয়োজনীয়তার নিরিখে পণ্য অথবা পণ্যের মূল্য থেকে যাকাত প্রদান করতে হবে।

ব্যবসায়ী কিভাবে তার ব্যবসায়িক সম্পদের যাকাত হিসাব করবে?

১ - ব্যবসায়ীর কাছে যেসব ব্যবসায়িক সম্পদ রয়েছে তা বর্তমান বাজারমূল্য অনুযায়ী মূল্যায়ন করতে হবে।

২ - ব্যবসায়ীর কাছে টাকা পয়সা যা আছে, চাই তা ব্যবসায় ব্যবহার করুক বা না করুক, তা ব্যবসায়িক সম্পদের সাথে যোগ করবে।

৩ - এর সাথে যোগ করবে আদায়ের নিশ্চয়তাযুক্ত ঋণের অংক।

৪- মোট সম্পদ থেকে ঋণের অংক বের করে আলাদা করবে।

৫ - অবশিষ্ট সম্পদ থেকে যাকাত বের করবে। আর তা হলো ২.৫%।

শেয়ারের যাকাত

শেয়ার

শেয়ার হোল্ডিং কোম্পানির মূলধনের সম-অংশসমূহের একাংশ

উদাহরণ: একটি শেয়ার হোল্ডিং কোম্পানির মূলধন হলো ত্রিশ লাখ ডলার। কোম্পানি শুরু করার সময় মূলধনকে দশ হাজার ভাগে ভাগ করা হয়, প্রতি ভাগের মূল্য (৩০০) ডলার। এ অংশটিই হলো শেয়ার। আর যিনি শেয়ারের মালিক তিনি তার শেয়ার অনুযায়ী কোম্পানির মালিকানায়ও শরীক বলে গণ্য।

শেয়ারনির্ভর লেনদেনে যাকাতের হুকুম

এটা বৈধ, যদি কোম্পানির কার্যক্রম হারামনির্ভর না হয় অথবা সুদী লেনদেন থেকে মুক্ত থাকে।

শেয়ারের যাকাত বের করা

১- যদি কোম্পানি যাকাত প্রদান করে দেয় তবে শেয়ারধারী ব্যক্তির জিম্মাদারি আদায় হয়ে যাবে।

২- আর যদি কোম্পানি যাকাত প্রদান না করে, তাহলে শেয়ারের বাজারদর হিসাব করতে হবে। যদি তা নিসাব পরিমাণ হয় এবং তার ওপর এক বছর অতিক্রান্ত হয় তবে তাতে যাকাত ফরজ হবে। অর্থাৎ ২.৫% হারে যাকাত দিতে হবে; কেননা তা ব্যবসায়িক সম্পদ হিসেবে পরিগণিত।

উদাহরণস্বরূপ : এক ব্যক্তির কাছে ১০০০ শেয়ার রয়েছে। যাকাত বের করার দিন প্রতি শেয়ারের মূল্য ১০ ডলার। সে হিসেবে তার শেয়ারের মোট মূল্য দাঁড়াবে ১০০০০ ডলার। এটা নিসাব পরিমাণ সম্পদ থেকেও বেশি। তাই এক বছর অতিক্রান্ত হলে এর যাকাতপ্রদান আবশ্যক হবে।



মূলধনের যাকাত

ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বিনিয়োগকৃত মূলধনে - যা বেচাকেনা করে লাভ অর্জন উদ্দেশ্য হয়ে থাকে - যাকাত প্রযোজ্য হবে। আর যা স্থাবর সম্পদ বলে বিবেচিত তাতে যাকাত ফরজ হবে না, যেমন জিনিসপত্র রাখার শেলফ, ফ্রিজ যাতে কোনো পণ্য হিফাজত করা হয়, গাড়ী যা পণ্য পরিবহনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, পণ্য উঠানোর যন্ত্রপাতি ইত্যাদি যাকাতের হিসাবে আসবে না।

নিসাবের মালিক হওয়া

পুরো বছরই কি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক থাকতে হবে? নাকি বছরের শুরু ও শেষে যাকাতের নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক থাকাটাই যথেষ্ট? না বছরের শেষে নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকলেই চলবে? এ ক্ষেত্রে মূল বিবেচনার বিষয় হলো বছরের শুরু ও শেষে নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকা; কেননা বছরব্যাপী সম্পদের হিসাব রাখা কষ্টকর। এ কারণেই বছরের শুরুটা হিসাবে আনা হবে, কেননা তখন যাকাত ফরজ হওয়ার কারণ সংঘটিত হয় এবং বছরের শেষটা হিসাব করা হবে, কেননা তখন যাকাত আদায়ের সময় হয়। আর মুসলমানের জন্য সহজ হলো একটি সময় নির্ধারণ করা, যাতে যাকাত প্রদানকারী তার সম্পদের মূল্যায়ন করবে এবং যাকাত আদায় করে দেবে, যেমন রমজান মাস।



আলোকচিত্রে ইবাদত

সহজ সরল উপয়ে ইসলামের বিধি-বিধান শেখা

পবিত্রতা | নামাজ | রোজা | যাকাত | হজ্ব







Dr. Abdullah Bah mmam

অনুবাদ

আবদুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান

পর্যালোচনার

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

গবাদিপশুর যাকাত

৫ গবাদিপশুর যাকাত

গবাদিপশু

উট, গরু ও ছাগল

সূচীপত্র

গবাদিপশুর যাকাতের হুকুম

ফরজ; এর প্রমাণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস, 'উট, গরু ও ছাগলের মালিক যদি যাকাত না দেয়, তবে কিয়ামতের দিন এগুলো বৃহদাকায় ও বিশাল মোটা হয়ে হাজির হবে এবং ওই ব্যক্তিকে তার শিং দিয়ে ঢুঁ মারবে এবং খুর দিয়ে পাড়াবে। যখনই এর একদল শেষ করবে অন্যদল এসে হাজির হবে, এভাবেই চলতে থাকবে মানুষের মাঝে সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত।'(বর্ণনায় মুসলিম)

গবাদিপশুর যাকাত ফরজ হওয়ার শর্তাবলী

১- গবাদিপশুর মালিক হওয়ার পর এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,' সম্পদে পুরো এক বছর অতিক্রান্ত না হলে কোনো যাকাত নেই।'

২- প্রাকৃতিক চারণভূমি থেকে খাদ্য আহরণকারী হতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'সায়েমা উটের ক্ষেত্রে প্রতি চল্লিশটি উটে একটি বেনতে লাবুন দিতে হবে।' সায়েমা উট হলো এমন উট যার খাদ্য হলো ভূমি থেকে প্রাকৃতিভাবে উদ্গত ঘাস।'

৩- গবাদিপশু এমন হতে হবে যার দুধ ও গর্ভজাত সন্তান দ্বারা উপকার লাভ করা উদ্দেশ্য হয় এবং তা এমন হবে না, যা বিশেষ কোনো কাজে ব্যবহার করা হয়, যেমন হালচাষ করা, সেচকর্মে ব্যবহার করা, পণ্যবহনের জন্য ব্যবহার করা।

কর্মে ব্যবহৃত উটে যাকাত নেই; কেননা তা তখন ব্যক্তির মৌলিক প্রয়োজনের মধ্যে শামিল বলে বিবেচিত হবে। আর যদি পশু ভাড়া দেয়া হয় তবে এর বিনিময়ে লব্ধ অর্থের ওপর যাকাত ফরজ হবে।

৪- গবাদিপশু নিসাব সংখ্যক হতে হবে।

গবাদিপশুর যাকাতের নিসাব

প্রথমত: উটের নিসাব ও তাতে প্রদেয় যাকাত

আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, আবু বকর রাযি. তাকে লিখেছেন যে, 'এটা হলো যাকাতের আবশ্যিক বিধান, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের উপর ফরজ করেছেন, আর এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা তার রাসূলকে নির্দেশ দিয়েছেন। উটের সংখ্যা চব্বিশ অথবা তার নিচে হলে যাকাত হিসেবে বকরি দিতে হবে, প্রতি পাঁচ উটে একটি করে বকরি। আর উটের সংখ্যা ২৫ থেকে ৩০ পর্যন্ত হলে একটি এক বছরের স্ত্রীউট, উটের সংখ্যা ৩৬ থেকে ৪৫ পর্যন্ত হলে একটি দু বছরের স্ত্রীউট, আর উটের সংখ্যা ৪৬ থেকে ৬০ পর্যন্ত হলে একটি তিন বছরের স্ত্রীউট। আর উটের সংখ্যা ৬১ থেকে ৭৫ পর্যন্ত হলে একটি চার বছরের স্ত্রীউট যাকাত হিসেবে দিতে হবে। আর যার মাত্র চারটি উট রয়েছে, তার কোনো যাকাত নেই। কিন্তু যদি উটের মালিক ঐচ্ছিকভাবে দেয়। তবে যখন উটের সংখ্যা পাঁচটি হয়ে যাবে তখন একটি বকরি যাকাত হিসেবে দিতে হবে।'(বর্ণনায় বুখারী)

উটের নিসাব ও যাকাত

যাকাতের পরিমাণ	উটের সংখ্যা
৫: ৯	একটি ছাগল
১০: ১৪	দুটি ছাগল
১৫: ১৯	তিনটি ছাগল
২০: ২৪	চারটি ছাগল
২৫: ৩৫	এক বছর বয়সী একটি স্ত্রীউট
৩৬: ৪৫	দু'বছর বয়সীএকটি স্ত্রীউট
৪৬: ৬০	তিন বছর বয়সী একটি স্ত্রীউট
৬১: ৭৫	চার বছর বয়সী একটি স্ত্রীউট
৭৬: ৯০	দু'বছর বয়সী দুটি স্ত্রীউট
৯১: ১২০	তিন বছর বয়সী দুটি স্ত্রীউট
১২০:....	প্রতি চল্লিশ উটে এক বছর বয়সী একটি স্ত্রীউট, আর প্রতি পঞ্চাশ উটে তিন বছর বয়সী একটি স্ত্রীউট



তৃতীয়ত: ছাগলের নিসাব ও তাতে যাকাতের পরিমাণ

মুয়ায ইবনে জাবাল রাযি. বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ইয়েমেনে পাঠালেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন, আমি যেন প্রতি ত্রিশ গরুতে এক বছর বয়সী একটি গরু ও প্রতি চল্লিশ গরুতে দু'বছর বয়সী একটি গরু যাকাত হিসেবে নিই।'(বর্ণনায় আবু দাউদ)

গরুর নিসাব ও যাকাত

যাকাতের পরিমাণ	উটের সংখ্যা
30: 39	এক বছর বয়সী একটি গরু
40: 59	দু'বছর বয়সী একটি গরু
60: 69	একবছর বয়সী দুটি গরু
70: 79	একবছর বয়সী একটি ও দু'বছর বয়সী একটি গরু

তৃতীয়ত: ছাগলের নিসাব ও তাতে যাকাতের পরিমাণ

আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত উল্লিখিত হাদীসে এসেছে, 'প্রকৃতিক চারণভূমিনির্ভর ছাগলের ক্ষেত্রে যদি একশ বিশের অধিক হয় তাহলে দু'শ পর্যন্ত দুটি ছাগল দিতে হবে। আর যদি দু'শ এর অধিক হয় তাহলে তিনশ পর্যন্ত তিনটি ছাগল প্রদেয়। আর যদি তিনশ ছাগলের অধিক হয় তাহলে প্রতি একশ'তে একটি করে ছাগল দিতে হবে। আর যদি চল্লিশটির কম হয় তাহলে তাতে যাকাত নেই, তবে যদি ছাগলের মালিক এমনিতেই দিতে চায়।'(বর্ণনায় বুখারী)

ছাগলের নিসাব ও তাতে প্রদেয় যাকাত

যাকাতের পরিমাণ	উটের সংখ্যা
40: 120	একটি ছাগল
121: 200	দু'টি ছাগল
201: 300	তিনটি ছাগল (এর অতিরিক্ত হলে প্রতি একশ'তে একটি করে ছাগল দিতে হবে)

আলোকচিত্রে ইবাদত

সহজ সরল উপয়ে ইসলামের বিধি-বিধান শেখা

পবিত্রতা | নামাজ | রোজা | যাকাত | হজ্ব







Dr. Abdullah Bah mmam

অনুবাদ

আবদুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান

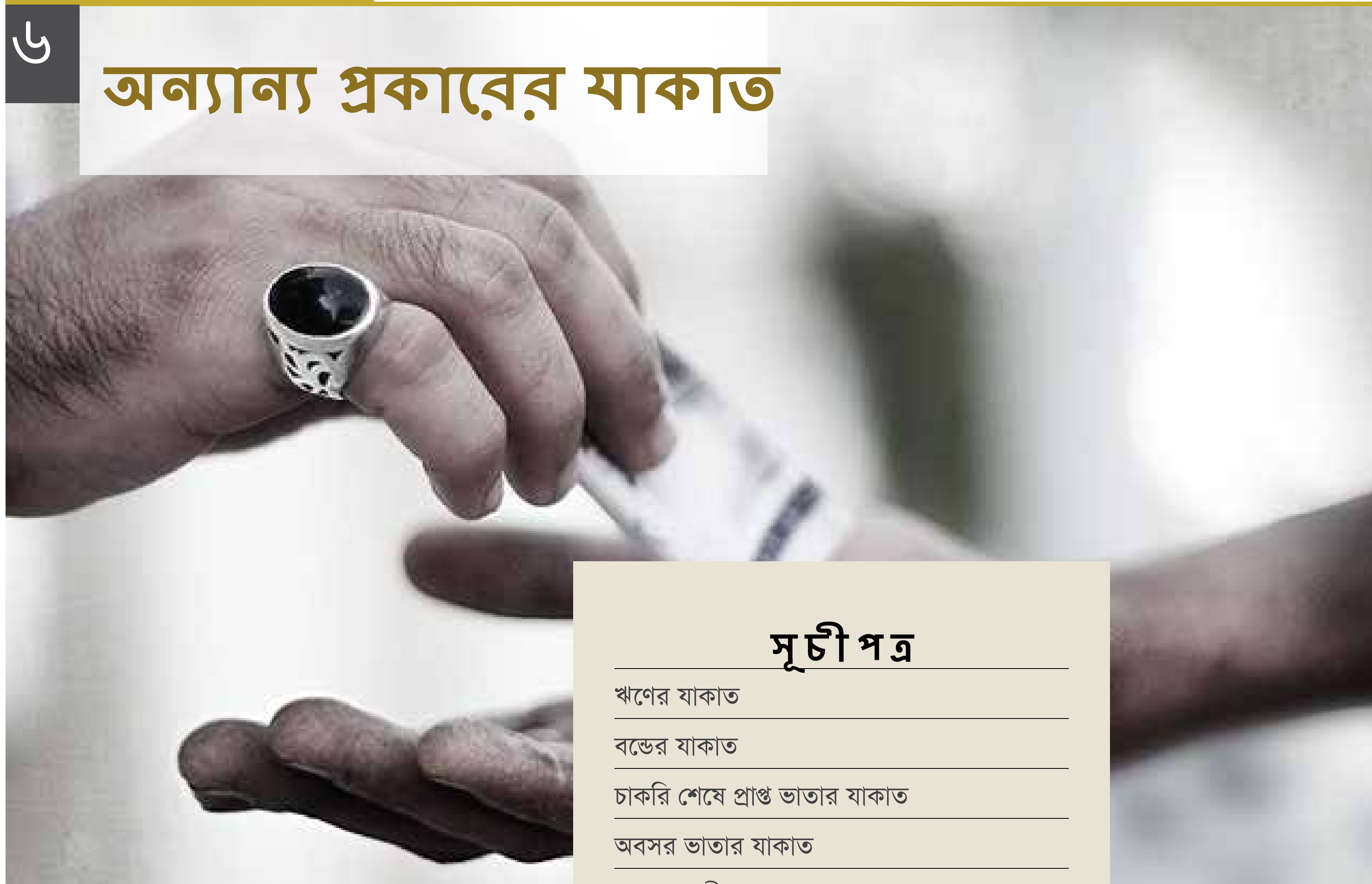
পর্যালোচনার

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

ঋণ, বন্ড, অবসর ভাতা ও হারাম মালের যাকাত

৬

অন্যান্য প্রকারের যাকাত



সূচীপত্র

ঋণের যাকাত

ঋণ

ঋণগ্রস্তের দায়িত্বে অবশ্য প্রদেয় সম্পদ

যাকাতদাতার অবশ্য প্রদেয় ঋণের যাকাতের হুকুম

যদি ব্যক্তির দায়িত্বে এমন ঋণ থাকে যা নিসাবের সমান অথবা নিসাব থেকে কিছু কম, তাহলে তাতে যাকাত ফরজ হবে না। আর যদি ঋণ এমন হয় যা নিসাবকে কমিয়ে দেয় না, তাহলে ঋণের পরিমাণ সম্পদ হিসাব থেকে বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সম্পদের যাকাত দিতে হবে।

উদাহরণত: যদি কোনো ব্যক্তির কাছে ১০০০০ ডলার থাকে, আর তার ঋণের পরিমাণ হয় ১০০০০ ডলার তাহলে তাতে যাকাত ফরজ হবে না। তদ্রুপভাবে যদি ঋণের পরিমাণ হয় ৯৯৫০ ডলার, তাহলেও তা নিসাবকে কমিয়ে দিচ্ছে, অতঃপর এ অবস্থায়ও যাকাত ফরজ হবে না। পক্ষান্তরে যদি ঋণের পরিমাণ হয় ৬০০০ ডলার, তবে যাকাত ফরজ হবে।

অন্যকে-দেয়া ঋণের টাকার ওপর যাকাত ধার্য হওয়া না হওয়ার হুকুম

১- যদি যাকাতদাতার অন্যকে ধার-দেয়া টাকা ফিরিয়ে আনা দুষ্কর হয়, যেমন ধারগ্রহীতা নিঃ-দরিদ্র অথবা ধার নেয়ার বিষয়টি সে অস্বীকার করে বসে, এমতাবস্থায় ঋণদাতাকে, যে বছরগোলোতে ঋণ উসুল করতে ব্যর্থ হবে, সে বছরগুলোর যাকাত দিতে হবে না। বরং যে বছর তা আদায় করতে সক্ষম হবে কেবল সে বছরের যাকাত আদায় করলেই চলবে।

২- যদি ধার-দেয়া টাকা ফিরিয়ে আনা দুষ্কর না হয়, যেমন ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধে কালক্ষেপ করে না। বরং সে পরিশোধের ইচ্ছা রাখে, এমতাবস্থায় যাকাতদানকারীকে প্রতি বছরের জন্যেই যাকাত প্রদান করতে হবে; কেননা উল্লিখিত পরিস্থিতিতে ধার-দেয়া সম্পদ যাকাতদাতার কাছেই রয়ে গেছে বলে মনে করা হবে।

বন্ড এর যাকাত

বন্ড

এমন একটি সনদ যা ইস্যুকারী এর বাহককে এর গায়ে লেখা মূল্য প্রদান করতে বাধ্য থাকে যখন সে তার হকদার হয়। সাথে সাথে বন্ডের মূল্যের সাথে, চুক্তি মোতাবেক, অতিরিক্ত লাভও প্রদান করা হয়।

এটি পরিস্কার সুদ ও হারাম। সে হিসেবে সাধারণভাবে লেনদেনকৃত বন্ড অবৈধ; কেননা তা এমন একটি ধার, যার সাথে সরাসরি লাভযুক্ত রয়েছে। যারা এ ধরনের লেনদেনের সাথে যুক্ত রয়েছে তাদের উচিত আল্লাহর কাছে তাওবা করা।

বন্ডের যাকাতের হুকুম ও পরিমাণ

বন্ডের যাকাত

বন্ডের যাকাতের হুকুম ঋণের যাকাতের মতোই। অতঃপর এতে যাকাত ফরজ হবে যদি তা নিসাব পরিমাণ হয়। অথবা বন্ডধারী ব্যক্তির অন্যান্য সম্পদ, যেমন টাকা-পয়সা, ব্যবসায়িক পণ্য ইত্যাদি একসাথে মিলে যদি নিসাব পরিমাণ হয় এবং একবছর অতিক্রান্ত হয়, তাহলে তাতে যাকাত ফরজ হবে এবং ২.৫% হারে যাকাত দিতে হবে। আর যদি বন্ড এমন হয় যা সুনির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে ভাঙ্গানো যাবে না, এমতাবস্থায়ও যাকাত রহিত হবে না, বরং যখন ভাঙ্গানো যাবে তখন বিগত সকল বছরের যাকাত প্রদান আবশ্যক হবে।



চাকরি শেষে প্রাপ্য ভাতা, অবসর ভাতা ও বেতনের যাকাত

চাকরি শেষে প্রাপ্য ভাতা

চাকরির পূর্ণ মেয়াদ শেষে চাকরিজীবীকে প্রদত্ত বেতনভিত্তিক কল্যাণমূলক ভাতা, যা সরকার বা কোনো প্রতিষ্ঠান সুনির্দিষ্ট শর্তের বর্তমানে- নীতিমালা অনুযায়ী- প্রদান করে থাকে।

অবসর ভাতা

অবসর ভাতা

সুনির্দিষ্ট অংকের টাকা, যা কোনো সরকার বা প্রতিষ্ঠান, স্যোসাল ইনসিউরেন্স নীতিমালার আওতাধীন, কোনো চাকরিজীবীকে প্রদান করে থাকে পেনশন বেতনপ্রাপ্তির শর্তাবলি অপূর্ণ থাকা সত্ত্বেও।

পেনশন বেতন

একজন সরকারী অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কোনো চাকরিজীবী চাকরির পূর্ণ মেয়াদ শেষে নীমিমালা অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট শর্তের উপস্থিতিতে যে বেতন পেয়ে থাকে সেটাকেই পেনশন বেতন বলে।

এগুলোর হুকুম

এগুলোর হুকুম হলো, চাকরিজীবী যতদিন চাকরিরত থাকবে তাকে কোনো যাকাত দিতে হবে না; কেননা এ প্রকৃতির অর্থে ব্যক্তির পূর্ণ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত নয়। আর অর্থসম্পদ ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ মালিকানাধীন থাকা যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য শর্ত। পূর্ণ মালিকানা না থাকার দলিল, চাকরিরত ব্যক্তি ইচ্ছা করলেই তা ব্যয় করতে পারে না। বরং চাকরির মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত মালিকানাসুলভ কোনো অধিকারই তাতে খাটাতে পারে না।

উল্লিখিত বেতন-ভাতাদি সুনির্দিষ্টকরণ ও চাকরিজীবীকে প্রদানের ব্যাপারে যখন সিদ্ধান্ত হবে এবং তাকে একসাথে অথবা বিভিন্ন মেয়াদে তা দেয়া হবে তখন এতে পূর্ণ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং যে পরিমাণ হস্তগত হবে, নিসাব পূরণ হওয়ার শর্তে তা থেকে যাকাত দিতে হবে।



ভাড়াটিয়া ব্যক্তির সিকিউরিটি হিসেবে মালিককে প্রদত্ত অর্থের যাকাত

সিকিউরিটি

ভাড়াদাতাকে ভাড়াটিয়া ব্যক্তির অগ্রিম প্রদত্ত টাকা

এর হুকুম

ভাড়াটিয়া ব্যক্তিকে এ জাতীয় টাকার যাকাত প্রদান করতে হবে না; কেননা এতে পূর্ণ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত নয়, যা যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য শর্ত।(ড. সালাহ আস্সাওয়ী, আধুনিক ফিকহী বিষয়, পৃ:৬০)

স্বত্বাধিকারকেন্দ্রিক অর্থের যাকাত

স্বত্বাধিকার

অজড় কোনো কিছুর উপর ব্যক্তির অধিকারস্বত্ব, হতে পারে তা ব্যক্তির মেধাজাত কোনো বিষয়, যেমন লেখকস্বত্ব, আবিষ্কারস্বত্ব অথবা ব্যবসায়িক কোনো কার্যক্রম যা গ্রাহক সংগ্রহের উদ্দেশে ব্যবসায়ী ব্যক্তি গ্রহণ করে থাকেন, যেমন ট্রেইড নেইম, ট্রেইড মার্ক ইত্যাদি।

স্বত্বাধিকারে যাকাতের হুকুম

রেওয়াজ অনুযায়ী স্বত্বাধিকারের একটি আর্থিক মূল্য রয়েছে, যা ইসলামি শরীয়ার দৃষ্টিতেও কার্যকর। অতএব ইসলামি শরীয়ার বিধান মোতাবেক তা ব্যবহারে আনা বৈধ। আর এ অধিকার সংরক্ষিত, কারো পক্ষেই তা লংঘন করা জায়েয নয়।

অবশ্য মূল লেখকস্বত্বা অথবা আবিষ্কার স্বত্বায় যাকাত নেই; কেননা তাতে যাকাতের শর্ত অনুপস্থিত, তবে যদি স্বত্বাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অর্থ হস্তগত হয় তবে উপকারসাধনযোগ্য সম্পদের ন্যায় তার যাকাত প্রদান ফরজ হবে।(ড. সালাহ আস্সাওয়ী, আধুনিক ফিকহী বিষয়, পৃ:৬০)

মজুরি,বেতন এবং স্বাধীনকর্ম থেকে অর্জিত অর্থের যাকাত

মজুরি ও বেতন

কাজের বিনিময়ে কর্মীব্যক্তি যে অর্থ পেয়ে থাকে



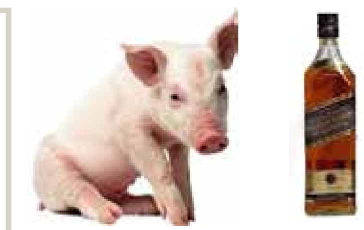
এর হুকুম

এর হুকুম সোনা-রুপার যাকাতের মতোই। অর্থাৎ যখন নিসাব পরিমাণ হবে ও এক বছর অতিক্রান্ত হবে তখন তাতে যাকাত ফরজ হবে। আর তাতে যাকাতের পরিমাণ হলো ২.৫%.

হারাম মালের যাকাত

হারাম মাল

যে সম্পদ অর্জন করা অথবা যে সম্পদ থেকে উপকার লাভ শরীয়তে নিষিদ্ধ তাই হলো হারাম মাল, যেমন মদের ব্যবসা থেকে প্রাপ্ত অর্থ অথবা সুদ বা চুরিকৃত সম্পত্তি ইত্যাদি।



হারাম মালের যাকাতের হুকুম

যে সম্পদ মূলে হারাম - যেমন মদ অথবা শূকর- ইত্যাদির ব্যবসা থেকে অর্জিত অর্থে যাকাত নেই। তদ্রূপভাবে যে সম্পদ মূলে হারাম নয়, তবে অন্যকোনো কারণে, শরীয়তের বিধান বিঘ্নিত হওয়ার দরুন হারাম হয়েছে, যেমন চুরিকৃত সম্পদ, এরূপ সম্পদেও যাকাত নেই; কেননা এ ধরনের সম্পদে ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না, যা যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য শর্ত।

হারাম মালের ক্ষেত্রে যা করণীয়

ক. উপার্জন-পদ্ধতিতে সমস্যা থাকায় এ সম্পদের অধিকারী ব্যক্তি কখনো তার মালিক হবে না, সময় যতোই গড়িয়ে যাক না কেন। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তির ওপর আবশ্যক হবে মূল মালিক অথবা তার উত্তারাধিকারীকে - যদি জানা থাকে - সম্পদ ফিরিয়ে দেয়া। আর যদি মূল মালিক অথবা তার উত্তারাধিকারীকে চেনার বিষয়ে ব্যক্তি নিরাশ হয়ে পড়ে, তবে হারাম মাল থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্য মালিকের পক্ষ থেকে সদকা হিসেবে কল্যাণমূলক কাজে তা ব্যয় করে দিতে হবে।

খ. যদি হারাম কাজের মজুরি হিসেবে সম্পদ অর্জন করে থাকে তাহলে অর্জনকারী তা কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করে দেবে। যার কাছ থেকে তা নিয়েছে তাকে ফেরত দেবে না; কেননা সে তা আবারও গুনাহের কাজে ব্যয় করবে।

গ. যার কাছ থেকে হারাম মাল নেয়া হয়েছে সে যদি অবৈধ লেনদেন পরিত্যাগ না করার ব্যাপারে অনড় থাকে, যা তার সম্পদ হারাম হওয়ার কারণ হয়েছে, যেমন সুদী লেনেদেনের টাকা, তাহলে তার সম্পদ তাকে ফিরিয়ে দেয়া হবে না, বরং তা কল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করা হবে।

ঘ. যদি হারাম মাল হস্তগতকারী ব্যক্তি মূল হারাম মাল ফিরিয়ে দিতে অপারগ হয়, তাহলে তার স্থলে সমপরিমাণ মাল অথবা তার মূল্য মালিককে ফিরিয়ে দেবে, যদি তাকে খুঁজে বের করতে পারে, অন্যথায় সমপরিমান মাল বা তার মূল্য, মূল মালিকের পক্ষ থেকে সদকা করার নিয়তে কল্যাণমূলক খাতে ব্যয় করে দেবে।(ড. সালাহ আস্সাওয়ী, আধুনিক ফিকহী বিষয়, পৃ:৬১ ও তৎপরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ)



আলোকচিত্রে ইবাদত

সহজ সরল উপয়ে ইসলামের বিধি-বিধান শেখা

পবিত্রতা | নামাজ | রোজা | যাকাত | হজ্ব



Dr. Abdullah Bahmmam

অনুবাদ

আবদুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান

পর্যালোচনার

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

আহলে যাকাত ও যাকাত প্রদান প্রসঙ্গ

৭

আহলে যাকাত ও যাকাত প্রদান প্রসঙ্গ



আহলে যাকাত:

যাকাতের হকদারদেরকে আহলে যাকাত বলে। আল্লাহ তআলা আল কুরআনে আহলে যাকাতকে আট প্রকারে সীমিত করে উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে:

﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾ [التوبة:06]

{নিশ্চয় সদকা হচ্ছে ফকীর ও মিসকীনদের জন্য এবং এতে নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্য, আর যাদের অন্তর আকৃষ্ট করতে হয় তাদের জন্য; (তা বণ্টন করা যায়) দাস আযাদ করার ক্ষেত্রে, ঋণগ্রস্তদের মধ্যে, আল্লাহর রাস্তায় এবং মুসাফিরদের মধ্যে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।} [সূরা আত-তাওবা:৬০]

সূচীপত্র

ফকীর

ফকীর

ফকীর হলো যার নিজের ও পরিবারের অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয়-আশয়ের অভাব রয়েছে, যেমন খাদ্য,পানীয়,কাপড় ও বাসস্থানের অভাব থাকা।



এমন ব্যক্তিকে তার নিজের ও তার পরিবারে এক বছরের প্রয়োজন পূরণ হওয়ার মতো যাকাত দেয়া হবে।

মিসকীন

মিসকীন

মিসকীন হলো এমন ব্যক্তি যার মোট প্রয়োজনের তুলনায় অর্ধেক অথবা অর্ধেকের কিছু বেশি সম্পদ রয়েছে, যেমন এক ব্যক্তির কাছে একশ টাকা আছে, কিন্তু তার প্রয়োজন দু'শ টাকার, এমতাবস্থায় তার ও তার পরিবারের প্রয়োজন পূরণ হতে বাকি যা টাকা লাগে তা যাকাত থেকে দেয়া হবে।



যাকাতে নিয়োজিত কর্মচারী

যাকাতে নিয়োজিত কর্মচারী

যারা কর্তৃপক্ষের নির্দেশে যাকাত জমা করেন ও অভাবগ্রস্তদের মাঝে বণ্টন করেন।





দীনের জন্য যাদের অন্তর আকৃষ্ট করা উদ্দেশ্য

দীনের জন্য যাদের অন্তর আকৃষ্ট করা উদ্দেশ্য

নিজগোত্রে সম্মান ও আনুগত্যের পাত্র এমন নেতৃবর্গ যাদেরকে অর্থদান করলে ইসলাম গ্রহণ করার অথবা মুসলমানদেরকে নির্যাতন করা থেকে বিরত থাকার অথবা তাদের ঈমানে মজবুতি সৃষ্টি হওয়ার অথবা মুসলমানদের কোনো শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আশা করা যায়।

যে পরিমাণ সম্পদ দিলে এদের অন্তর আকৃষ্ট হবে বলে আশা করা যায়, যাকাতের সম্পদ থেকে এদেরকে সে পরিমাণ সম্পদ দেয়া হবে।



গোলাম

গোলাম

দাস ও মুকাতিব

যাতে এদের প্রত্যেকেই স্বাধীনস্বত্বার অধিকারি হতে পারে এবং সমাজের জন্য একজন কল্যাণকর সদস্যে পরিণত হতে পারে। পূর্ণাঙ্গরূপে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী চর্চা করতে সক্ষম হয়। মুসলমান যুদ্ধবন্দিরাও এর মধ্যে শামিল।



ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি

গোলাম

দাস ও মুকাতিব

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি দু প্রকার

প্রথম প্রকার হলো: যে নিজের প্রয়োজনে ঋণগ্রস্ত। এমন ব্যক্তি দরিদ্র হলে তাকে যাকাতের টাকা থেকে দেয়া হবে, যাতে সে ঋণের দায় থেকে মুক্ত হতে পারে।

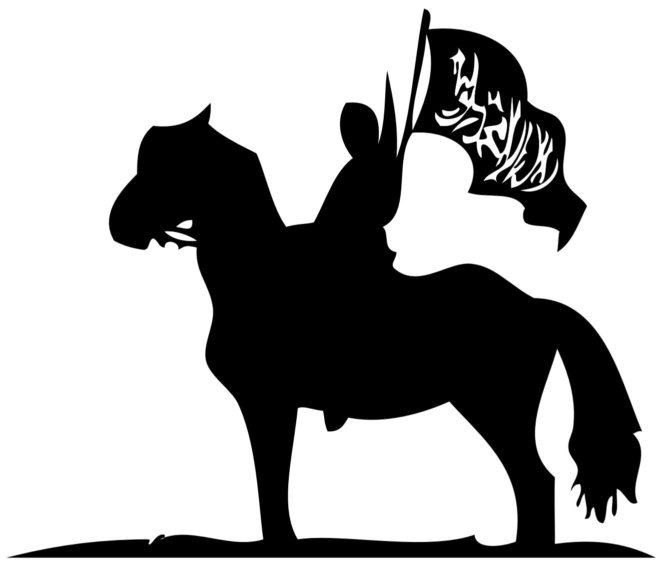


আল্লাহর রাস্তায়।

আল্লাহর রাস্তায়
যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদরত

এদেরকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ চালিয়ে যাওয়ার মতো যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ যাকাত থেকে দেয়া হবে।

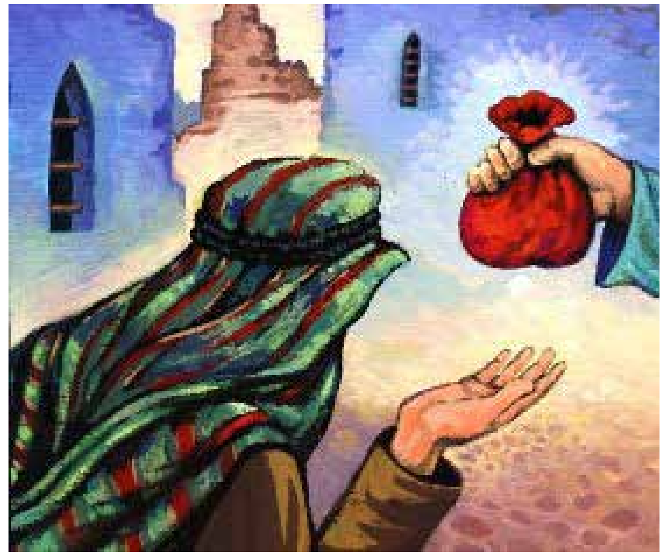
ইসলামপ্রচারমূলক বহু কার্যক্রমও এ খাতের আওতাভুক্ত হবে, যা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ হিসেবে পরিগণিত, বিশেষ করে যদি তা মুসলমানদের সাধারণ দান থেকে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থের জোগান দিতে না পারে।



মুসাফির

মুসাফির
সফর অবস্থায় যে নিঃস্ব ও অর্থশূন্য হয়ে পড়েছে।

এরূপ ব্যক্তিকে নিজ দেশে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যাকাত থেকে যথেষ্ট পরিমাণ টাকা দেয়া হবে, স্বদেশে সে ধনী হলেও।



সতর্কতা

১- উপরোল্লিখত আট খাত ব্যতীত অন্যকোনো খাতে যাকাতের টাকা ব্যয় করা শুদ্ধ হবে না, তা ভালো কাজ বলে বিবেচিত হলেও, যেমন মসজিদ, মাদ্রাসা ও হাসপাতাল ইত্যাদি নির্মাণ। এ সব ক্ষেত্রে যাকাত ব্যতীত সাধারণ দানের টাকা ব্যবহার করা যেতে পারে।

২ - যাকাত প্রদানের সময় উল্লিখিত আট খাতের সবগুলোকেই শামিল করতে হবে তেমন কোনো কথা নেই। বরং আট খাতের যেকোনো একটিতে প্রদান করলেই যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

যাদেরকে যাকাত দেয়া হবে না

১- ধনী ও উপার্জনে সক্ষম ব্যক্তিদেরকে যাকাত দেয়া হবে না

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,'ধনী ও উপার্যনে সক্ষম ব্যক্তির জন্য যাকাতে কোনো হিস্সা নেই।'(বর্ণনায় আবু দাউদ)

২- মাতা-পিতা, ছেলে-সন্তান, স্ত্রী যাদের ব্যয়ভার বহন করা কর্তব্য

মুসলিম ব্যক্তির উপর যাদের ব্যয়ভার বহন করা কর্তব্য, যেমন পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, (এবং এর উর্ধবর্তী ব্যক্তিরা) সন্তান, নাতি-নাতনি (এবং এর নিম্নবর্তী ব্যক্তিরা) এদেরকে যাকাত দেয়া বৈধ নয়। কেননা এদেরকে যাকাত দেয়ার অর্থ হবে ব্যয়ভারের কর্তব্য থেকে এদেরকে অমুখাপেক্ষী করে দেয়া এবং ব্যক্তির ঘার থেকে এদের ব্যয়ভারের দায়িত্ব সরে যাওয়া। তাহলে যাকাত প্রদানের উপকারিতা পরিশেষে যাকাতদাতার ভাগেই আসল, যেন সে নিজেকেই যাকাত দিল।

৩- এমন অমুসলিম, যার অন্তর আকৃষ্ট করা উদ্দেশ্য হবে না

অমুসলিম ব্যক্তি যার অন্তর আকৃষ্ট করা উদ্দেশ্য নয়, এমন ব্যক্তিকে যাকাতের টাকা দেয়া বৈধ হবে না। হাদীসে এসেছে, 'যাকাত তাদের ধনীদের কাছ থেকে নেয়া হবে এবং তাদের ফকীরদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে।'(বর্ণনায় বুখারী)

'তাদের' বলতে এখানে মুসলমানদেরকে বুঝানো হয়েছে। অন্যদেরকে বুঝানো হয়নি। উপরন্তু যাকাতের উদ্দেশ্যসমূহের একটি হলো, মুসলমানদের মধ্যে যারা দরিদ্র, তাদের অভাবমুক্ত করে দেয়া এবং মুসলিম সমাজের সদস্যদের মধ্যে মিল-মহব্বত-ভ্রাতৃত্ববোধ বাড়িয়ে দেয়া। আর এরূপ করা অমুসলিমদের ক্ষেত্রে বৈধ নয়।

৪- নবী পরিবার (নবী পরিবার: তারা হলেন বনী হাশিম গোত্রের সদস্যবর্গ)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারভুক্ত ব্যক্তিদেরকে যাকাত দেয়া বৈধ নয়। এর উদ্দেশ্য তাঁদের সম্মান-শ্রদ্ধা যথাস্থানে বজায় রাখা। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'এ যাকাত হলো মানুষের ময়লা-আবর্জনা, অতএব তা মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদ পরিবারের জন্য হালাল নয়।'(বর্ণনায় মুসলিম)

৫- আলে নবীর আযাদকৃত গোলামগণ

যেসব দাস-দাসীকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারের সদস্যগণ আযাদ করেছেন তাদেরকেও যাকাত দেয়া বৈধ হবে না। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 'নিশ্চয় যাকাত আমাদের জন্য হালাল নয়, আর কোনো সম্প্রদায়ের আযাদকৃতরাও তাদের মধ্যে শামিল।'(বর্ণনায় তিরমিযী)

'তাদের মধ্যে শামিল' এর অর্থ তাদের হুকুম মূল গোত্রেরই হুকুম, অতএব বনী হাশিম গোত্রের আযাদকৃতদেরকে যাকাত দেয়া হারাম হবে।

৬- মালিকানাধীন দাস

দাসদেরকে যাকাত দেয়া শুদ্ধ হবে না; কেননা দাসের সকল অর্থসম্পদের মালিক তার মনিব। সে হিসেবে দাসকে যাকাত দিলে তা তার মনিবের মালিকানায় চলে যাবে; উপরন্তু দাসের যাবতীয় ব্যয়ভারের দায়িত্ব মনিবকেই বহন করতে হয়। ব্যতিক্রম হলো শুধু মুকাতিব দাস,- যে নির্দিষ্ট অংকের টাকার বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জনের ব্যাপারে মুনিবের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে - মুকাতিব দাসকে যাকাতপ্রদান বৈধ রয়েছে, যাতে সে ঋণ আদায় করে স্বাধীনতা অর্জনে সক্ষম হতে পারে। আর যদি মুকাতিব দাস যাকাতে নিয়োজিত কর্মচারি হয়ে থাকে তবে তাকেও যাকাত দেয়া শুদ্ধ হবে। আর দাসকে তার মনিবের অনুমতি সাপেক্ষে ভাড়া নেয়া বৈধ রয়েছে।

যাকাতে নিয়োজিত কর্মচারী

যাকাতে নিয়োজিত কর্মচারি এবং ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে, ধনী হলেও যাকাত থেকে দেয়া হবে। আর উপার্জনে সক্ষম ব্যক্তি যদি দীনী জ্ঞানার্জনের জন্য নিজেকে ফারেগ করে নেয় এবং তার কোনো অর্থসম্পদ না থাকে, তাহলে তাকেও যাকাত দেয়া বৈধ; কেননা ইলম তলব করা এক অর্থে আল্লাহর পথে জিহাদ। তদ্রূপভাবে আল্লাহর পথের মুজাহিদ ও যাদের অন্তর আকৃষ্ট করা উদ্দেশ্য এদের দরিদ্র হওয়া যাকাত প্রদানের জন্য শর্ত নয়। আর যদি উপার্জনে সক্ষম ব্যক্তি এমন ইবাদতগুজার হয় যে কাজকর্ম বাদ দিয়ে নফল ইবাদতের জন্য নিজেকে ফারেগ করে নিয়েছে, তাহলে এমন ব্যক্তিকে যাকাত দেয়া বৈধ হবে না; কেননা এ জাতীয় আমল দ্বারা কেবল ব্যক্তি নিজেই উপকৃত হয়। অতএব ইলম তলবের সাথে এর কোনো তুলনা হয় না।

আলোকচিত্রে ইবাদত

সহজ সরল উপয়ে ইসলামের বিধি-বিধান শেখা

পবিত্রতা | নামাজ | রোজা | যাকাত | হজ্ব



Dr. Abdullah Bah mmam

অনুবাদ

আবদুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান

পর্যালোচনার

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

ফিতরা বা সদকায়ে ফিতর

৮ সদকায়ে ফিতর

সদকায়ে ফিতর

তা হলো রমজানান্তে রোজা ভঙ্গকেন্দ্রিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক আরোপিত সদকা।

সূচীপত্র

যেহেতু রমজনান্তে ফিতর তথা রোজা ভঙ্গ করা হয়, তাই এ সদকাকে সদকায়ে ফিতর বলা হয়।

সদকায়ে ফিতরের হুকুম

ঈদের দিন ও রাতে যে ব্যক্তি তার নিজের ও পরিবারের খাবারের অতিরিক্ত এক সা’ পরিমাণ খাদ্যের মালিক হবে তার ওপর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবে।

সদকায়ে ফিতরদাতা নিজের, তার স্ত্রীর ও যাদের ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব রয়েছে, তাদের সবার পক্ষ থেকে সদকায়ে ফিতর আদায় করবে।

সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হওয়ার দলিল ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীস, তিনি বলেন,‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব করেছেন খেজুরের এক সা’অথবা যবের এক সা’মুসলিম দাস ও স্বাধীন, নারী ও পুরুষ, ছোট ও বড় সবার ওপর। আর তিনি সদকা আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন মানুষ নামাজের জন্য বের হওয়ার পূর্বেই।’(বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)



খেজুর



যব

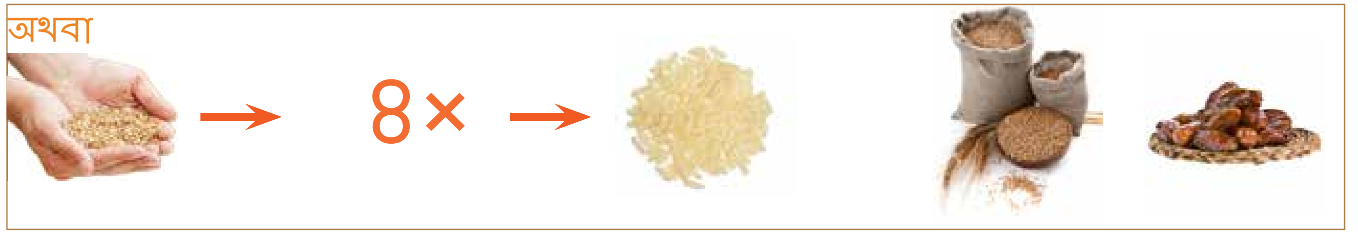
সদকায়ে ফিতর আদায়ের সময়

সদকায়ে ফিতর আদায়ের ফজিলতপূর্ণ সময় হলো ঈদের দিন সূর্যোদয়ের পর ও ঈদের নামাজের পূর্বে। ঈদের দু একদিন পূর্বেও সদকায়ে ফিতর আদায় করা জায়েয; কেননা সাহাবায়ে কেরাম এরূপ করেছেন। ঈদের নামাজের পর সদকায়ে ফিতর আদায় করা জায়েয নয়। এর প্রমাণ উল্লিখিত হাদীস :‘আর তিনি সদকা আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন মানুষ নামাজের জন্য বের হওয়ার পূর্বেই।’

ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে,‘যে ব্যক্তি নামাজের আগে তা আদায় করে দেবে তবে তার সদকা গ্রহণযোগ্য হবে, আর যে নামাজের পর আদায় করবে তার সদকা সাধারণ দান বলে গণ্য হবে।’(বর্ণনায় আবু দাউদ)

সদকায়ে ফিতরের পরিমাণ

প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষ হতে এক সা’ করে সদকায়ে ফিতর আদায় করতে হবে। আর তা হতে হবে মানব-খাদ্য থেকে, যেমন চাউল, খেজুর, গম। আবু সাঈদ খুদরী রাযি. বলেন,‘ঈদের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে খাদ্য থেকে এক সা’ পরিমাণ আদায় করার নির্দেশ দিতেন।’ আবু সাঈদ রাযি. বলেন,‘আর আমাদের খাদ্য ছিল যব, কিশমিশ ও পনীর।’(বর্ণনায় বুখারী)



সদকায়ে ফিতরের খাত

যাকাতের যে আট খাত উল্লিখিত হয়েছে, সে আট খাতে সদকায়ে ফিতরও বণ্টন করা হবে। সূরা তাওবার ৬০ নং আয়াত

﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ﴾ [التوبة:60]

এ ক্ষেত্রেও প্রজোয্য।

সদকায়ে ফিতরের হিকমাত

রোজাদারকে অশ্লীল ও অহেতুক কথা থেকে পবিত্র করা। ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সদকায়ে ফিতর ফরজ করেছেন রোজাদারকে অহেতুক ও অশ্লীল কথা থেকে পবিত্র করার উদ্দেশে ও মিসকীনদের খাবার দান স্বরূপ।’(বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

এটা এ কারণে যে রোজাদার ব্যক্তি অহেতুক ও বাতিল কথাবার্তা থেকে মুক্ত থাকে না। সে হিসেবে এ সদকা রোজাদারকে হারাম ও মাকরুহ কথাবার্তা, যা রোজার ছাওয়াব কমিয়ে দেয় ও রোজার পরিপূর্ণতায় বিঘ্ন ঘটায়, এ সব থেকে রোজাদারকে পবিত্র করে দেয়।

দরিদ্রদের প্রতি প্রশস্তি আনা ও ঈদের দিন তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেয়া যাতে অন্যের কাছে সওয়াল করতে না হয়; কেননা এতে ঈদের দিন তাদেরকে হীন ও অপদস্ত হয়ে থাকতে হয়। পক্ষান্তরে ঈদ হলো আনন্দ ও খুশির দিন। সবাই যাতে এ দিনের আনন্দে অংশ নিতে পারে সে জন্যেই সদকায়ে ফিতরের এ ব্যবস্থা।

যাকাত-বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।

যাকাতে মূল্য নির্ধারণ ও তা প্রদান করা প্রসংগ

আসল হল যে জিনিসে যাকাত ফরজ হয়েছে সরাসরি সে জিনিসকেই যাকাত হিসেবে দেয়া। তবে প্রয়োজন অথবা প্রাধান্যপ্রাপ্ত কোনো স্বার্থের নিরিখে মূল্য নিধারণ করে তা যাকাত হিসেবে দেয়া বৈধ রয়েছে।

যাকাতের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক

যাকাতের সম্পদ উসুল করা মূলত সরকারের দায়িত্ব। তা যাকাতদাতা ও তাদের নিজস্ব অনুমানের ওপর ছেড়ে দেয়া উচিত নয়। কিন্তু যদি সরকার এ বিষয়ক দায়িত্ব পালনে অবহেলা দেখায়, তাহলে প্রত্যেক মুসলমানের ঘাড়েই তা ব্যক্তিগত দায়িত্ব হিসেবে বর্তাবে।

যাকাতের হকদারদের স্বার্থে যাকাতের অর্থ বিনিয়োগ করা

যাকাতের হকদারদের উপকারে আসবে এমন প্রকল্পসমূহে যাকাতের অর্থ বিনিয়োগ করা বৈধ, যদি এমন কোনো খাত না থাকে, যেখানে তাৎক্ষণিকভাবে যাকাতের অর্থবন্টন প্রয়োজন হয়ে পড়ে ।



সম্পদে কি যাকাত ব্যতীত অন্যকোনো অধিকার রয়েছে, যেমন ট্যাক্স?

যাকাত হলো নির্দিষ্ট সময় অন্তর-অন্তর খোদ সম্পদে নির্ধারিত হক, যা ক্ষমতাবানদের ওপর ফরজে আইন হিসেবে আরোপিত।

- সম্পদে যাকাত ব্যতীত অন্যান্য অধিকারও রয়েছে, যা সম্পদে মৌলিকভাবে ও সুনির্দিষ্ট অংকে নির্ধারিত নয়। এ অধিকারগুলো খোদ সম্পদের কারণে আরোপিত হয় না, বরং আকস্মিক কোনো কারণে তা প্রতিষ্ঠিত হয়, যার জন্য সম্পদ থাকা শর্ত, যেমন মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন ও স্ত্রীর ভরণপোষণ, আপদ-বিপদ ও সমস্যা দূর করণ। এসব ক্ষেত্রে যদি সরকারি কোষাগার থেকে অর্থব্যয় না করা হয় তবে নিজ অর্থব্যয়েই তা করতে হবে।

- ট্যাক্স, ন্যায়ানুগ হলেও তা যাকাতের স্থলাভিষিক্ত হবে না। কারণ যাকাত হলো একটি ইবাদত। আর ট্যাক্স হলো একটি নাগরিক দায়িত্ব। তাই একটি অন্যটির স্থলাভিষিক্ত হবে না।



আলোকচিত্রে ইবাদত

সহজ সরল উপয়ে ইসলামের বিধি-বিধান শেখা

পবিত্রতা | নামাজ | রোজা | যাকাত | হজ্ব







Dr. Abdullah Bah mmam

অনুবাদ

আবদুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান

পর্যালোচনার

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

দান-সদকা ও আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়: গুরুত্ব ও ফজিলত

৯ নফল সদকা

নফল সদকা

যা বাধ্যতামূলক যাকাত ও ওয়াজিব সদকা ব্যতীত আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশে প্রদান করা হয়।

এ সংজ্ঞার দ্বারা সদকার বলয় থেকে হাদিয়া ও উপঢৌকন বের হয়ে যাচ্ছে, যা মিল-মহব্বত ধরে রাখা ও বাড়ানোর উদ্দেশে একে অপরকে দিয়ে থাকে। এটা সদকার অন্তর্ভুক্ত নয় যার সাথে কিছু শরয়ী বিধিমালার সম্পর্ক রয়েছে।

নফল সদকার হুকুম

নফল সদকা সবসময় দেয়া উত্তম। বিশেষ করে যখন প্রয়োজন দেখা দেয়। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআন ও সুন্নতে রাসূলে অনেক উৎসাহবেঞ্জক বাণী এসেছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ [البقرة:542]

{কে আছে, যে আল্লহকে উত্তম ঋণ দেবে, ফলে তিনি তার জন্য বহুগুণে বাড়িয়ে দেবেন?} [সূরা আল বাকারা:২৪৫]

আবু হুরায়রা বাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,‘যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুর পরিমাণ সদকা করে - আর আল্লাহ হালাল ব্যতীত অন্যকিছু গ্রহণ করেন না - আল্লাহ তাআলা তা তাঁর ডান হাতে গ্রহণ করেন এরপর তিনি তা লালন করেন, যেমন তোমাদের কেউ তার ঘোড়ার বাচ্চাকে লালন করে, এমনকি একসময় সে সদকা পাহাড়তুল্য হয়ে যায়।’(বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

যে ব্যক্তি গোপনে সদকা দেয় তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওই সাত জনের মধ্যে হিসাব করেছেন যাদেরকে আল্লাহ তাআলা তার ছায়ায় ছায়া দিবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্যকোনো ছায়া থাকবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,‘এবং এমন ব্যক্তি যে সদকা করল, অতঃপর তা গোপন করল, এমনকি তার বাম হাত জানল না, তার ডান হাত কি দান করছে।’(বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

সূচীপত্র



কাআব ইবনে উজরা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘সদকা পাপ নিভিয়ে দেয় যেভাবে পানি আগুন নেভায়।’(বর্ণনায় তিরমিযী)

নফল সদকার আদব

ওয়াজিব আদব

ক. আল্লাহর জন্য ইখলাস ঐকান্তিকতা। তাই সদকা দেয়া হবে একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশে, যাতে থাকবে না কোনো রিয়া ও সুনাম অর্জনের ইচ্ছা।

খ. সদকাগ্রহীতাকে খোঁটা ও কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা, ইরশাদ হয়েছে:

﴿أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ﴾ [البقرة:262]

{হে মুমিনগণ, তোমরা খোঁটা ও কষ্ট দেয়ার মাধ্যমে তোমাদের সদকা বাতিল করো না।} [সূরা আল বাকারা:২৬৪]

মুস্তাহাব আদব

ক. যে সকল আত্মীয়-স্বজনের ব্যয়ভার বহন করতে হয় না, সে সকল আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যারা অভাবী, তাদেরকে সদকা দেয়া একজন মুসলমানের জন্য মুস্তাহাব, যেমন চাচা, মামা, স্ত্রী কর্তৃক দরিদ্র স্বামীকে সদকা প্রদান ইত্যাদি। অন্যদেরকে সদকা দেয়ার চেয়ে এদেরকে সদকা দেয়া উত্তম। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

﴿يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝١٥﴾ [البلد:15]

{ইয়াতীম আত্মীয়স্বজনকে} [সূরা আলবালাদ:১৫]

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,‘নিশ্চয় মিসকীনকে সদকাদান একটি সদকা, আর আত্মীয়কে দানে রয়েছে দুটি: সদকা ও আত্মীয়তা-বন্ধন রক্ষা।

খ. সদকার জন্য সম্পদের হালাল ও ভালো অংশ এবং ব্যক্তির কাছে যা প্রিয় তা বেছে নেয়া। ইরশাদ হয়েছে :

﴿لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران:92]

{তোমরা কখনো ছাওয়াব অর্জন করতে পারবে না, যতণ না ব্যয় করবে তা থেকে, যা তোমরা ভালবাস।} [সূরা আলে ইমরান:৯২]

গ. সংগোপনে সদকা প্রদান করা; কেননা এ প্রক্রিয়া ইখলাসের নিকটতম এবং রিয়া ও সুনাম কুড়ানো থেকে দূরতম। উপরন্তু তা দরিদ্র ব্যক্তিকে সম্মান করার ক্ষেত্রেও একটি উত্তম পন্থা। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَٰتِ فَنِعِمَّا هِىَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ﴾ [البقرة:171]

{তোমরা যদি সদাকা প্রকাশ কর, তবে তা উত্তম। আর যদি তা গোপন কর এবং ফকীরদেরকে তা দাও, তাহলে তাও তোমাদের জন্য উত্তম} [সূরা আল বাকারা:২৭১]

যদি সদকা প্রকাশ করায় কোনো দীনী স্বার্থ থাকে, যেমন অন্যদেরকে উৎসাহিত করা, তাহলে প্রকাশ্যে সদকা করাই উত্তম। তবে এ ব্যাপারে নিজের নিয়তের ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে এবং নিয়ত যাতে কলুষমুক্ত থাকে সে ব্যাপারে যত্নবান হতে হবে।

ঘ. সামর্থ্যানুযায়ী সদকা করা, হোক তা সামান্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘তোমরা খেজুরের একাংশ দান করে হলেও আগুন থেকে বাঁচো।’(বর্ণনায় বুখারী)

নফল সদকার উপকারিতা

প্রথমত: ব্যক্তিগত উপকারিতা

১- আত্মার পরিশুদ্ধি। ইরশাদ হয়েছে, আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم﴾ [التوبة:103]

{তাদের সম্পদ থেকে সদকা নাও। এর মাধ্যমে তাদেরকে তুমি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে।} [সূরা তাওবা:১০৩]

২ - নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ ; কেননা তাঁর একটি অবিচ্ছেদ্য গুণ ছিল দান-খয়রাত করা। আর তিনি এমন দান করতেন যারপর আর দারিদ্র্যের ভয় থাকত না। তিনি বিলাল রাযি. কে বলেছেন, ‘হে বিলাল তুমি সদকা করো, আরশের মালিক তোমার সম্পদ কমিয়ে দেবেন এ আশঙ্কা করোনা।’(বর্ণনায় বাযযার)

৩ - ব্যক্তি যা ব্যয় করবে আল্লাহ তাকে এর পরিবর্তে রিযক দেবেন। আর সদকা দ্বারা মানুষের আত্মোন্নতি ঘটে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُۥ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ ۝٣٩﴾ [سبأ:39]

{আর তোমরা যা কিছু আল্লাহর জন্য ব্যয় কর তিনি তার বিনিময় দেবেন এবং তিনিই উত্তম রিযকদাতা।} [সূরা সাবা:৩৯]

৪ - বেচা- কেনার ভুল থেকে সম্পদকে পবিত্র করা। কায়েস ইবনে আবি গারাযা রযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে আমাদেরকে দালাল বলা হতো। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম আমাদের পাশ দিয়ে গেলেন এবং এর থেকেও উত্তম নামে আমাদেরকে সম্বোধন করলেন। তিনি বললেন, 'হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, নিশ্চয় ব্যবসায় অহেতুক কথা ও কসম এসে যায়, অতঃপর তোমরা তা সদকা দ্বারা মিশ্রিত করো [অর্থাৎ তার কাফফরা প্রদান করো]'(বর্ণনায় আবু দাউদ)

৫ - ছাওয়াব অর্জন ও গুনাহের কাফফারা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,'যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুর পরিমাণ সদকা করে - আর আল্লাহ হালাল ব্যতীত অন্যকিছু গ্রহণ করেন না - আল্লাহ তাআলা তা তাঁর ডান হাতে গ্রহণ করেন এরপর তিনি তা লালন করেন, যেমন তোমাদের কেউ তার ঘোড়ার বাচ্চাকে লালন করে, এমনকি একসময় সে সদকা পাহাড়তুল্য হয়ে যায়।'(বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

৬ - মৃত্যুর পর সদকায়ে জারিয়ার দ্বারা মুসলমানের উপকার লাভ

আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যখন মানুষ মরে যায় তখন তার আমাল বন্ধ হয়ে যায়, তবে তিন প্রকার ব্যতীত: সদকায়ে জারিয়া অথবা এমন ইলম যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় অথবা সৎ সন্তান যে তার জন্য দুআ করে।'(বর্ণনায় মুসলিম)

দ্বিতীয়ত: সামাজিক উপকার

১- সদকা যাকাতের সামাজিক মিশনকে পূর্ণতা দান করে।

২- সমাজে পারিস্পরিক সহায়তা, সহযোগিতা, স্থিতিশীলতা ও মিল-মহব্বত কায়েম করে।



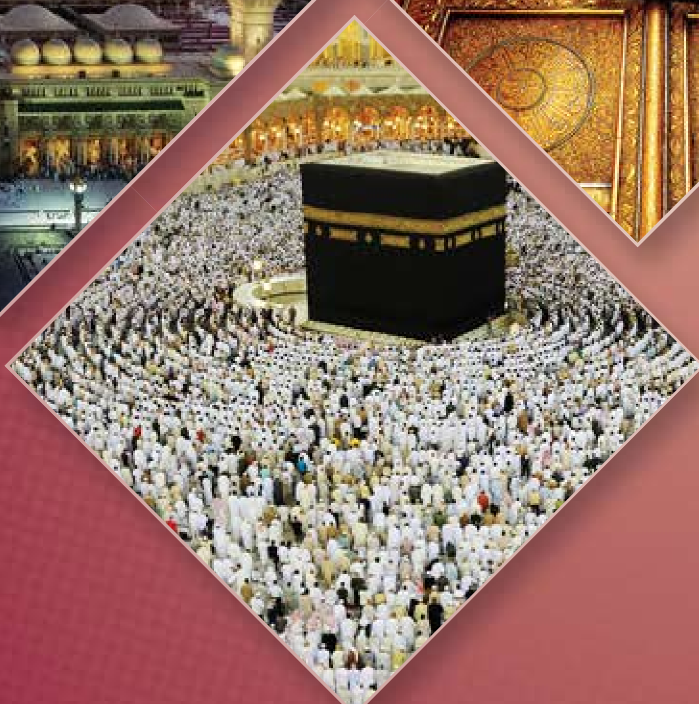
আলোকচিত্রে ইবাদত

সহজ সরল উপয়ে ইসলামের বিধি-বিধান শেখা

পবিত্রতা	নামাজ	রোজা	যাকাত	হজ্ব







Dr. Abdullah Bahmmam

অনুবাদ

আবদুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান

পর্যালোচনায়

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

হজ্বের পরিচিতিমূলক কয়েকটি মুখবন্ধ

১ হজ্বের পরিচিতিমূলক কয়েকটি মুখবন্ধ

মক্কা

সেমিটিক ভাষা বাক্কা থেকে উৎকলিত, যার অর্থ উপত্যকা

সূচিপত্র

মক্কার ইতিহাস ও অবস্থান

পবিত্র কুরআনের এক জায়গায় মক্কার নাম ‘বাক্কা’ বলে উল্লিখিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩٦﴾﴾

(নিশ্চয় প্রথম ঘর, যা মানুষের জন্য স্থাপন করা হয়েছে, তা বাক্কায় (মক্কায়)। যা বরকতময় ও হিদায়েত বিশ্ববাসীর জন্য।) **[সূরা আলে ইমরান:৯৬]**

খৃষ্টপূর্ব ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইবরাহীম ও ঈসমাঈল আলাইহিমাস সালাম এর যুগ থেকে মক্কার ইতিহাস শুরু হয়; কেননা তাঁরাই ছিলেন মক্কার প্রথম বসবাসকারী। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বক্তব্য এভাবে উল্লেখ করেন:

﴿رَّبَّنَآ إِنِّيٓ أَسۡكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيۡرِ ذِي زَرۡعٍ عِندَ بَيۡتِكَ ٱلۡمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجۡعَلۡ أَفۡـِٔدَةٗ مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهۡوِيٓ إِلَيۡهِمۡ وَٱرۡزُقۡهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَٰتِ لَعَلَّهُمۡ يَشۡكُرُونَ ﴿٣٧﴾﴾

(হে আমাদের রব, নিশ্চয় আমি আমার কিছু বংশধরদেরকে ফসলহীন উপত্যকায় আপনার পবিত্র ঘরের নিকট বসতি স্থাপন করালাম, হে আমাদের রব, যাতে তারা সালাত কায়েম করে। সুতরাং কিছু মানুষের হৃদয় আপনি তাদের দিকে ঝুঁকিয়ে দিন এবং তাদেরকে রিযক প্রদান করুন ফল-ফলাদি থেকে, আশা করা যায় তারা শুকরিয়া আদায় করবে।)[সূরা ইবরাহীম: ৩৭]

ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দুআর ফজিলতেই ইসমাঈল আলাইহিস সালামের পায়ের নীচ থেকে যমযমের পানি বিস্ফারিত হয় যখন তার মায়ের কাছে-থাকা খাদ্য ও পানীয় শেষ হয়ে যায়। সে সময় থেকে বিভিন্ন গোত্র এ কূপের কাছে আসতে থাকে এবং মক্কা নগরীতে শুরু হয় জীবনচাঞ্চল্য।

বিভিন্ন গোত্র, নানা জায়গা থেকে মক্কায় আসতে থাকে, আর আধিক্য পেতে থাকে তারা সংখ্যায়। কুরাইশ গোত্রের কাছে অর্পিত হয় মক্কার



নেতৃত্ব তথা শাসনভার। কুরাইশরা তাদের এ দায়িত্বে বহাল থাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব মক্কা ও সমগ্র পৃথিবীর জীবনধারায় সাধিত করে বিশাল পরিবর্তন ।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় প্রেরিত হলেন, আর কাবা পরিণত হলো মুসলমানদের কিবলায় এবং ইসলামী দাওয়াতের সূতিকাগারে। তবে মক্কাবাসীরা ছিল ইসলামি দাওয়াতের বিরুদ্ধে অত্যাধিক কঠোর, মুসলমানদেরকে সবথেকে বেশি নির্যাতনকারী। এমনকি একসময় মুসলমানরা নিজ ভূমি ছেড়ে হিজরত করে চলে যেতে বাধ্য হন মদীনায়। এবং সেখানেই প্রতিষ্ঠা লাভ করে সর্বপ্রথম ইসলামি রাষ্ট্র। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিজয়ী বেশে ফিরে আসেন মক্কায়। সে সময় থেকে মক্কা একটি বড় ইসলামি অঞ্চলে পরিণত হয়, যা অদ্যাবধি বহাল রয়েছে।

মক্কা মুকাররামা ও মক্কার পবিত্র-অঞ্চল মুসলিম শাসক ও খলীফাদের সমধিক গুরুত্বের স্থান ছিল, যা তারা নানা পর্যায়ে উন্নত ও সম্প্রসারিত করেছেন এবং তাকে একটি কেন্দ্রে পরিণত করেছেন, যা থেকে ইসলামের আলো সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে।

মক্কার ফজিলত

১ - মক্কায় যে প্রবেশ করে সে নিরাপদ হয়ে যায়

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنٗاۗ﴾

(আর যে তাতে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ হয়ে যাবে)

[সূরা আলে ইমরান:৯৭] অর্থা□□ যে হারামে মক্কী তথা মক্কার পবিত্রাঞ্চলে প্রবেশ করে সে নিরাপদ হয়ে যায়।

দাজ্জাল এবং মহামারি মক্কায় প্রবেশ করবে না।

আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : **আবু হুরায়রা রাযি. ‘মদীনা ও মক্কা ফেরেশতা দিয়ে ঘেরা। এ দুটোর প্রতিটির পথেই একজন করে ফেরেশতা রয়েছে। দাজ্জাল ও মহামারি এ দুটোতে প্রবেশ করবে না।’** [বর্ণনায় আহমদ]

মসজিদুল হারামে নামাজ আদায় এক লক্ষ নামাজের সমান।

জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, **‘মসজিদুল হারামে নামাজ আদায় অন্য মসজিদে নামাজ আদায়ের চেয়ে একলক্ষগুণ অধিক ফজিলতপূর্ণ।’**(বর্ণনায় ইবনে মাজাহ)

৪ - মক্কা আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় ভূখণ্ড

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, **‘আল্লাহর কসম, নিশ্চয় তুমি আল্লাহর সর্বোত্তম ভূখণ্ড এবং আল্লাহ-সৃষ্ট ভূখণ্ডসমূহের মধ্যে তাঁর কাছে সবথেকে প্রিয় ভূখণ্ড।’**(বর্ণনায় তিরমিযী)



পবিত্র মক্কা

মক্কা ও মক্কার পবিত্র অঞ্চল সম্পর্কে কিছু আহকাম

যে ব্যক্তি মক্কার পবিত্র অঞ্চলে দুষ্কর্ম করার ইচ্ছা পোষণ করবে, সে তা বাস্তবায়ন করুক বা না করুক, তার জন্য রয়েছে কঠিন হুঁশিয়ারি।

ইরশাদ হয়েছে :

﴿وَمَن يُرِدۡ فِيهِ بِإِلۡحَادِۭ بِظُلۡمٖ نُّذِقۡهُ مِنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ﴾

(আর যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করে সেখানে পাপকাজ করতে চায়, তাকে আমি যন্ত্রণাদায়ক আযাব আস্বাদন করাব।)

[সূরা আল হাজ্ব:২৫]

ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, **‘আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণার পাত্র তিন ব্যক্তি,’** (বর্ণনায় বুখারী)এ তিন ব্যক্তির মধ্যে একজন

হলো **'মক্কার পবিত্র অঞ্চলে পাপকারী'(বর্ণনায় মুসলিম)**

যুদ্ধ ও রক্তপাত নিষিদ্ধ হওয়া

ইরশাদ হয়েছে :

﴿وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا﴾

(আর স্মরণ কর, যখন আমি কাবাকে মানুষের জন্য মিলনকেন্দ্র ও নিরাপদ স্থান বানালাম।) [সূরা আল বাকারা:১২৫]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,**'মক্কায় অস্ত্রবহন করা তোমাদের কারো জন্যেই বৈধ নয়।'**(1)

তিনি অন্যত্র বলেছেন,'¯^য়ং আল্লাহ তাআলা মক্কাকে হারাম করেছেন, মানুষ তা হারাম করেনি। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে তার জন্য হালাল হবে না যে, সে এতে রক্তপাত ঘটাবে অথবা এর কোনো গাছ কাটবে।

শিকার করা, গাছ কাটা, পড়ে-থাকা কোনো কিছু কুড়িয়ে তোলা পবিত্র অঞ্চলে নিষিদ্ধ

ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, **'আল্লাহ তাআলা মক্কাকে হারাম করেছেন। আর আমার পূর্বে কারো জন্যেই তা হালাল ছিল না। আমার পরেও কারো জন্যে তা হালাল হবে না। আমার জন্য তা একদিনের কিছু সময়ের জন্য হালাল করা হয়েছিল। অতএব এর তরতাজা তরুলতা কাটা যাবে না। এর গাছপালা কাটা যাবে**

> **মাশায়েরে হজ্ব**
>
> হজ্বের দৃশ্যমান নিদর্শনাবলি যা হজ্বের ইবাদতকে বৈশিষ্টমণ্ডিত করে

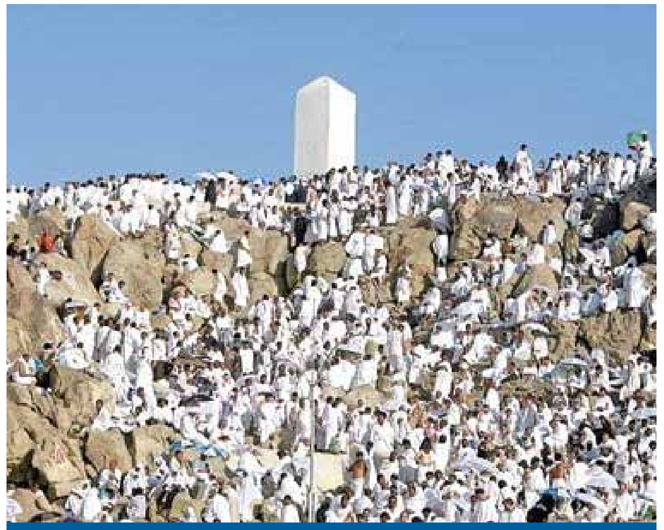
না। এর শিকার জন্তু তাড়ানো যাবে না। এতে পড়ে-থাকা কোনোকিছু কুড়িয়ে নেয়া যাবে না, তবে কেবল পরিচয়-দানকারীর... জন্য(2) (অর্থাৎ যে তার মালিককে খোঁজে বের করতে প্রয়োজনীয় ঘোষণা ও শ্রম দিতে প্রস্তুত)'

মাশায়েরে হজ্ব

(1) (বর্ণনায় বুখারী)
(2) (বর্ণনায় বুখারী)

১ - আরাফাত

আরাফাত আরাফা শব্দের বহুবচন। আরাফাকে আরাফা নামকরণের কারণ হলো, এ ময়দানে আদম ও হাওয়ার পরিচিতি ঘটে। অথবা এ



আরাফাত

জন্য যে মানুষ এতে নিজেদের গুনাহ স্বীকার করে নেয়। উল্লিখিত উভয় প্রক্রিয়াতেই □□□ ধাতু থেকে উৎকলিত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

আরাফা হলো পবিত্র অঞ্চলের বাইরে অবস্থিত হজ্বের স্থান। আরাফা মসজিদুল হারামের দক্ষিণ-পূর্বে ২২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। আরাফার মোট পরিধি ১০,৪ বর্গ কি.মি.। আরাফার ময়দানে নয়-ই যিলহজ্ব হাজ্বীগণ একত্রিত হন।

*মসজিদে নামিরা

মসজিদের পূর্ব পাশে একটি পাহাড় রয়েছে, যা নামিরা বলে খ্যাত। এ পাহাড়ের নাম থেকেই মসজিদের নাম হয়েছে মসজিদে নামিরা।



মসজিদে নামিরা

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হজ্বের সময়, ওয়াদি উরানার মধ্যখানে অবস্থান নেন। সেখানে তিনি খুতবা দেন ও নামাজ আদায় করেন। ওয়াদি উরানায় তাঁর খুতবা দান ও নামাজের জায়গাতেই আব্বাসি খেলাফতের শুরুতে মসজিদ নির্মিত হয়। সৌদিযুগে এ মসজিদটি আরো সম্প্রসারিত হয়। বর্তমানে এর পরিধি এক লক্ষ দশ হাজার বর্গমিটার। যিলহজ্বের নয় তারিখে এ মসজিদে হাজ্বীগণ একত্র হয়ে থাকেন।

মসজিদে সাখারাত



মাসজিদুস সাখারাত

জাবালে রহমতের নিচে পাহাড়ে আরোহনকারীর ডানে এ মসজিদটি অবস্থিত। এ মসজিদে কয়েকটি বড় বড় পাথর রয়েছে যেগুলোর পাশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরাফা দিবসের বিকালে অবস্থান করেছিলেন। এ মসজিদেও হাজ্বীগণ নয়-ই যিলহজ্ব একত্র হন।

জাবালে রহমত

এটি ছোট একটি পাহাড় যা বড় পাথর দিয়ে গঠিত। পাহাড়টি মক্কা



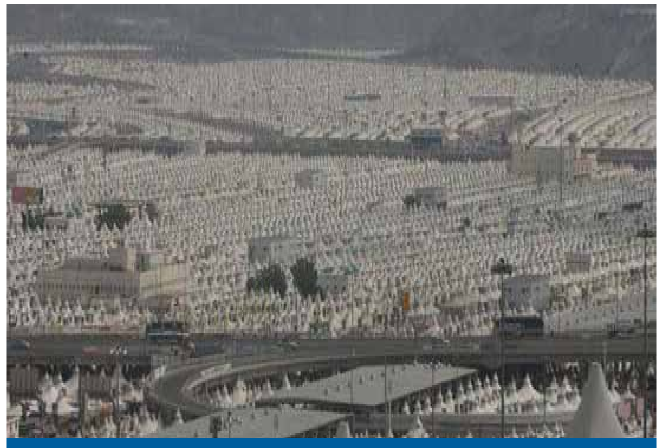
জাবালে রহমত

থেকে পূর্ব দিকে ২০ কি.মি. দূরে অবস্থিত। এ পাহাড়ের শৃঙ্গ হলো

২ - মিনা

আরবিতে 'এমনা' শব্দের অর্থ হলো কোনো তরল পদার্থের সজোড়ে স্খলন ঘটানো। আর যেহেতু মিনায় কুরবানীর জন্তুর রক্তের স্খলন ঘটানো হয়, সে হিসেবে এ স্থানের নাম মিনা রাখা হয়েছে। মিনা মক্কা ও মুযদালিফার মাঝখানে মসজিদুল হারাম থেকে ৭ কি.মি. পূর্বে অবস্থিত। মিনায় হাজ্বীগণ যিলহজ্বের ১১-১২ তারিখ রাতযাপন করেন, যারা দ্রুত মিনা ছেড়ে চলে যেতে চান। আর যারা দেরি করতে চান তারা ১৩ তারিখের রাতও মিনায় যাপন করেন। মিনা মক্কার পবিত্র অঞ্চলের ভিতরে অবস্থিত। মিনায় রয়েছে মসজিদে নামিরা, তিন জামারাত, যেখানে হাজ্বীগণ পাথর মারেন।

জামারাত



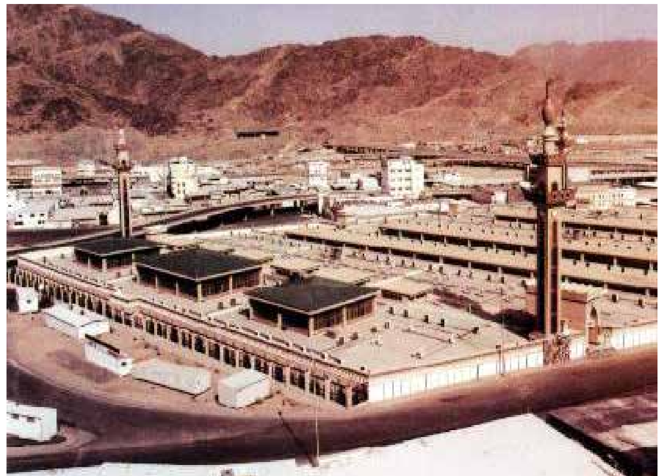
মিনা

> জামারাত শব্দটি জামরা-এর বহুবচন। জামরা অর্থ ছোট পাথর তথা কঙ্কর।
>
> মিনায় অবস্থিত তিন জামারাত হলো: ছোট-জামরা, মধ্য-জামরা ও জামরাতুল আকাবা বা বড়-জামরা। এগুলো হলো পাথরের তিনটি খুঁটি, যা তিনটি গর্তে অবস্থিত। এ তিনটি হলো ওই জায়গার আলামত যেখানে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সামনে শয়তান এসে হাজির হয়েছিল, অতঃপর তিনি তাকে পাথর নিক্ষেপ করেছিলেন। জামরাতুল আকাবা ও মধ্য-জামরার মাঝে দূরত্ব হলো ২৪৭ মি.। আর মধ্য-জামরা এবং ছোট-জামরার মাঝে দূরত্ব হলো প্রায় ২০০ মি.



মসজিদে খায়েফ

ছোট-জামরার নিকটবর্তী, মিনার দক্ষিণাস্থ পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত এ মসজিদ।



মসজিদে খায়েফ

মুজদালিফা

মুযদালিফা হলো মিনা ও আরাফার মাঝে অবস্থিত একটি জায়গা, যাতে হাজ্বীগণ আরাফায় অবস্থানের পর রাতযাপন করেন।

মুযদিফার মধ্যখানে 'আল মাশআরুল হারাম' অবস্থিত। এ জায়গায় অবস্থান করা মুস্তাহাব।

এখানে হাজ্বীদেরকে অবস্থান করতে হয়, প্রত্যুষে আল্লাহর কাছে দুআ-মুনাজাত, আল্লাহর যিকর ও শুকর ইত্যাদির জন্য। এটা হলো হাজ্বীদের রাতযাপনের স্থল যেখানে তারা আরাফা থেকে ৯ যিলহজ্বের সূর্যাস্তের পর চলে আসেন।



মুযদালিফা

মসজিদুল হারাম

এটা হলো আল্লাহর পবিত্র ঘর, যার কতগুলো প্রকাশ্য নিদর্শন রয়েছে, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

কাবা শরীফ

কাবা শরীফ চতুষ্কোণ একটি ঘর

হিজরে ঈসমাঈল

এটা হলো বায়তুল্লাহর উত্তারাংশ। কুরাইশদের কাবা নির্মাণের সময় অর্থ সঙ্কটে পড়ায় তারা এ অংশটি নির্মাণ করতে পারেননি। অতঃপর তারা এ জায়গায় ধনুকের ন্যায় বাঁকা একটি দেয়াল দাঁড় করিয়ে দেন, এটা বুঝানোর জন্য যে, এ অংশটা বায়তুল্লাহর মধ্যে শামিল। হিজরে ঈসমাঈল নামটি সাধারণ মানুষের দেয়া, এটা কোনো শরয়ী নাম নয়।



হাজরে আসওয়াদ

হাজরে আসওয়াদ কাবার দক্ষিণ কোণে কাবা ঘরের দরজার বাম দিকে অবস্থিত। এ পাথরটি জান্নাতের পাথর। পাথরটি ভেঙ্গে গিয়েছিল। এখন কেবল এর আটটি ছোট ছোট টুকরা রয়েছে, যার প্রতিটি খেজুরের মতো বড়।



হাজরে আসওয়াদ

রুকনে য়্যামানি

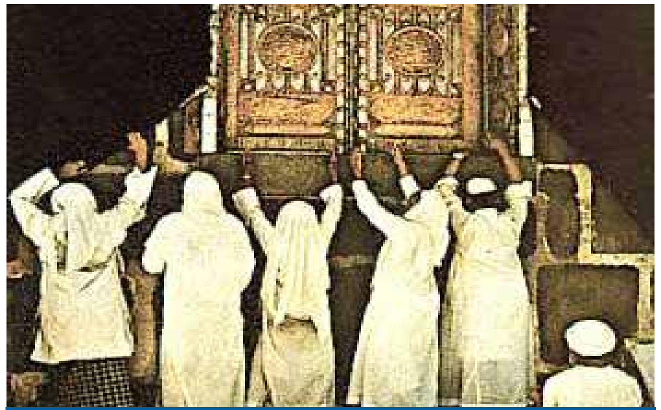
এটা হলো কাবার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ। পবিত্র কাবার এ কোণটি ইয়েমেনের দিকে ফিরানো বলে একে রুকনে য়্যামানি বলা হয়। রুকনে য়্যামানির বৈশিষ্ট্য হলো তা কাবার প্রথমভিত্তির উপর প্রতির্ষ্ঠিত, যা ইবরাহীম ও ঈসমাঈল আলাইহিমাস্ সালাম নির্মাণ করেছিলেন।



রুকনে য়্যামানি

মুলতাযাম

মুলতাযাম হলো হাজরে আসওয়াদ ও কাবার দরজার মাঝখানে দু মিটার পরিমাণ জায়গা। মুলতাযাম হলো দুআ কবুলের স্থল। দু গাল, বক্ষদেশ, দু বাহু, ও দু হাতের তালু মুলতাযামের সাথে লাগিয়ে দুআ করা সুন্নত।



মুলতাযাম



আলোকচিত্রে ইবাদত

সহজ সরল উপয়ে ইসলামের বিধি-বিধান শেখা

পবিত্রতা	নামাজ	রোজা	যাকাত	হজ্ব



Dr. Abdullah Bahmmam

অনুবাদ

আবদুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান

পর্যালোচনায়

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

হজ ও উমরার মাসায়েল



২

হজ্ব ও উমরার আহকাম

সূচিপত্র

আভিধানিক অর্থে হজ্ব

ইচ্ছা করা ও কোনো গন্তব্যের দিকে গমন

শরয়ী পরিভাষায় হজ্ব

বিশেষ ইবাদত আদায়ের উদ্দেশে সুনির্দিষ্ট সময়ে মক্কার উদ্দেশে গমন।

হজ্বের হুকুম ও ফজিলত

হজ্ব ইসলামের একটি স্তম্ভ, যা আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের উপর ফরজ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে:

﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٩٧﴾﴾

(এবং সামর্থ্যবান মানুষের উপর আল্লাহর জন্য বায়তুল্লাহর হজ্ব করা ফরজ। আর যে কুফরী করে, তবে আল্লাহ তো নিশ্চয় সৃষ্টিকুল থেকে অমুখাপেক্ষী।) [সূরা আলে ইমরান:৯৭]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'ইসলাম পাঁচটি জিনিসের ওপর নির্মিত: এ সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম. আল্লাহর দাস ও রাসূল এবং নামাজ কায়েম করা, জাকাত দেয়া, বায়তুল্লাহর হজ্ব করা ও রমজানের রোজা রাখা।'(বর্ণনায় তিরমিযী)রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যত্র বলেছেন,'যে ব্যক্তি হজ্ব করল এবং অশ্লীল কথা পরিত্যাগ করল এবং কোনো গুনাহ করল না, তার অতীতের সকল পাপ মাফ করে দেয়া হলো।

হজ্বের শর্ত

১ - ইসলাম

সে হিসেবে অমুসলিমের উপর হজ্ব ফরজ নয়, অমুসলিম ব্যক্তি হজ্ব করলে তা শুদ্ধও হবে না।

২ - সুস্থমস্তিষ্কসম্পন্ন হওয়া

অতএব পাগলের ওপর হজ্ব ফরজ নয়; কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,'তিন ব্যক্তির ওপর থেকে কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে: ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না সে জাগ্রত হবে, শিশু যতক্ষণ না সে প্রাপ্তবয়স্ক হবে, পাগল যতক্ষণ না সে



অপ্রাপ্তবয়স্কের হজ্ব করা বৈধ

সুস্থমস্তিষ্কসম্পন্ন হবে।'(বর্ণনায় আবু দাউদ)

৩ - প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া

অতএব অপ্রাপ্তবয়স্কের ওপর হজ্ব ফরজ হবে না। তবে যদি সে হজ্বের উদ্দেশে বের হয় তবে তার হজ্ব শুদ্ধ হবে, তবে ইসলামের ফরজ হজ্ব আদায় হবে না। বরং তার হজ্ব নফল বলে গণ্য হবে। ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একটি বাচ্চা দেখিয়ে বলেন, 'এর কি হজ্ব হবে?' তিনি বলেন,' হ্যাঁ, আর তুমি ছাওয়াব পাবে।'

(বর্ণনায় মুসলিম)

৪ - স্বাধীনতা

অতএব দাসের ওপর হজ্ব ফরজ হবে না। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,'দাসদের মধ্যে যদি কেউ হজ্ব করে, অতঃপর তাকে আযাদ করে দেয়া হয়, তাহলে তার উপর আরেকটি হজ্ব থেকে যাবে।'(বর্ণনায় বায়হাকী)

৫ - সামর্থ্য থাকা

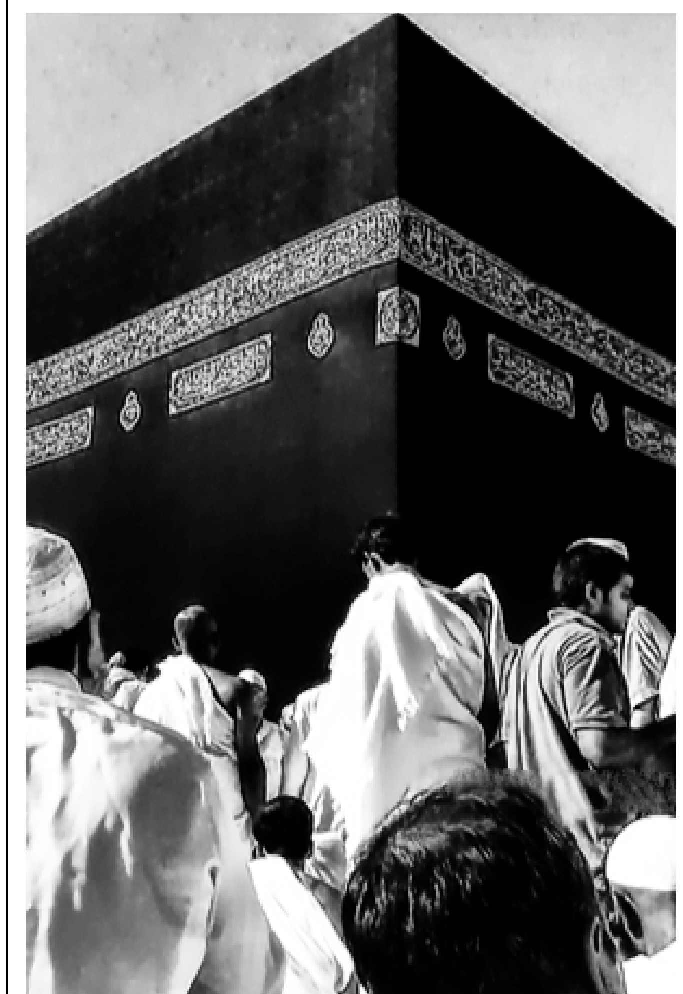
আর তাহলো হজ্বের খরচা ও বাহন থাকা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ﴾

(মানুষের উপর আল্লাহর জন্য বায়তুল্লাহর হজ্ব করা ফরজ। আর যে কুফরী করে, তবে আল্লাহ তো নিশ্চয় সৃষ্টিকুল থেকে অমুখাপেক্ষী।) [সূরা আলে ইমরান:৯৭]

৬ - নারীর সাথে মাহরাম থাকা

ইবনে আব্বাস রাযি. বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খুতবা দেয়া অবস্থায় বলতে শুনেছি,'আর নারী সফর করবে না তবে মাহরামসহ।'(বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম) এ সময় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আমার স্ত্রী হজ্বের উদ্দেশে বের হয়েছে, আর আমি ওমুক যুদ্ধে নাম লিখিয়েছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তুমি যাও, তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্ব করো।'(বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)



বদলি হজ্ব



হজ্ব করতে অপারগ ব্যক্তি

যে ব্যক্তি বার্ধক্য অথবা আরোগ্যহীন ব্যাধিজনিত কারণে অথবা এমন শারীরিক দুর্বলতা হেতু যা তাকে যানবাহনে উঠতে অসামর্থ্য করে দিয়েছে, এমন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে আবশ্যক হলো অন্য কাউকে দিয়ে হজ্ব ও উমরা করানো। বদলি হজ্বকারী হজ্ব অথবা উমরার ইহরাম করার পর যদি সে সুস্থ হয়ে যায়, তবু তার পক্ষ থেকে বদলি হজ্ব শুদ্ধ হবে।

ফাদ্দল ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খাছআম গোত্রের জনৈকা মহিলা বললেন,'হে আল্লাহর রাসূল, আমার পিতার ওপর হজ্ব ফরজ হয়েছে, তবে তিনি অশীতিপর বৃদ্ধ এবং উটের পিঠে ঠিকমতো বসতে পারেন না। তিনি বললেন,**'তুমি তার পক্ষ থেকে হজ্ব করে দাও।'**(বর্ণনায় তিরমিযী)**কোনো ব্যক্তির পক্ষ থেকে যিনি বদলি হজ্ব করবেন তার কয়েকটি শর্ত রয়েছে:**

১- উপরোল্লিখিত হজ্বের যাবতীয় শর্ত বদলি হজ্বকারীর মধ্যেও বাস্তবায়িত থাকতে হবে।

২- বদলি হজ্বকারী এমন হতে হবে যিনি ইতঃপূর্বে নিজের হজ্ব করেছেন। যদি নিজের হজ্ব করে না থাকেন তবে বদলি হজ্ব শুদ্ধ হবে না। এমতাবস্থায় বদলি হজ্ব তার নিজের হজ্বে পরিণত হবে। এর প্রমাণ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, **'শুবরামার পক্ষ থেকে লাব্বায়েক। তিনি বললেন, শুবরামা কে? সে বলল, আমার ভাই, অথবা আমার আত্মীয়। তিনি বললেন, তুমি কি নিজের হজ্ব করেছ? সে বলল, না। তিনি বললেন, তুমি নিজের হজ্ব করো, তারপর শুবরামার পক্ষ থেকে হজ্ব করবে।'**

উমরা



উমরার হুকুম ও ফজিলত

জীবনে একবার উমরা করা ওয়াজিব। কারো কারো নিকট সুন্নত। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, , **'ইসলাম হলো তুমি এ সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। আর নামাজ কায়েম করবে, যাকাত দেবে, বায়তুল্লাহর হজ্ব করবে ও উমরা করবে, জানাবতের গোসল করবে, উজু পূর্ণাঙ্গরূপে করবে ও রমজানের রোজা রাখবে।'**(বর্ণনায় ইবনে খুযায়মা)

অন্যত্র তিনি বলেছেন, **'এক উমরা থেকে অন্য উমরা, এ দুয়ের মাঝে যা ঘটে, তার কাফফারা। আর মাবরুর হজ্বের প্রতিদান জান্নাত ব্যতীত অন্যকিছু নয়।'**

আভিধানিক অর্থে উমরা

যিয়ারত

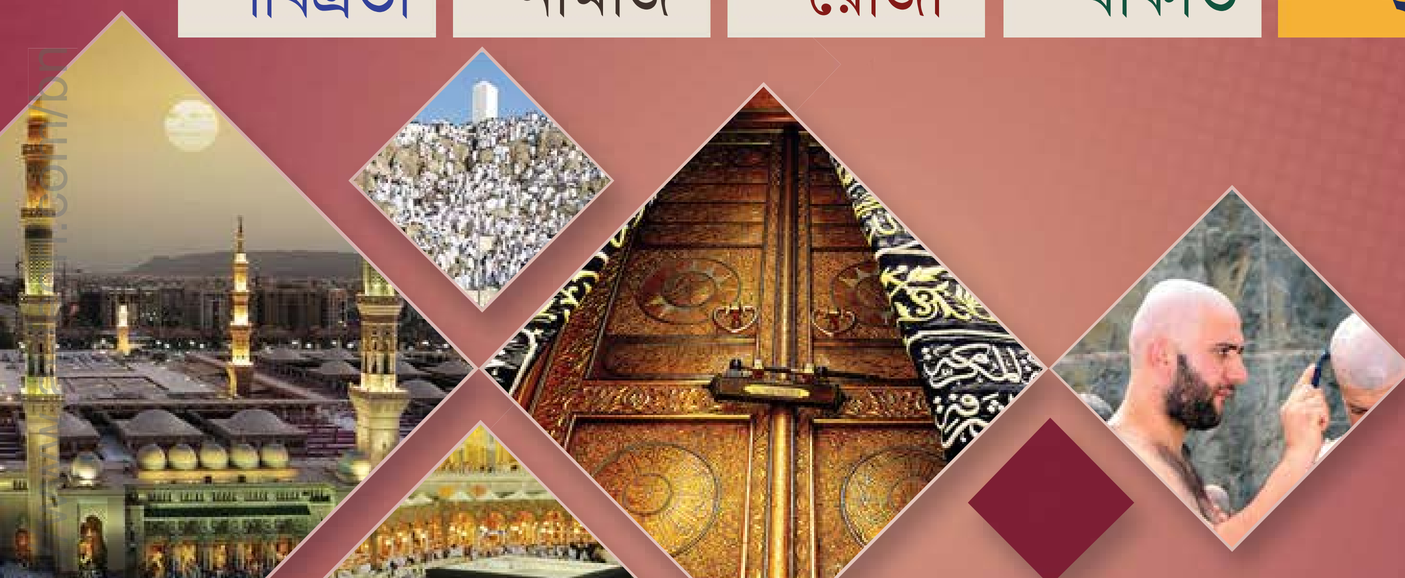
শরয়ী পরিভাষায় উমরা

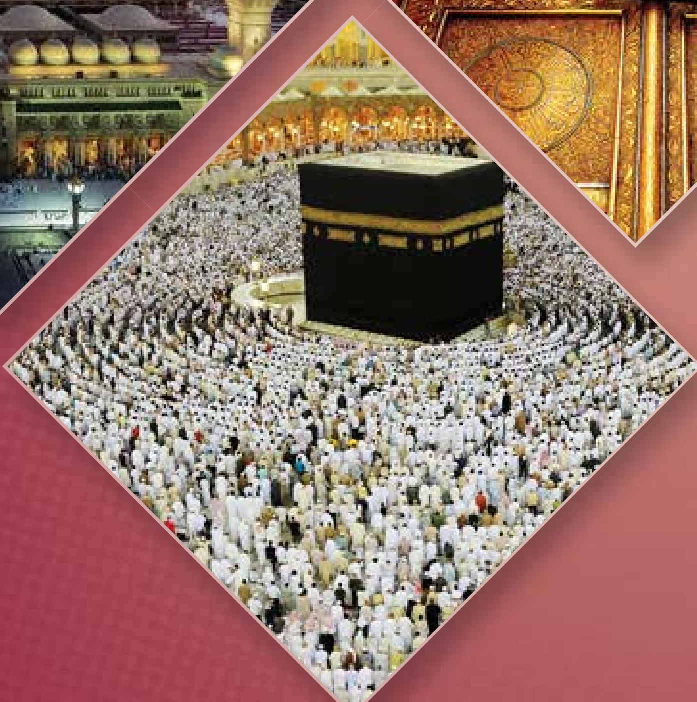
যেকোনো সময় বায়তুল্লাহ শরীফের যিয়ারত করা, বিশেষ ইবাদত আদায়ের উদ্দেশে।

আলোকচিত্রে ইবাদত

সহজ সরল উপয়ে ইসলামের বিধি-বিধান শেখা

পবিত্রতা | নামাজ | রোজা | যাকাত | হজ্ব





Dr. Abdullah Bahmmam

অনুবাদ

আবদুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান

পর্যালোচনায়

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

হজ ও ওমরার ইহরামের জন্য নির্ধারিত স্থান বা মিকাত

৩ মিকাত

সূচিপত্র

আভিধানিক অর্থে মিকাত

দুই জিনিসের মাঝে সীমানা

শরয়ী পরিভাষায় মিকাত

শরীয়ত প্রবর্তক ইবাদাতের জন্য যে স্থান ও কাল নির্ধারণ করে দিয়েছেন তাকেই মিকাত বলে।

মিকাতের প্রকারভেদ

প্রথমত: স্থান-বিষয়ক মিকাত

স্থান-বিষয়ক মিকাত

হজ্জের ইহরাম বাঁধার জন্য শরীয়ত প্রবর্তক যেসব স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছেন|

তাই যে ব্যক্তি হজ্ব অথবা উমরা করার ইচ্ছা করবে, তার জন্য ইহরাম ব্যতীত এসব স্থান অতিক্রম করা বৈধ নয়। আর মিকাত হলো পাঁচটি(শায়খ আবদুল্লাহ আল বাস্সাম, মিকাত ও তার দূরত্ব, মাজাল্লাতু মাজমাইল ফিকহ আল ইসলামি, সংখ্যা ৩, খণ্ড ৩, পৃ: ১৫৫৩)

যুলহুলাইফা:

মদীনার দক্ষিণে অবস্থিত। স্থানটি বর্তমানে আবয়ারে আলী বলে খ্যাত। মক্কা থেকে এ মিকাতের দূরত্ব প্রায় ৪২০ কি.মি.। যুলহুলাইফা মদীনাবাসী ও মদীনার দিক থেকে আসা হাজ্বীদের মিকাত|



যুলহুলাইফা

জুহফা:

রাবেগ শহরের নিকটে অবস্থিত। মক্কা থেকে এর দূরত্ব প্রায় ১৮৬ কি.মি.। এটা সিরিয়া, মিসর ও মরোক্কোসহ পশ্চিমাঞ্চল থেকে আসা হাজ্বীদের মিকাত।



জুহফা

য়ালামলাম:

ইয়েমেনবাসীর মক্কা গমনের পথে অবস্থিত এক উপত্যকা। বর্তমানে এর নাম 'আস্সা'দিয়াহ'। মক্কা থেকে এর দূরত্ব প্রায় ১২০ কি.মি.। এটা ইয়েমেনবাসীদের মিকাত।



য়ালামলাম

৪ - কারনুল মানাযেল:

বর্তমানে এর নাম 'আস্সাইলুল কাবীর'। মক্কা থেকে এর দূরত্ব প্রায় ৭৫ কি.মি.।

এটা তায়েফ ও নাজদবাসীদের মিকাত। তায়েফের পথে হাদা এর দিকে আরেকটি জায়গা রয়েছে, যার নাম ওয়াদি মুহাররাম। এ উভয়টিই নাজদবাসী এবং যারা তায়েফের পথে আসে তাদের মিকাত।



কারনুল মানাযেল

৫ - যাতু ইরক:

বর্তমানে এর নাম 'আদ্দারীবা' অথবা 'আল খারীবাত'। মক্কা থেকে এর দূরত্ব প্রায় ১০০কি.মি.। বর্তমানে তা পরিত্যাক্ত একটি জায়গা। এটা পূর্বাঞ্চলীয়, যেমন ইরাক, ইরান ও এর ওপারের দেশবাসীদের মিকাত।

মিকাত বিষয়ে ওপরে যা উল্লেখ হলো এর দলিল ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীস,**'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিকাত হিসেবে আহলে মদীনার জন্য যুলহুলাইফা, আহলে ইয়েমেনের জন্য য়ালামলাম নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেছেন,'এ মিকাতগুলো ওই এলাকাবাসী ও বহিরাগতদের যারা ওই অঞ্চল দিয়ে আসবে, হজ্ব ও উমরা আদায়ের উদ্দেশ্যে, তাদের জন্য। আর যারা এ অঞ্চলসমূহের ভিতরে থাকবে, তাদের মিকাত হলো যে জায়গা থেকে ইহরাম বাঁধবে, এমনকি মক্কাবাসী মক্কা থেকেই ইহরাম বাঁধবে।'**) বর্ণনায় বুখারী)

যাতু ইরক মিকাত হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্ধারণ করে যান নি, বরং তা নির্ধারণ করেছেন উমর রাযি.।



যাতু ইরক

দ্বিতীয়ত: কালসংক্রান্ত মিকাত

কালসংক্রান্ত মিকাত

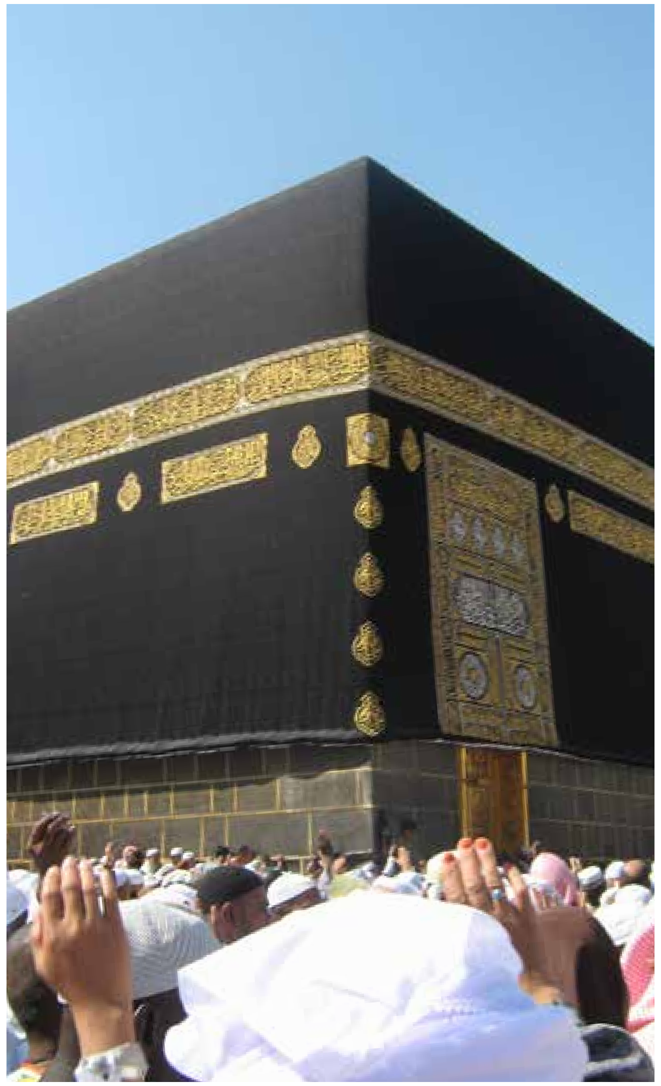
হজ্ব ও উমরা আদায়ের কাল

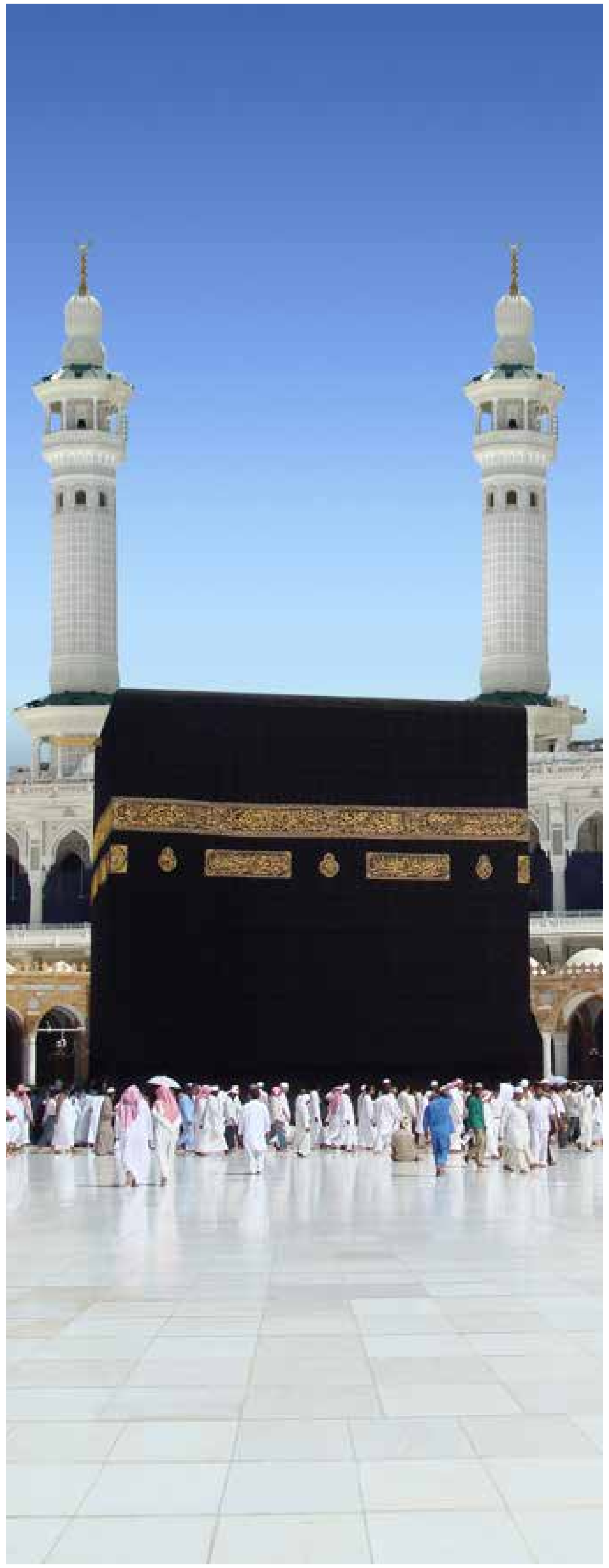
ক. হজ্বের কাল-

বিষয়ক মিকাত হলো হজ্বের মাসসমূহ। আর তা হলো, শাওয়াল, যিলকদ ও যিল হজ্ব।

খ. উমরা আদায়ের কাল-

বিষয়ক মিকাত: সারা বছর ।







আলোকচিত্রে ইবাদত

সহজ সরল উপায়ে ইসলামের বিধি-বিধান শেখা

পবিত্রতা | নামাজ | রোজা | যাকাত | হজ্ব



Dr. Abdullah Bahmmam

অনুবাদ

আবদুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান

পর্যালোচনায়

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

ইহরাম

৪ ইহরাম

আভিধানিক অর্থে ইহরাম

বারণ করা।

শরয়ী অর্থে ইহরাম

হজ্জের একটি আমলের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে হজ্বকর্মে প্রবেশের নিয়ত করা

হজ্জের একটি আমলের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে হজ্বকর্মে প্রবেশের নিয়ত করা

ইহরামের মুস্তাহাবসমূহ

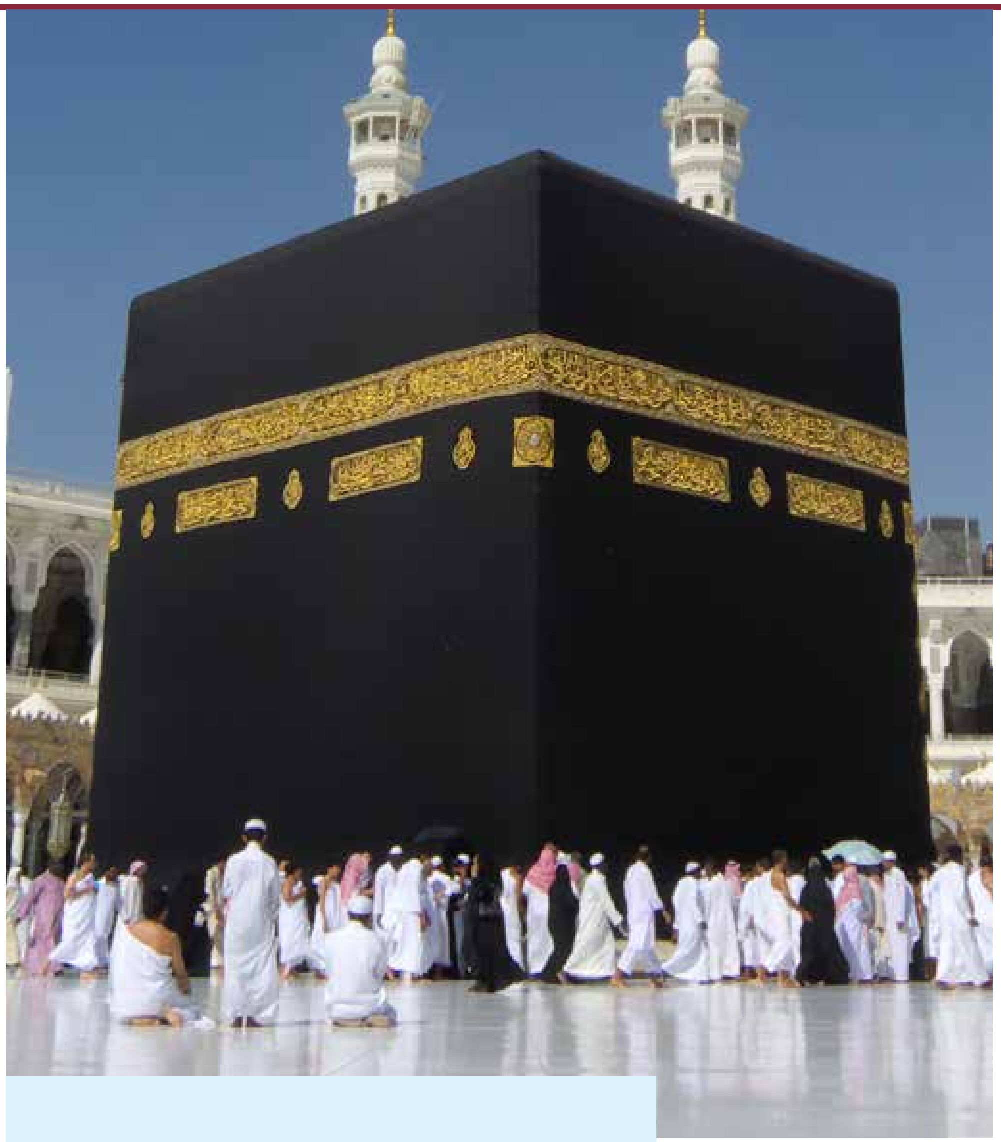
১ – গোসল করা

খারেজা ইবনে যায়েদ ইবনে ছাবিত রাযি. তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন **যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছেন ইহরামের জন্য কাপড় পরিত্যাগ করতে ও গোসল করতে।** (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)



গোসল করা

২ – পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা



সূচিপত্র

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হবে বগল ও নাভির নিচের লোম পরিষ্কার, গোফ ও নখ কর্তন ইত্যাদির মাধ্যমে।



নখ কাটা



গোফ কর্তন করা



বগলের নিচের চুল মুণ্ডানো

৪ – আতর ব্যবহার করা

আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, **'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইহরামের জন্য সুগন্ধি লাগাতাম যখন তিনি ইহরাম করতেন।'** (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম) তবে তিনি তাঁর কাপড়ে সুগন্ধি লাগাতেন না; কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,'তোমরা এমন কোনো কাপড় পরো না, যাকে জাআফরান অথবা র্ওস (একপ্রকার সুগন্ধিযুক্ত উদ্ভিদ যা আতর হিসেবে ব্যবহৃত হত) স্পর্শ করেছে।



সুগন্ধি



হজ্বে প্রবেশের নিয়তের পূর্বে পুরুষের ক্ষেত্রে সেলাই-করা কাপড় পরিত্যাগ করতে হবে এবং সেলাইবিহীন একটি লুঙ্গি ও চাদর এবং পায়ে স্যান্ডেল পরিধান করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,‘তোমরা একটি (সেলাইবিহীন) লুঙ্গি ও একটি চাদর ও একজোড়া স্যান্ডেল পরিধান করবে। স্যান্ডেল না পাওয়া গেলে চামড়ার মোজা পরে নেবে এবং তা কেটে নেবে, যাতে তা টাখনু পর্যন্ত বনে যায়।

পক্ষান্তরে নারী যেকোনো পোশাকে ইহরাম বাঁধতে পারবে। নারীর জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো রঙের পোশাক পরিধানের বাধ্যবাধকতা নেই। তবে নারীকে পুরুষের সাদৃশ্য অর্জন ও সৌন্দর্যখচিত পোশাক পরিহার করতে হবে। ইহরাম অবস্থায় নারী নেকাব ও হাতমোজাও পরিধান করবে না।



মুহরিম ব্যক্তির লুঙ্গি ও চাদর



মুহরিম ব্যক্তির স্যান্ডেল



ইহরাম অবস্থায় নারীর হাতমোজা



ইহরাম অবস্থায় নারীর নেকাব

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ

৩- এমন কোনো কাপড় দিয়ে পুরুষের মাথা ঢেকে রাখা যা মাথার সাথে লেগে থাকে

ইবনে উমর রাযি. বলেন, এক ব্যক্তি বলল: হে আল্লাহর রাসূল, মুহরিম কি পোশাক পরবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,‘জামা পরিধান করো না, পাগড়ীও না, পাজামাও না, জামার উপরিভাগে প্রলম্বিত মাথা ঢাকার বস্ত্রও না।(বুরনুস) (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

মৃত এক মুহরিম ব্যক্তির ব্যাপারে তিনি বলেছেন: ‘তোমরা তার মাথা ঢেকো না; কেননা সে কেয়ামতের দিন তালবিয়ারত অবস্থায় উত্থিত হবে।’(বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম))

আর যদি মাথার সাথে যুক্ত না থাকে, যেমন ছাতা, তাবু অথবা বাড়ি - গাড়ীর ছাদ তবে এতে কোনো সমস্যা হবে না।



মুহরিম ব্যক্তির টুপি পরিধান



মুহরিম ব্যক্তির লুঙ্গি ও চাদর



মুহরিম ব্যক্তির পাজামা পরিধান



মুহরিম ব্যক্তির ছাতা ব্যবহার

৪- পুরুষের ক্ষেত্রে সেলাই-করা পোশাক পরা

সেলাই করা পোশাক অর্থ এমন পোশাক যা মানুষের শরীরের মাপে অথবা কোনো অঙ্গের মাপে সেলাই করে তৈরি করা হয়েছে, যেমন স্বাভাবিক পরিধানের পোশাক, প্যান্ট-পাজামা, জামা, চামড়ার মোজা, কাপড়ের মোজা, হাত মোজা ইত্যাদি। এর দলিল উপরোল্লিখিত হাদীস: **'জামা পরিধান করো না, পাগরিও না, পাজামাও না, জামার উপরিভাগে প্রলম্বিত মাথা ঢাকার বস্ত্রও না।'** (বর্ণনায় বুখারী)

যদি ইহরামকারী সেলাইবিহীন লুঙ্গি না পায় তবে পাওয়ার আগ পর্যন্ত পাজামা পরিধান করতে পারবে। আর যদি স্যান্ডেল না পায়, তবে চামড়ার মোজা পরিধান করতে পারবে। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, **'তোমরা একটি (সেলাইবিহীন) লুঙ্গি ও একটি চাদর ও একজোড়া স্যান্ডেল পরিধান করবে। স্যান্ডেল না পাওয়া গেলে চামড়ার মোজা পরে নেবে এবং তা কেটে নেবে, যাতে তা টাখনু পর্যন্ত বনে যায়।'** (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)



মুহরিম ব্যক্তির সেলাই করা পোশাক পরিধান



জুতা



বুরনুস



মুহরিম ব্যক্তির চামড়ার মোজা ব্যবহার

৬- স্থলজ শিকার-জন্তু হত্যা করা বা শিকার করা

আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾ (হেমুমিনগণ,ইহরামেথাকাঅবস্থায় তোমরা শিকারকে হত্যা করো না) [সূরা আল মায়েদা:৯৫] অর্থাৎ তোমরা হজ্ব ও উমরার ইহরামরত অবস্থায় শিকার-জন্তু হত্যা করো না।

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন:

﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ (আরস্থলেরশিকারতোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে যতক্ষণ তোমরা ইহরাম অবস্থায় থাক।) [সূরা আল মায়েদা:৯৬]

স্থলজ শিকারের অর্থ হালাল বন্যপ্রাণী অথবা পাখি।

অবশ্য পোষাপ্রাণী ও পাখি যেমন মুরগি, গবাদিপশু ইত্যাদি শিকার হিসেবে গণ্য নয়। তাই এগুলো মুহরিমের জন্য যবেহ করা বৈধ। সাগরের জীব-জন্তু শিকার করাও মুহরিমের জন্য বৈধ। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ [المائدة:96]

(তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে সমুদ্রের শিকার ও তার খাদ্য।) [সূরা আল মায়েদা:৯৬]

আর যেসব জন্তু খাওয়া হারাম, যেমন সাপ বিচ্ছু ইত্যাদি, সেগুলো হত্যা করা বৈধ। উপরন্তু মুহরিমের প্রতি যদি কোনো প্রাণী আক্রমণ চালায় তবে তাকেও হত্যা করা বৈধ।



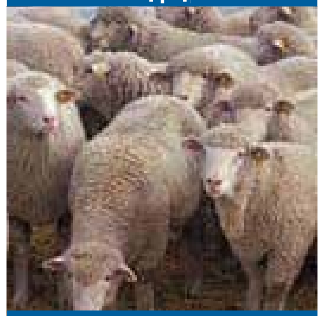
বিচ্ছু



সাপ



সাগরের প্রাণী শিকার মুহরিমের জন্য বৈধ



গবাদিপশু যবেহ করা বৈধ



মুহরিম ব্যক্তির স্থলজ পাখি শিকার করা

৭-বিবাহের আক্দ করা

উসমান রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: **'মুহরিম ব্যক্তি বিবাহ করবে না, বিবাহ দেবেও না, এমনকি বিবাহের প্রস্তাবও দেবে না।'** (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

৮ - স্বামী-স্ত্রীর মিলন

আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقره:197]

(অতএব এই মাসসমূহে যে নিজের উপর হজ আরোপ করে নিল, তার জন্য হজে রাফাস ও পাপ কাজ এবং ঝগড়া-বিবাদ বৈধ নয়।) [সূরা আল বাকারা:১৯৭] রাফাস শব্দের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন যে তা হলো জিমা বা সঙ্গম। আর এ বিষয়টি হলো ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের মধ্যে সমধিক কঠিন নিষিদ্ধ বিষয়।

৯- মিলন ব্যতীত অন্যকোনো যৌনস্পর্শ

যেমন চুম্বন, স্পর্শ ইত্যাদি; কেননা তা হারাম মিলনের উসিলা।

ইহরাম অবস্থায় নারীর জন্য যা নিষিদ্ধ

নারী ইহরামের নিষিদ্ধ বিষয়ের ক্ষেত্রে পুরুষের মতোই। তবে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহে নারী পুরুষ থেকে ভিন্ন।

১- নারী সেলাই করা পোশাক পরতে পারবে।

১- নারী সেলাই করা পোশাক পরতে পারবে।

৩- নারী নেকাব ও হাত মোজা পরবে না; কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, **‘মুহরিমা নারী নেকাব পরবে না এবং হাতমোজাও পরবে না।’** (বর্ণনায় বুখারী)

তবে আজনবী পুরুষের মুখোমুখি হলে নারী তার চেহারা নেকাব ব্যতীত অন্যকিছু দিয়ে ঢেকে নেবে, যেমন মাথা থেকে কাপড় ঝুলিয়ে দেবে। নারীর জন্য স্বর্ণের অলংকার ব্যবহারও বৈধ রয়েছে।

কিছু দিকনির্দেশনা

১ - ইহরামের দু রাকাত সুন্নত নামাজ বলতে কিছু নেই। তবে যদি ফরজ নামাজ অথবা তাইহিয়াতুল উজুর পর ইহরামের নিয়ত করে তবে শরিয়তসিদ্ধ হবে। ইহরাম বাঁধার সময় বিশেষ কোনো দুআর কথাও শরীয়তে আসেনি।

২ - যদি মুসাফির বিমানে সফর করে এবং মিকাতে পৌঁছুলে ইহরাম পরতে সক্ষম হবে না বলে আশঙ্কা হয়, তাহলে বাসা থেকে অথবা বিমানবন্দর থেকে ইহরামের কাপড় পরে বিমানে উঠবে। এরপর যখন মিকাতের নিকটবর্তী হবে তখন নিয়ত করে নেবে। নিয়ত করার পূর্বে শুধু ইহরামের কাপড় পরলেই মুহরিম হিসেবে ধরা হবে না।

৩ - হাজ্বীদের মধ্যে এমনও রয়েছেন যারা ইহরাম পরার পরপরই তাদের ডান কাঁধ উন্মুক্ত করে রাখে। এ প্রক্রিয়ার নাম হলো ইযতিবা যা কেবল মক্কায় পৌঁছে তাওয়াফে কুদুমের সময় করতে হয়। পক্ষান্তরে অন্যসময় উভয় কাঁধ ঢেকে রাখতে হয়। তাই ইহরাম বাঁধার পরপরই ডান কাঁধ খুলে রাখা শুদ্ধ নয়

।

নিয়তে শর্ত করা

যার কোনো রোগ রয়েছে, অথবা এমন কোনো ঘটনার আশঙ্কা করে যা তার হজ্বকর্ম বিঘ্নিত করবে, তবে এরূপ ব্যক্তির ক্ষেত্রে মুস্তাহাব হলো হইরামের সময় শর্ত করে নিয়ে বলা,‘হে আল্লাহ, আমি উমরা (অথবা হজ্বের জন্য) আপনার আহবানে সাড়া দিয়েছি। তবে যদি কোনোকিছু আমাকে আটকে দেয়, তাহলে আমাকে যেখানে আটকে দেবেন সেটাই হবে আমার হালাল হয়ে যাওয়ার জায়গা। আয়েশা রাযি. বলেন,‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুবাআ বিনতে যুবাইর এর কাছে গেলেন। তিনি তাকে বললেন,‘তুমি সম্ভবত হজ্বের ইচ্ছা করেছ? তিনি বললেন, ‘আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি নিজেকে অসুস্থ পাচ্ছি।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, ‘তুমি হজ্ব করো ও শর্ত করে নাও এবং বলো, ‘হে আল্লাহ, আমার হালাল হওয়ার জায়গা সেটা যেখানে আপনি আমাকে আটকে দেবেন।’ কেউ যদি এরূপ বলে নেয় এবং পরবর্তীতে এমন বিষয়ের মুখোমুখি হয় যা তার হজ্বযাত্রা বাধাগ্রস্ত করে, তাহলে দম ইত্যাদি ছাড়াই সে ইহরামমুক্ত হতে পারবে।

ইহরামের কিছু আহকাম

অজু অথবা গোসলের সময় মুহরিমের মাথা থেকে যদি গুটিকতক চুল পড়ে যায়, তবে এতে কোনো ক্ষতি নেই। তদ্রূপভাবে যদি দাঁড়ি-গোফ অথবা নখ থেকে কোনোকিছু পড়ে যায় তবে এতেও কোনো ক্ষতি হবে না, যদি মুহরিম ব্যক্তি স্বেচ্ছায় তা করে না থাকে। আর এ ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারী উভয়েই সমান। অতএব নারীর কোনো চুল অথবা নখের কোনো অংশ পড়ে গেলেও তাতে কোনো ক্ষতি হবে না।

মুহরিমব্যক্তি কোমরে কোনোকিছু বাঁধতে পারবে যদি প্রয়োজন মনে করে।

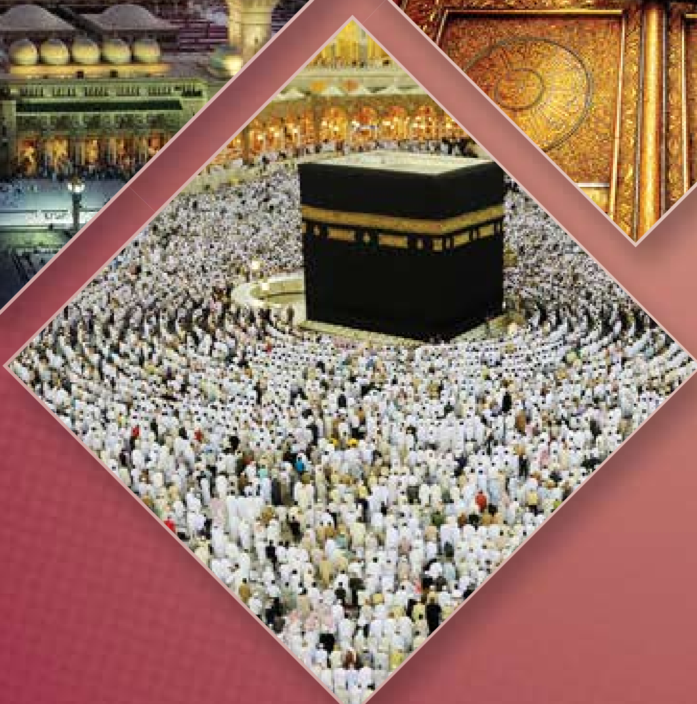


আলোকচিত্রে ইবাদত

সহজ সরল উপয়ে ইসলামের বিধি-বিধান শেখা

পবিত্রতা | নামাজ | রোজা | যাকাত | হজ্ব




Dr. Abdullah Bah mmam

অনুবাদ

আবদুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান

পর্যালোচনায়

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

হজ ও ওমরাহ করার নিয়ম

৫ নুসুক ও তালবিয়া

নুসুক

আভিধানিক অর্থে নুসুক

দুনিয়া-বিমুখিতা ও ইবাদত-বন্দেগী

শরয়ী পরিভাষায় নুসুক

হজ্ব ও উমরাকারী যা বলে ও করে

হজ্ব অথবা উমরার নিয়ত

যখন ইহরাম বাঁধতে ইচ্ছুক ব্যক্তি গোসল ও পরিচ্ছন্নতা অর্জন থেকে ফারেগ হবে এবং সেলাইযুক্ত পোশাক পরিত্যাগ করে ইহরামের কাপড় পরে নেবে, তখন সে হজ্ব অথবা উমরায় প্রবেশের নিয়ত করবে। এ সময় সে যে ধরনের হজ্বের নিয়ত করবে, তা মুখে উচ্চারণ করে বলবে। যেমন প্রথমে উমরা এবং পরে তামাত্তুকারী হিসেবে হজ্ব করার ইচ্ছা করলে বলবে: لبيك اللهم عمرة متمتعاً بها إلى الحج (হে আল্লাহ, আমি উমরার নিয়তে হাজির, যার দ্বারা আমি হজ্ব পর্যন্ত তামাত্তুকারী হব।) অথবা বলবে: لبيك اللهم عمرة (হে আল্লাহ, আমি উমরার নিয়তে হাজির।) এরপর হজ্বের সময় বলবে لبيك اللهم حجاً (হে আল্লাহ, আমি হজ্বের নিয়তে হাজির।) আর ইফরাদ হজ্বকারী বলবে: لبيك اللهم حجاً (হে আল্লাহ, আমি হজ্বের নিয়তে হাজির।) আর কেরান হজ্বকারী বলবে: لبَّيك عُمرةً وحَجًّا হে আল্লাহ, আমি উমরা ও হজ্বের নিয়তে হাজির। এর প্রমাণ আনাস রাযি. এর বর্ণনা,'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, ' لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا' হে আল্লাহ, আমি উমরা ও হজ্বের নিয়তে হাজির।'

হজ্বের প্রকারভেদ

১ - তামাত্তু: আর তা হলো হজের মাসসমূহে উমরার উদ্দেশে ইহরাম বাঁধবে, অতঃপর উমরা আদায় করে শেষ করবে ও হালাল হয়ে যাবে। এরপর একই বছর হজ্বের নিয়ত করবে।

২ - কেরান: কেরান হলো হজ্ব ও উমরা উভয়টার জন্য একসাথে নিয়ত করা।

৩ - ইফরাদ হজ্ব হলো উমরা ব্যতীত শুধু হজ্বের নিয়ত করা।

সর্বোত্তম নুসুক

যে ব্যক্তি হাদী নিয়ে এসেছে, তার জন্য সর্বোত্তম নুসুক হলো কিরান, এরপর তামাত্তু এরপর ইফরাদ। আর যে হাদী নিয়ে আসেনি, তার জন্য উত্তম নুসুক হলো তামাত্তু, এরপর কিরান, এরপর ইফরাদ।



সূচিপত্র

তিন প্রকার নুসুকের মধ্যে পার্থক্য।

	তামাত্তু	কেরান	ইফরা`
বর্ণনা	প্রথমে উমরা, এরপর হজ্ব	উমরা ও হজ্ব	শুধু হজ্ব
ইহরাম	তামাত্তুকারীকে দুইবার ইহরাম বাঁধতে হয়। প্রথমে উমরার জন্য । এরপর উমরা আদায় করে হালাল হয়ে গেলে পরবর্তীতে হজ্বের জন্য।	হজ্ব ও উমরা উভয়টার নিয়তে একবার ইহরাম বাঁধবে	শুধু হজ্বের নিয়তে একবার ইহরাম বাঁধবে
তালবিয়া	প্রথম ইহরামের সময় বলবে, 'لبيك عمرة' হে আল্লাহ, আমি উমরার নিয়তে হাজির। এরপর হজ্বের ইহরামের সময় বলবে, 'لبيك حجاً' (হে আল্লাহ, আমি হজ্বের নিয়তে হাজির।) অথবা বলবে, لبيك عمرة متمتعاً بها إلى الحج ' হে আল্লাহ আমি উমরার নিয়তে হাজির যার দ্বারা আমি তামাত্তু হজ্ব করব'।	ইহরামের বলবে, لبيك عمرة وحجاً (হে আল্লাহ, আমি উমরা ও হজ্বের নিয়তে হাজির)।	ইহরামের সময় বলবে: (لبيك حجا) হে আল্লাহ, আমি হজ্বের নিয়তে হাজির)।
হাদী (কুরবানী)	এতে হাদী (কুরবানী) ওয়াজিব হবে	এতে হাদী (কুরবানী) ওয়াজিব হবে	এতে হাদী (কুরবানী) ওয়াজিব হবে না
তাওয়াফ	এতে দুটি তাওয়াফ রয়েছে	এতে একটি আবশ্যক তাওয়াফ রয়েছে আর তা হলো হজ্বের তাওয়াফ	এতে একটি তাওয়াফ আবশ্যক তাওয়াফ রয়েছে আর তা হলো হজ্বের তাওয়াফ
সায়ী	এতে দুটি সায়ী রয়েছে,	এতে মাত্র একটি সায়ী রয়েছে, আর তা হলো হজ্বের সায়ী।	এতে মাত্র একটি সায়ী রয়েছে আর তা হলো হজ্বের সায়ী

তালবিয়া

তালবিয়া

মুহরিমের কথা,‘ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ ‘আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির। আপনার কোনো শরীক নেই। নিশ্চয়ই প্রশংসা ও নেয়ামত আপনার এবং রাজত্বও, আপনার কোনো শরীক নেই।

এর প্রমাণ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীস যেখানে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তালবিয়াকে উল্লিখিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

আর لبيك اللهم لبيك এর অর্থ (আপনার আহবানে) জওয়াবের পর জওয়াব।

তালবিয়াতে রয়েছে আল্লাহর প্রশংসা ও শুকরিয়া, আল্লাহার আহবানে সাড়াদান, আল্লাহর একত্ববাদের প্রকাশ এবং শিরক থেকে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা।

তালবিয়ার হুকুম

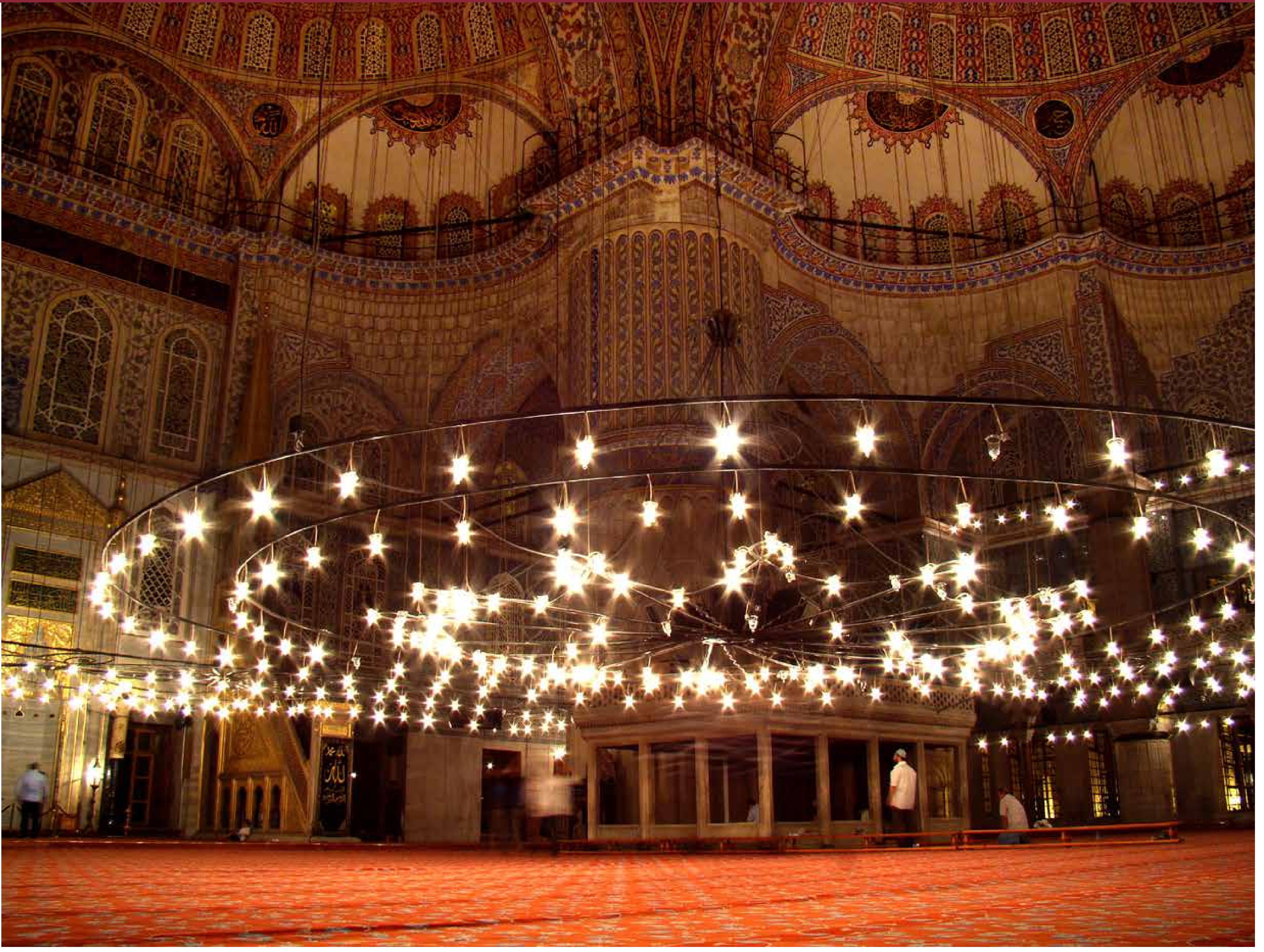
তালবিয়া পড়া সুন্নত। পুরুষের ক্ষেত্রে উঁচু স্বরে এবং নারীর ক্ষেত্রে ফিতনা থেকে বেঁচে থাকার জন্য নিচু স্বরে তালবিয়া পাঠ করা বাঞ্ছনীয়।

তালবিয়ার সময় ও স্থল

ইহরামের মাধ্যমে হজ্বকর্মে প্রবেশের পর মুহরিম ব্যক্তি তালবিয়া পাঠ শুরু করবে। হজ্বে গমনের পথে তা বেশি বেশি পড়বে। আর নিম্নবর্তী জায়গাসমূহে তা অধিক গুরুত্বসহ পড়বে:

উঁচুতে আরোহণের সময়, নিচুতে নামার সময়, ফরজ নামাজ শেষে, যখন দিন অথবা রাতের আগমন ঘটে।

উমরার ক্ষেত্রে তালবিয়া বন্ধ হবে যখন বায়তুল্লাহ দেখবে ও উমরার তাওয়াফ শুরুর উদ্দেশে হাজরে আসওয়াদ ইস্তিলাম করবে। আর হজ্বের ক্ষেত্রে যখন দশ যিলহজ্ব বড় জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ শুরু করবে।



আলোকচিত্রে ইবাদত

সহজ সরল উপয়ে ইসলামের বিধি-বিধান শেখা

পবিত্রতা | নামাজ | রোজা | যাকাত | হজ্ব





Dr. Abdullah Bahmmam

অনুবাদ

আবদুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান

পর্যালোচনার

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

হজ্ব ও উমরার বর্ণনা



হজ্ব ও উমরার বর্ণনা

সূচিপত্র

হজ্বের বর্ণনা

হজ্বের কাজসমূহ যিলহজ্বের আট তারিখ থেকে শুরু করতে হবে। আর তা হবে নিম্নবর্ণিতভাবে:

যিলহজ্বের আট তারিখ (য়াউমুত তারবিয়া)

১ - হাজ্বী যে স্থানে অবস্থান করছে সে স্থান থেকেই ইহরাম বাঁধবে, অতঃপর গোসল করবে, আতর লাগাবে, ইহরামের কাপড় পরিধান করবে এবং বলবে:

لبيك اللهم حجاً، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك

'হে আল্লাহ, হজ্ব আদায়ের জন্য আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির। আপনার কোনো শরিক নেই। নিশ্চয়ই প্রশংসা ও নেয়ামত আপনার এবং রাজত্বও, আপনার কোনো শরিক নেই।


ইহরাম


সুগন্ধি


গোসল করা


মিনা

যিলহজ্বের নয় তারিখ (আরাফা দিবস)

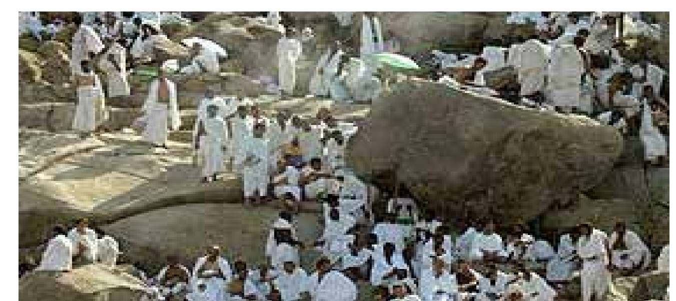
১ - সূর্যোদয়ের পর হাজ্বী আরাফার উদ্দেশে রওয়ানা হবে। আরাফায় গিয়ে যোহর ও আসর- যোহরের সময়- একত্রে কসর করে পড়বে। আর যদি সম্ভব হয় তাহলে সূর্য ঢলে যাওয়ার পূর্বে নামিরায় অবস্থান নেবে|

২ - নামাজের পর যিকর ও দুআর জন্য ফারেগ হয়ে যাবে। কিবলামুখী হয়ে হাত উঠিয়ে দুআ করবে। সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফার ময়দানেই অবস্থান করবে|

৩ - সূর্যাস্ত সম্পন্ন হলে মুযদালিফার দিকে রওয়ানা হবে। মুযদালিফায় গিয়ে মাগরিব ও এশা একসাথে আদায় করবে। এশার নামাজ কসর করে দু রাকাত আদায় করবে। মুযদালিফায় রাতযাপন করবে। সূর্যোদয়ের কিছুসময় পূর্ব পর্যন্ত মুযদালিফাতেই অবস্থান করবে।


মুযদালিফা


নামিরা


আরাফাত



১০ যিলহজ্ব

১ - ফজরের নামাজ পড়বে, অতঃপর যিকর ও দুআয় সূর্যোদয়ের কিছু সময় পূর্ব পর্যন্ত মশগুল থাকবে।

২ - সূর্যোদয়ের পূর্বেই মিনার দিকে রওয়ানা হবে।

৩ - মিনায় পৌঁছার পর জামরায়ে আকাবা তথা বড় জামরায় যাবে। বড় জামরাকে লক্ষ্য করে সাতটি কঙ্কর মারবে। একটির পর একটি বিরতিহীনভাবে মারবে। প্রতিটি কঙ্করের সাথে তাকবির দেবে|

৪ - হাদী যবেহ করবে যদি হাদী যবেহ করা আবশ্যক হয়ে থাকে।

৫ - মাথার চুল মুণ্ডাবে অথবা ছোট করবে। এ সবের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে নিষেধাজ্ঞামুক্ত হয়ে যাবে, অতঃপর স্বাভাবিক কাপড় পরিধান করবে, সুগন্ধি ব্যবহার করবে। এ সময় থেকে স্বামীস্ত্রীর মিলন ব্যতীত ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ অন্যসব বিষয় হালাল হয়ে যাবে।

৬ - এরপর মক্কায় ফিরে যাবে ও তাওয়াফে ইফাযা তথা হজ্বের ফরজ তাওয়াফ সম্পন্ন করবে। তামাত্তু হজ্বকারী হলে সাফা-মারওয়ার সায়ীও করবে। তামাত্তু হজ্বকারী না হলেও সাফা-মারওয়ার সায়ী করবে যদি তাওয়াফে কুদূমের সাথে সায়ী করে না থাকে। এর মাধ্যমে হাজ্বী পূর্ণাঙ্গরূপে নিষেধাজ্ঞামুক্ত হয়ে যাবে। এখন থেকে তার জন্য ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ সকল বিষয় হালাল হয়ে যাবে।

৭ - এরপর মিনায় ফিরে আসবে এবং সেখানে রাতযাপন করবে।



বড় জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ



হাদী যবেহ করা



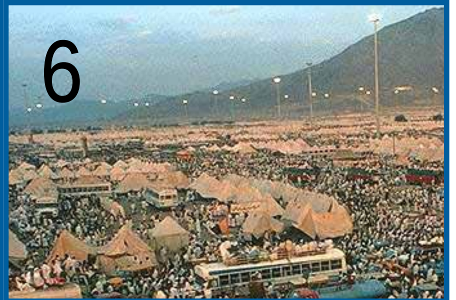
মাথা মুণ্ডানো অথবা চুল ছোট করা



তাওয়াফ করা



সাফা-মারওয়ার সায়ী



মিনায় রাতযাপন

এগারো যিলহজ্ব (আইয়ামে তাশরীকের প্রথম দিন)

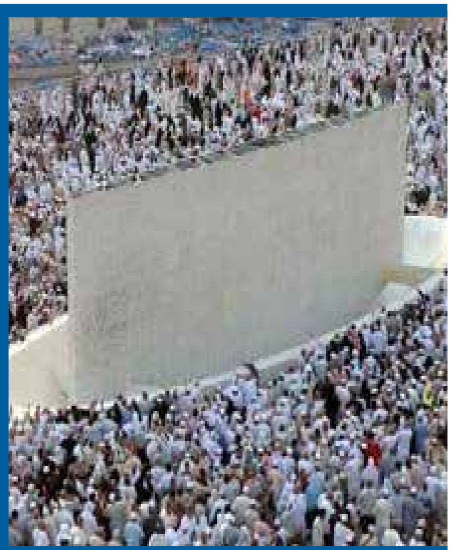
১ - তিন জামরার প্রতিটিতে কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। প্রতি জামরায় সাতটি কঙ্কর বিরামহীনভাবে মারবে এবং প্রতি কঙ্করের সাথে তাকবির দেবে। সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে যাওয়ার পর অর্থাৎ যোহরের সময় কঙ্কর মারবে। এর পূর্বে কঙ্কর মারলে তা জায়েয হবে না। প্রথম ও মধ্য-জামরায় কঙ্কর মারার পর দুআ করবে।

ফিকাহবিদদের কেউ কেউ কঙ্করের আকৃতি নির্ধারণ করে বলেছেন, যে তা চনাবুটের চেয়ে একটি বড় ও আখরুট থেকে একটু ছোট।

২ - মিনায় রাতযাপন করবে


প্রথম জামরা


জামরাতুল আকাবা বা বড়-জামরা


মধ্য-জামরা

বারো যিলহজ্ব (আইয়ামে তাশরীকের দ্বিতীয় দিন)

1. এর পূর্বের দিন যেভাবে কঙ্কর মেরেছে ঠিক সেভাবেই তিন জামরায় কঙ্কর মারবে।
2. যদি দ্রুত মিনা ত্যাগ অর্থাৎ বারো তারিখেই মিনা ত্যাগের ইচ্ছা থাকে তাহলে আজই সূর্যাস্তের পূর্বে মিনা থেকে বের হয়ে যেতে হবে। আর যদি তেরো তারিখেও কঙ্কর মারার ইচ্ছা থাকে তবে বারো তারিখ দিবাগত রাত মিনাতেই যাপন করতে হবে।
3. বিদায়ী তাওয়াফের জন্য মক্কায় যাবে যদি মক্কা ছেড়ে যাওয়ার পরিকল্পনা থাকে।

তেরো যিলহজ্ব (আইয়ামে তাশরীকের শেষ দিন)

এ দিনটি, দেরি করে মিনা পরিত্যাগকারীর জন্য সুনির্দিষ্ট। এ দিনে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো করবে:

১ - তিন জামরায় এর পূর্বের দুইদিনের মতোই কঙ্কর মারবে।

২- মিনা থেকে বের হয়ে যাবে এবং মক্কা ছেড়ে যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে বিদায়ী তাওয়াফ করবে।

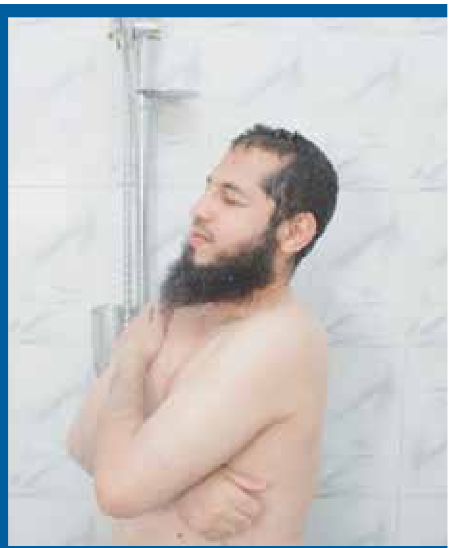
এর মাধ্যমে হজ্বকর্মের সবগুলোই সম্পন্ন হয়ে যাবে।

উমরার বর্ণনা

১- উমরাকারী যখন মিকাতে পৌঁছবে, সে গোসল করবে, আতর লাগাবে, ইহরামের উত্তম কাপড় পরিধান করবে এবং উমরার নিয়ত করবে এবং বলবে: (হে আল্লাহ আমি উমরার জন্য হাজির)


ইহরাম


সুগন্ধি


সুগন্ধি

তালবিয়া পাঠ আরম্ভ করবে ও বলবে:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ

'আমি হাজির হে আল্লাহ, আমি হাজির, আমি হাজির। আপনার কোনো শরিক নেই। নিশ্চয়ই প্রশংসা ও নেয়ামত আপনার এবং রাজত্বও, আপনার কোনো শরিক নেই।'

যতক্ষণ বায়তুল্লাহ না দেখবে ও হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ অব্যাহত রাখবে।

৩- মসজিদে প্রবেশের দুআ পড়ে ডান পা দিয়ে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে।

৪ - তালবিয়া বন্ধ করে দেবে এবং কাবাঘরের তাওয়াফ শুরু করবে। হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ অথবা চুম্বন - যদি সম্ভব হয়- অথবা হাজরে আসওয়াদের দিকে ইশারা করবে ও বলবে:

بسم الله والله أكبر، اللهم إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعاً لسنة نبيك محمد

(আল্লাহর নামে শুরু করছি। আর আল্লাহ সবথেকে বড়। হে আল্লাহ আপনার প্রতি ঈমান রেখে, আপনার কিতাবের প্রতি বিশ্বাস রেখে, আপনার সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে এবং নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নতের অনুসরণে।)

- কাবাঘরকে নিজের বামদিকে রেখে সাতবার তাওয়াফ করবে। হাজরে আসওয়াদ থেকে শুরু করবে ও হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত এসে শেষ করবে।

- পুরুষের জন্য প্রথম তিন চক্করে রমল তথা দ্রুত চলা সুন্নত।

- তাওয়াফ কালে নিজের ইচ্ছামতো দুআ করবে। যখন রুকনে য়্যামানীর বরাবর পৌঁছবে তা স্পর্শ করবে ও তাকবির দেবে। আর যদি স্পর্শ করতে না পারে তবে হাতে ইশারা করবে না, তাকবিরও দেবে না। রুকনে য়্যামানী ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যমর্তী স্থানে বলবে: ربنا آتنا في الدنيا حسنةً، وفي الآخرة حسنةً، وقنا عذاب النار (হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন। আর আখিরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন।)

- তাওয়াফের পর মাকামে ইবরাহীমের পেছনে - যদি সম্ভব হয়- দু রাকাত নামাজ পড়বে। আর সম্ভব না হলে মসজিদুল হারামের যেকোনো স্থানে পড়ে নেবে।

- এরপর সাফা পাহাড়ের দিকে যাবে। সাফা পাহাড়ের নিকটবর্তী হলে কুরআনুল কারীমের এ আয়াতটি পড়বে:

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾

(নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে বাইতুল্লাহর হজ্জ করবে কিংবা উমরা করবে তার কোনো অপরাধ হবে না যে, সে এগুলোর তাওয়াফ করবে। আর যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কল্যাণ করবে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ ভালো কাজের পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ।) [সূরা আল বাকারা:১৫৮]

- সাফা পাহাড়ে ওঠবে। কিবলামুখি হবে। দু হাত ওঠাবে। তাকবির দেবে ও আল্লাহর প্রশংসা করবে। বলবে,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،Ô آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

(আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। রাজত্ব তাঁরই। প্রশংসাও তাঁর। তিনি জীবন ও মৃত্যু দেন এবং সকল বিষয়ের ওপর তিনি ক্ষমতাবান। আমরা গুনাহ থেকে প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী, ইবাদতকারী, আমাদের রবের সম্মুখে সিজদাকারী ও তাঁর প্রশংসাকারী। আল্লাহ তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন ও তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই শত্রুদেরকে পরাজিত করেছেন।)

এরপর নিজের প্রার্থনা আল্লাহর কাছে ব্যক্ত করবে। এরপর উল্লিখিত দুআটি দ্বিতীয়বারের মতো পড়বে। এরপর আবার নিজের প্রার্থনা আল্লাহর কাছে ব্যক্ত করবে ও তৃতীয়বারের মতো উল্লিখিত দুআটি পড়বে।

১১ - সাফা থেকে নেমে মাওরয়ার পথে রওয়ানা হবে। দুই সবুজচিহ্নের মাঝে দ্রুতপদে ধাবমান হবে। মারওয়ায় ওঠবে এবং সাফায় যেভাবে দুআ প্রার্থনা করেছে, একইরূপে মারওয়াতেও করবে।

১১- সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাতবার সায়ী করবে।

১২- সায়ী করার পর পুরুষ তার মাথার চুল ছোট করবে। এমনভাবে চুল ছোট করবে যে সমগ্র মাথা থেকেই চুল ছোট করা হয়েছে বিষয়টি যেন পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়। নারীরা সমগ্র মাথার চুল একত্রে ধরে হস্তাঙ্গুলির মাথা পরিমাণ কেটে ফেলবে।

পুরুষের ক্ষেত্রে মাথার চুল মুণ্ডন করা উত্তম। আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: **'হে আল্লাহ, আপনি মাথা মুণ্ডনকারীদেরকে ক্ষমা করে দিন। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আর চুল ছোটকারীদের জন্যে? তিনি বললেন,'হে আল্লাহ, আপনি মাথা মুণ্ডনকারীদেরকে ক্ষমা করে দিন। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আর চুল ছোটকারীদের জন্যে? এভাবে তিনি তিনবার বললেন। এরপর বললেন, 'চুল ছোটকারীদেরকেও ক্ষমা করে দিন।'**

১৪ - এরপর ইহরাম থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উমরার যাবতীয় কর্ম সম্পন্ন হয়ে যাবে।



সাফা-মারওয়ার সায়ী



আলোকচিত্রে ইবাদত

সহজ সরল উপয়ে ইসলামের বিধি-বিধান শেখা

পবিত্রতা	নামাজ	রোজা	যাকাত	হজ্ব



Dr. Abdullah Bahmmam

অনুবাদ

আবদুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান

পর্যালোচনার

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

হজের রুকন, ওয়াজিব ও সুন্নতসমূহ

হজ্বের রুকন, ওয়াজিব ও সুন্নতসমূহ



সূচিপত্র

হজ্বের রুকনসমূহ

1. ইহরাম অর্থাৎ হজ্বকর্মে প্রবেশের নিয়ত। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, **'নিশ্চয় আমলের নির্ভরতা নিয়তের ওপর। আর প্রতি ব্যক্তির ভাগে তাই থাকে যা সে নিয়ত করে।'**(বর্ণনায় বুখারী)

2. সাফা-মারওয়ার সায়ী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, **'তোমরা সায়ী করো; কেননা আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর সায়ী লিখে দিয়েছেন।'**(বর্ণনায় আহমদ) সায়ী করা আলেমদের কারো কারো নিকট ওয়াজিব, যা ছুটে গেলে দম দিয়ে শুধরে নিতে হয়।

3. উকুফে আরাফা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, **'হজ্ব হলো আরাফা।'**(বর্ণনায় তিরমিযী)

4. তাওয়াফে ইফাযা। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿وَلۡـيَطَّوَّفُواْ بِٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِـيقِ﴾.

(আর তারা যেন প্রাচীন ঘরের তাওয়াফ করে।) [সূরা আল হাজ্ব:২৯]

সতর্কতা

যে ব্যক্তি হজ্বের কোনো রুকন ছেড়ে দিল তার হজ্ব পূর্ণ হবে না যতক্ষণ না সে তা পুনরায় আদায় করে নেবে।

হজ্বের ওয়াজিবসমূহ

১ - মিকাত থেকে ইহরাম করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিকাতের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, **'এ মিকাতগুলো ওই এলাকাবাসী এবং বহিরাগতদের যারা ওই অঞ্চল দিয়ে হজ্ব ও উমরা আদায়ের উদ্দেশে আসবে তাদের জন্য।'** (বর্ণনায় বুখারী)

২ - যে ব্যক্তি দিনের বেলায় উকুফে আরাফা করবে তার জন্য সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করা; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করেছেন।

৩- মুযদালিফায় রাতযাপন; কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম মুযদালিফায় রাতযাপন করেছেন এবং বলেছেন,'আমার উম্মত আমার কাছ থেকে হজ্বকর্মসমূহ বুঝে নিক; কেননা আমি জানি না, এ বছরের পর তোমাদের সাথে আমার হয়তো সাক্ষাৎ নাও হতে পারে। আর যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুর্বলদের জন্য মধ্যরাতের পর মুযদালিফা থেকে প্রস্থান করার অনুমতি দিয়েছেন। এর দ্বারা বুঝা গেল মুযদালিফায় রাতযাপন করা আবশ্যক। আর আল্লাহ তাআলা মাশআরুল হারামের কথা উল্লেখের সময় এ ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন। হানাফী মাযহাব অনুযায়ী সুবহে সাদেকের পর কিছু সময় মুযদালিফায় অবস্থান করা ওয়াজিব।

৪- আইয়ামে তাশরীকে মিনার রাতগুলো মিনায় যাপন করা। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাখালদের জন্য মিনায় রাতযাপন না করার অনুমতি দিয়েছেন। এর দ্বারা বুঝা গেল মিনায় রাতযাপন মূলত ওয়াজিব। ওযর ব্যতীত মিনায় রাতযাপন পরিত্যাগ করা বৈধ নয়। অবশ্য আলেমদের কারো কারো নিকট মিনায় রাতযাপন করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা, যা ছেড়ে দেয়া মাকরুহ এবং অযাচিত কর্ম।

৫- কঙ্কর মারা। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡدُودَٰتٖۚ﴾

(আর আল্লহকে স্মরণ কর নির্দিষ্ট দিনসমূহে।) [আল বাকরা:২০৩]

কঙ্কর নিক্ষেপ করা আল্লাহর যিকরের মধ্যে শামিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,'নিশ্চয় বায়তুল্লাহর তাওয়াফ এবং সাফা-মারওয়ার সায়ী ও কঙ্কর নিক্ষেপ আল্লাহর যিকর বাস্তবায়নের উদ্দেশে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে।

৬ - মাথা মুণ্ডন ও চুল ছোট করা। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿لَتَدۡخُلُنَّ ٱلۡمَسۡجِدَ ٱلۡحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمۡ وَمُقَصِّرِينَ﴾.

(তোমরা ইনশাআল্লাহ নিরাপদে তোমাদের মাথা মুণ্ডন করে এবং চুল ছেঁটে নির্ভয়ে আল-মাসজিদুল হারামে অবশ্যই প্রবেশ করবে।) [সূরা আল ফাতহ:২৭]

৭ - বিদায়ী তাওয়াফ। ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,**'মানুষদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে তাদের শেষ সাক্ষাৎ যেন হয় বায়তুল্লাহর সাথে, তবে তিনি ঋতুগ্রস্ত নারীর জন্য সুযোগ দিয়েছেন।'**

হজ্বের সুন্নতসমূহ

হজ্বের রুকন ও ওয়াজিব ব্যতীত অন্যসব হজ্বকর্ম সুন্নতের মধ্যে শামিল। আর তা হলো নিম্নরূপ:

১- ইহরামের সময় গোসল করা।

২- একটি চাদর এবং সেলাইবিহীন লুঙ্গি পড়ে ইহরাম বাঁধা।

৩ - তালবিয়া পাঠ ও তালবিয়া পাঠের সময় আওয়াজ উঁচু করা।

৪ - আরাফায় গমনের পূর্বরাত মিনায় যাপন করা।

৫ - হাজরে আসওয়াদ ইস্তিলাম করা।

৬- তাওয়াফে কুদূম ও উমরার সময় ইযতিবা করা। ইযতিবা হলো ডান বগলের নিচে চাদর রেখে ডান কাঁধ উন্মুক্ত রাখা।

৭ -তাওয়াফে কুদূম ও উমরার তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল করা। রমল হলো দ্রত পদে চলা।

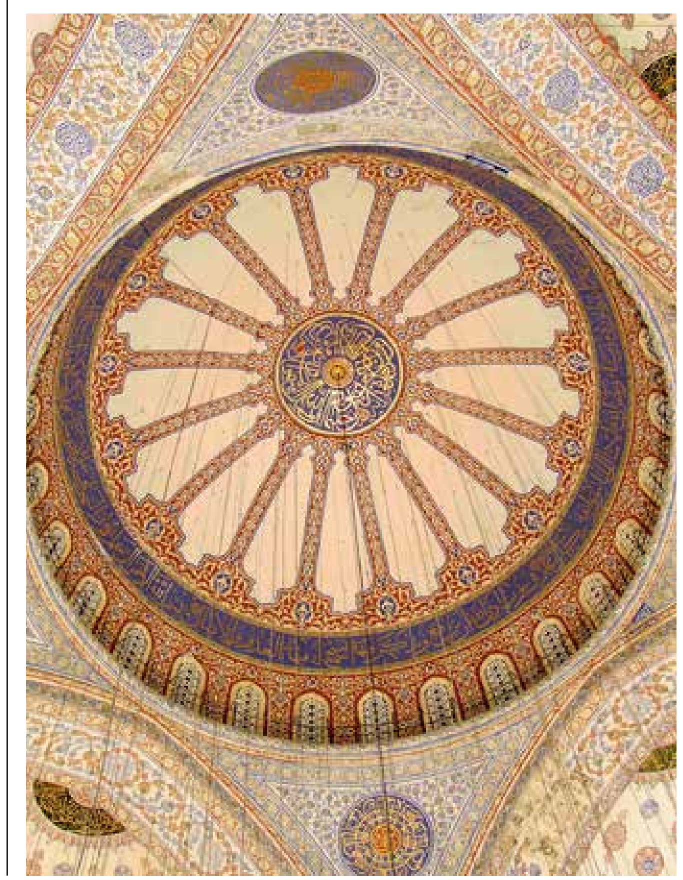
৮ - কিরান ও ইফরাদ হজ্বকারীর তাওয়াফে কুদূম করা।

হজ্বের ওয়াজিবসমূহ

যে ব্যক্তি হজ্বের কোনো ওয়াজিব ছেড়ে দিল, দম যবেহ করে তাকে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

হজ্বের সুন্নতসমূহ

হজ্বের কোনো সুন্নত ছুটে গেলে দম দিতে হবে না। বরং হজ্ব শুদ্ধ বলে গণ্য হবে।



আলোকচিত্রে ইবাদত

সহজ সরল উপয়ে ইসলামের বিধি-বিধান শেখা

পবিত্রতা | নামাজ | রোজা | যাকাত | হজ্ব



Dr. Abdullah Bahmmam

অনুবাদ

আবদুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান

পর্যালোচনার

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

উমরার রুকন, ওয়াজিব ও সুন্নতসমূহ

৮ উমরার রুকন, ওয়াজিব ও সুন্নতসমূহ

উমরার রুকনসমূহ

১ - ইহরাম অর্থাৎ উমরায় প্রবেশের নিয়ত করা। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, **‘নিশ্চয় আমলের নির্ভরতা নিয়তের ওপর। আর প্রতি ব্যক্তির ভাগে তাই থাকে যা সে নিয়ত করে।’**(বর্ণনায় বুখারী)

২ - সাফা-মারওয়ার মাঝে সায়ী করা: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, **‘তোমরা সায়ী করো; নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর সায়ী লিখে দিয়েছেন।’**(বর্ণনায় আহমদ)

৩- তাওয়াফ: আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿وَلۡيَطَّوَّفُواْ بِٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ ٢٩﴾. (আরতারাযেনপ্রাচীনঘরের তাওয়াফ করে) [সূরা আল হাজ্জ: ২৯]

উমরার ওয়াজিবসমূহ

১ - মিকাত থেকে ইহরাম বাঁধা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিকাতের কথা উল্লেখ করে বলেছেন,‘এ মিকাতগুলো ওই এলাকাবাসীর এবং অন্য যারা ওই অঞ্চল দিয়ে আসবে, হজ্ব ও উমরা আদায়ের উদ্দেশে, তাদের জন্য।



ইহরাম

সূচিপত্র





২ - মাথা মুণ্ডন অথবা চুল ছোট করা। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿لَتَدۡخُلُنَّ ٱلۡمَسۡجِدَ ٱلۡحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمۡ وَمُقَصِّرِينَ﴾

(তোমরা ইনশাআল্লাহ নিরাপদে তোমাদের মাথা মুণ্ডন করে এবং চুল ছেঁটে নির্ভয়ে আল-মাসিজিদুল হারামে অবশ্যই প্রবেশ করবে।) [সূরা আল ফাতহ:২৭]

উমরার সুন্নতসমূহ

উল্লিখিত রুকন ও ওয়াজিবসমূহ ব্যতীত উমরার অন্য আমলসমূহ সুন্নত, যেমন:

১ - ইহরামের সময় গোসল করা।

২- একটি চাদর ও একটি সেলাইবিহীন লুঙ্গিতে ইহরাম করা।

৩ - তালবিয়া পাঠ করা ও তা উঁচু স্বরে পাঠ করা।

৪- তাওয়াফের সময় ইযতিবা করা। ইযতিবা হলো ডানবগলের নিচ দিয়ে চাদর পেঁচিয়ে ডানকাঁধ উন্মুক্ত রাখা।

কিছু নির্দেশনা

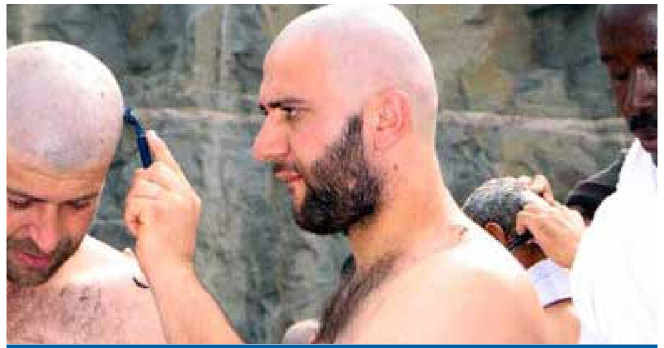
১ - যে ব্যক্তি উমরার কোনো রুকন ছেড়ে দিল, তার উমরা আদায় হবে না যতক্ষণ না সে তা পুনরায় আদায় করে নেবে।

২ - যে ব্যক্তি উমরার কোনো একটি ওয়াজিব ছেড়ে দিল তাকে দম প্রদান করতে হবে। অর্থাৎ একটি বকরী অথবা গরু ও উটের একসপ্তমাংশ।

৩ - যে ব্যক্তি উমরার কোনো একটি সুন্নত ছেড়ে দিল, তাকে কোনো কিছু দিতে হবে না। বরং তার উমরা শুদ্ধ বলে ধরা হবে।



ইহরাম



মাথা মুণ্ডানো অথবা চুল ছোট করা



গোসল করা



আলোকচিত্রে ইবাদত

সহজ সরল উপয়ে ইসলামের বিধি-বিধান শেখা

পবিত্রতা | নামাজ | রোজা | যাকাত | হজ্ব



Dr. Abdullah Bahmmam

অনুবাদ

আবদুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান

পর্যালোচনায়

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

ফিদয়া ও হাদী

৯ ফিদয়া ও হাদী

প্রথমত: ফিদয়া

ফিদয়া

কোনো ওয়াজিব ছুটে গেলে অথবা ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ-বিষয়সমূহের কোনো একটি করে ফেললে হজ্বকারী অথবা উমরাকারীর করণীয়।

কোনো ওয়াজিবকর্ম ছেড়ে দেয়ার ফিদয়া

যে ব্যক্তি হজ্ব অথবা উমরার কোনো ওয়াজিব ছেড়ে দিল, যেমন মুযদালিফায় রাতযাপন অথবা মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করা ছেড়ে দিল, তাহলে ফিদয়া প্রদান ওয়াজিব হবে। এ ফিদয়াকেই দম বলা হয়।

দম হলো পুরুষ অথবা স্ত্রীউটের একসপ্তমাংশ, গরুর একসপ্তমাংশ অথবা এক বছরের একটি বকরী অথবা ছয় মাসের একটি ভেড়া। দম যবেহ করার জায়গা হলো মক্কার পবিত্র এলাকা। দম যবেহ করে তার গোশত অত্র অঞ্চলের দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করে দিতে হবে।

দম যবেহ করতে সক্ষম না হলে দশদিন রোজা রাখতে হবে। তিনদিন হজ্ব পালনাবস্থায়, আর বাকি সাতদিন নিজ পরিবারের কাছে ফিরে গিয়ে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾﴾

(কিন্তু যে তা পাবে না তাকে হজে তিন দিন এবং যখন তোমরা ফিরে যাবে, তখন সাত দিন সিয়াম পালন করবে। এই হল পূর্ণ দশ। এই বিধান তার জন্য, যার পরিবার মাসজিদুল হারামের অধিবাসী নয়। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ আযাবদানে কঠোর।) [সূরা আল বাকারা:১৯৬]

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ-বিষয়সমূহের কোনো একটি করে ফেলার ফিদয়া

১ - সেলাই করা কাপড় পরিধান করা, মাথা ঢেকে রাখা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, মাথা মুণ্ডন করে ফেলা ও নখ কাটার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত তিনটি বিষয়ের যেকোনো একটি করতে হবে:

ক - তিন দিন রোজা রাখা।

সূচিপত্র



খ - ছয় জন মিসকীনকে খাবার প্রদান করা। প্রতি মিসকীনকে অর্ধ সা' করে চাউল অথবা অন্য কোনো খাদ্য প্রদান করা।

গ - বকরী যবেহ করা

দলিল, আল্লাহর তাআলার বাণী :

﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْىُ مَحِلَّهُۥ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة:196]

((আর তোমরা তোমাদের মাথা মুণ্ডন করো না, যতক্ষণ না পশু তার যথাস্থানে পেঁছে। আর তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ কিংবা তার মাথায় যদি কোনো কষ্ট থাকে তবে সিয়াম কিংবা সদকা অথবা পশু যবেহ এর মাধ্যমে ফিদয়া দেবে।)[সূরা আল বাকারা:১৯৬]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম মুহরিম কাব ইবনে উজ্রাকে বললেন,'মাথার উকুন তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে?' সে বলল, জী, তিনি বললেন,'তোমার মাথা মুণ্ডন করে ফেল, অতঃপর কুরবানি হিসেবে একটি বকরী যবেহ করো। অথবা তিনি দিন রোজা রাখো অথবা তিন সা খেজুর ছয় জন মিসকীনকে দান করো।'(দুই মুদ: অর্ধ সা, যার ওজন ১০২০ গ্রাম।)

অতএব ইহরাম অবস্থায় উপরোল্লিখিত পাঁচ নিষিদ্ধ বিষয়ের কোনো একটি যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় অথবা বিশেষ কোনো প্রয়োজনবশত করে ফেলল, যেমনটি করতে হয়েছে কাব ইবনে উজ্রা রাযি. কে, এমতাবস্থায় তাকে ফিদয়া দিতে হবে। এ প্রকৃতির ফিদয়াকে ফিদয়াতুল আযা বা কষ্টজনিত ফিদয়া বলে। আর যে ব্যক্তি বিস্মৃতিবশত এসবের কোনো একটি করে ফেলবে তাকে কোনো কিছু দিতে হবে না।

২- স্ত্রীর গুপ্তাঙ্গের বাইরে অন্য কোথাও যৌন আস্বাদ নেয়া এবং প্রাথমিক নিষেধাজ্ঞামুক্তির পর রতিক্রিয়া।

এ সবের ফিদয়া হবে উল্লিখিত ফিদয়াতুল আযা বা কষ্টজনিত ফিদয়া।

৩-প্রাথমিক নিষেধাজ্ঞামুক্তির পূর্বে রতিক্রিয়া

এ অবস্থায় ফিদয়া হিসেবে একটি উট যবেহ করতে হবে। না পারলে হজ্বে তিন দিন এবং হজ্ব থেকে স্বদেশে ফিরে আসার পর সাত দিন রোজা রাখতে হবে। আর এ অবস্থায় বর্তমান হজ্ব পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যাবে এবং পরবর্তী বছর তা কাযা করা আবশ্যক হবে।

হাদী

মক্কার পবিত্র অঞ্চলে কুরবানীকৃত গবাদি পশু।

৪-উমরা অবস্থায় রতিক্রিয়ার ফিদয়া

একটি বকরী ফিদয়া হিসেবে যবেহ করতে হবে। বর্তমান উমরা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যাবে এবং তা কাযা করা আবশ্যক হবে।

৫-শিকার হত্যা করার ফিদয়া

যদি শিকারকৃত জন্তুর সম পর্যায়ের কোনো জন্তু পাওয়া যায় তাহলে ফিদয়া হিসেবে তা প্রদান করা অথবা এর মূল্যনির্ধারণ করে তা দিয়ে খাদ্য ক্রয় করে প্রতি মিসকীনকে দুই মুদ (১০২০ গ্রাম) করে দেয়া। না পারলে প্রতি দুই মুদের পরিবর্তে একটি করে রোজা রাখা।

শিকারকৃত জন্তুর সম পর্যায়ের জন্তু দ্বারা উদ্দেশ্য এমন জন্তু যা শিকারকৃত জন্তু সদৃশ অথবা তার কাছাকাছি। পূর্ণাঙ্গরূপে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া জরুরি নয়; কেননা তা অসম্ভব।

এর উদাহরণ: যদি কেউ একটি উটপাখি শিকার করে, তাহলে এর পরিবর্তে ফিদয়া হিসেবে একটি উট দিতে হবে; কেননা কিছু বিষয়ে উটপাখি উটের সদৃশ। অথবা উটপাখির মূল্যনির্ধারণ করে তা দিয়ে খাদ্য ক্রয় করে বিতরণ করতে হবে, যেমন চাল বা গম। প্রতি মিসকীনকে দুই মুদ করে খাদ্য বিলিয়ে দিতে হবে, অথবা প্রতি দুহি মুদের পরিবর্তে একদিন করে রোজা রাখতে হবে। আর যদি কেউ বন্যগাধা শিকার করে, তবে এর পরিবর্তে একটি গাভী ফিদয়া হিসেবে দিতে হবে।

আর যদি শিকারকৃত জন্তুর কোনো সদৃশ না থাকে, যেমন ফরিং অথবা চড়ইপাখি। তাহলে তার মূল্যনির্ধারণ করে তা দিয়ে খাদ্য ক্রয় করে মিসকীনদেরকে বিলিয়ে দেয়া ও প্রতি দুই মুদের পরিবর্তে একদিন করে রোজা রাখার মাঝে ব্যক্তির স্বাধীনতা রয়েছে। মূল্যনির্ধারণের ক্ষেত্রে দু জন ইনসাফগার অভিজ্ঞ লোকের আশ্রয় নিতে হবে|

দ্বিতীয়ত: হাদী

হাদীর প্রকারভেদ

তামাত্তু ও কিরান হজ্বের হাদী

তামাত্তু ও কিরান হজ্বকারীর ওপর হাদী ওয়াজিব। আর তা হলো একটি বকরী, অথবা উট বা গরুর একসপ্তমাংশ। না পারলে দশ দিন রোজা রাখতে হবে। তিন দিন হজ্বাবস্থায় এবং সাত দিন হজ্ব থেকে স্বদেশে ফিরে গিয়ে। যারা মক্কায় বসবাসকারী নয় তাদের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য। আর যারা মক্কাবাসী তাদেরকে হাদীও দিতে হবে না, রোজাও রাখাতে হবে না। এর দলিল আল্লাহ তাআলার বাণী : ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۚ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ فِي ٱلۡحَجِّ وَسَبۡعَةٍ إِذَا رَجَعۡتُمۡۗ تِلۡكَ عَشَرَةٞ كَامِلَةٞۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمۡ يَكُنۡ أَهۡلُهُۥ حَاضِرِي ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚ﴾ [البقرة:196] .

(আর যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন যে ব্যক্তি উমরার পর হজ সম্পাদনপূর্বক তামাত্তু করবে, তবে যে পশু সহজ হবে, তা যবেহ করবে। কিন্তু যে তা পাবে না তাকে হজে তিন দিন এবং যখন তোমরা ফিরে যাবে, তখন সাত দিন সিয়াম পালন করবে। এই হল পূর্ণ দশ। এই বিধান তার জন্য, যার পরিবার মাসজিদুল হারামের অধিবাসী নয়। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ আযাবদানে কঠোর।) [সূরা আল বাকারা:১৯৬]

২-নফল হাদী

ইফরাদ হজ্বকারী অথবা উমরাকারী ঐচ্ছিকভাবে যদি হাদী প্রদান করে তবে এটাকে নফল হাদী বলে। তামাত্তু বা কিরান হজকারী ওয়াজিব হাদীর অতিরিক্ত যদি কোনো হাদী প্রদান করে, অথবা হাজ্বী ব্যতীত যদি অন্যকেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে মক্কায় কোনো হাদী পাঠায় তবে সেটাও হবে নফল হাদী।

তামাত্তু, কিরান ও নফল হাদীর গোশত নিজে খাওয়া বৈধ রয়েছে। নিজে খাওয়া বরং মুস্তাহাব; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ করেছেন। হাদীসে এসেছে, ‘রাসূলুল্লাহ

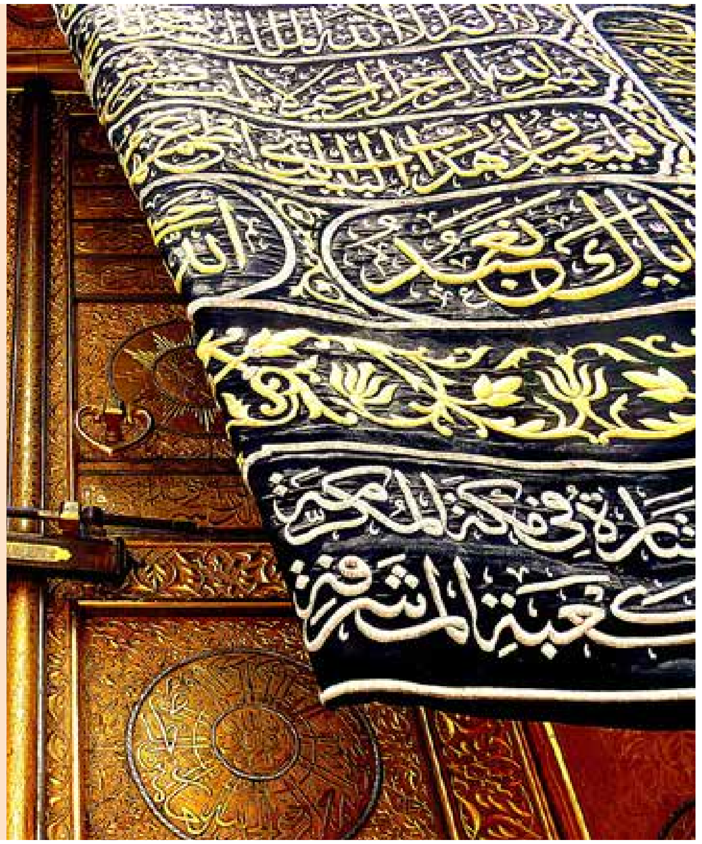
ফিদয়া প্রদানের সময়

ফিদয়া প্রদানের কারণ সংঘটিত হলেই ফিদয়া প্রদান করতে হবে। ইহরামের নিষিদ্ধ-বিষয় সংক্রান্ত ফিদয়া হলে তা সংঘটিত হওয়ার পরপরই তা প্রদান করতে হবে। ওয়াজিব তরক সংক্রান্ত হলে যখন ওয়াজিব তরক হবে তখন ফিদয়া প্রদান করতে হবে।

হাদী ও কুরবানী যবেহ-বিষয়ক কিছু আহকাম

হাদী যবেহ করার ব্যাপারে তামাত্তু ও কিরানকারী হাজ্বী অন্যকাউকে প্রতিনিধি বানাতে পারবে, যদি প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তি বিশ্বস্থ ও নির্ভরযোগ্য হয়। তবে হাজ্বী যদি নিজের হাদী নিজেই যবেহ করে তাই হবে উত্তম।

ফিদয়া, কুরবানীর স্থলাভিষিক্ত হবে না; কেননা ফিদয়া হলো সুযোগ গ্রহণ করার পরিবর্তে প্রদেয় পশু, আর কুরবানী হলো হাজ্বী ও গায়রে হাজ্বী সবার জন্য।





নখ কাটা



চুল মুণ্ডানো অথবা কাটা



সুগন্ধি



এমন কোনো কাপড় দিয়ে পুরুষের মাথা ঢেকে রাখা যা মাথার সাথে লেগে থাকে



মুহরিম ব্যক্তির সেলাই করা পোশাক পরিধান

আলোকচিত্রে ইবাদত

সহজ সরল উপয়ে ইসলামের বিধি-বিধান শেখা

পবিত্রতা | নামাজ | রোজা | যাকাত | হজ্ব



Dr. Abdullah Bahmmam

অনুবাদ

আবদুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান

পর্যালোচনায়

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

কুরবানীর মাসায়েল

১০ কুরবানী

কুরবানী

কুরবানী করার দিনসমূহে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশে যবেহকৃত গবাদিপশু।

সূচিপত্র

কুরবানীর হুকুম

কুরবানী করা হানাফী মাযহাব অনুযায়ী সক্ষম ব্যক্তিদের ওপর ওয়াজিব, জমহুর ফুকাহার নিকট সুন্নতে মুয়াক্কাদা। আল কুরআনে এসেছে:

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ ۝٢ ﴾

(অতএব তোমার রবের উদ্দেশ্যেই নামাজ পড় এবং কুরবানী কর।) [সূরা আল কাউছার:২]

আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে,‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিংবিশিষ্ট সাদা-কালো দুটি মেষ কুরবানী করেছেন। এ দুটি তিনি নিজ হাতে কুরবানী করেছেন। বিসমিল্লাহ বলেছেন ও তাকবীর দিয়েছেন। (যবেহ করার সময়) তিনি তাঁর পা এ দুটির ঘাড়ের একপাশে রেখেছেন।’(বর্ণনায় তিরমিযী)

কুরবানী যবেহ করার সময়

দশ যিলহজ্ব ঈদের নামাজ আদায়ের পর থেকে আইয়ামে নহরের শেষ দিন অর্থাৎ হানাফী মাযহাব অনুযায়ী ১২ যিলহজ্ব আর জমহুর ফুকাহার নিকট ১৩ যিলহজ্ব সূর্যাস্ত পর্যন্ত কুরবানী করা চলে।

কুরবানীতে যা জায়েয

১- একটি মেষ এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে শুদ্ধ হবে। তবে ছাওয়াবের ক্ষেত্রে যে কাউকে শরীক করা যাবে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাঁর কুরবানী যবেহ করার ইচ্ছা করলেন, তিনি বললেন, ‘বিসমিল্লাহ। হে আল্লাহ, আপনি এ কুরবানী মুহাম্মাদ, মুহাম্মাদের পরিবার ও উম্মতে মুহাম্মাদির পক্ষ থেকে কবুল করুন।’(বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

২ - একটি উট বা গরু সাতজনের পক্ষ থেকে কুরবানী করা বৈধ।



অর্থাৎ একটি উট বা গরুতে সাতজন শরীক হতে পারে। জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন,‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে উট ও গরুতে শরীক হতে বলেছেন। প্রতি সাতজন একটি উটে।’(বর্ণনায় মুসলিম)

কুরবানীর পশুর বৈধ বয়স

ছয় মাস বয়সী ভেড়া

এক বছর বয়সী বকরী

দুই বছর বয়সী গরু

পাঁচ বছর বয়সী উট

কুরবানীর পশুর দোষত্রুটি

যেসব দোষের কারণে কুরবানী করা শুদ্ধ হবে না

কুরবানীর পশু অন্ধ অথবা কানা হওয়া।

কুরবানীর পশু অন্ধ অথবা কানা হওয়া।

একেবারে শুকনো যাতে কোনো গোশত নেই।

স্পষ্টভাবে অসুস্থ পশু

এর দলিল বারা ইবনে আযেব রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীস, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘কুরবানীতে কানা পশু, যে স্পষ্টভাবেই কানা, লেংড়া পশু, যে স্পষ্টভাবেই লেংড়া , অসুস্থ পশু যে স্পষ্টভাবেই অসুস্থ, শুকনো পশু যাতে মজ্জা নেই, কুরবানী করা জায়েয হবে না।’(বর্ণনায় মুসলিম)

এসব দোষের সাথে, যা এসবের সদৃশ অথবা এসব থেকেও খারাপ, এ জাতীয় অন্যান্য দোষও যুক্ত হবে।

২ - যেসব দোষ থাকলে কুরবানী করা শুদ্ধ হবে

লেজকাটা পশু

জন্মগতভাবেই যার শিং নেই

খাশী, যার অণ্ডকোষ থেকে মুষ্ক কেটে ফেলা হয়েছে।

যার কান ফাটা অথবা অল্পপরিমাণ শিং ভাঙ্গা।



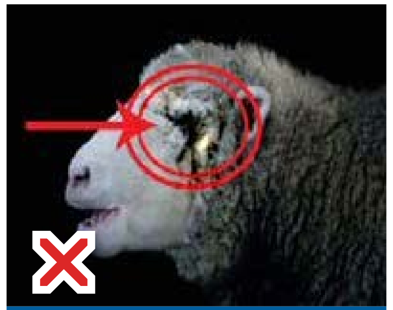
জ্ঞাতব্য

কুরবানীর পশু, জায়েয অথবা না-জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে যা বলা হলো, হজ্বের হাদী ও ফিদয়ার ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য হবে।

কুরবানী ভাগ করা

কুরবানীকারী একতৃতীয়াংশ কুরবানীর গোশত নিজের জন্য রেখে দিতে পারবে। একতৃতীয়াংশ হাদিয়া দেবে এবং একতৃতীয়াংশ সদকা করে দেবে। যদি পুরোটাই সদকা করে দেয় তবে শুদ্ধ হবে। যদি অধিকাংশ নিজের জন্য রেখে দেয় এতেও কোনো ক্ষতি হবে না।


শুকনা


কানা


লেংড়া


যার শিং ভাঙ্গা


শিংবিহীন

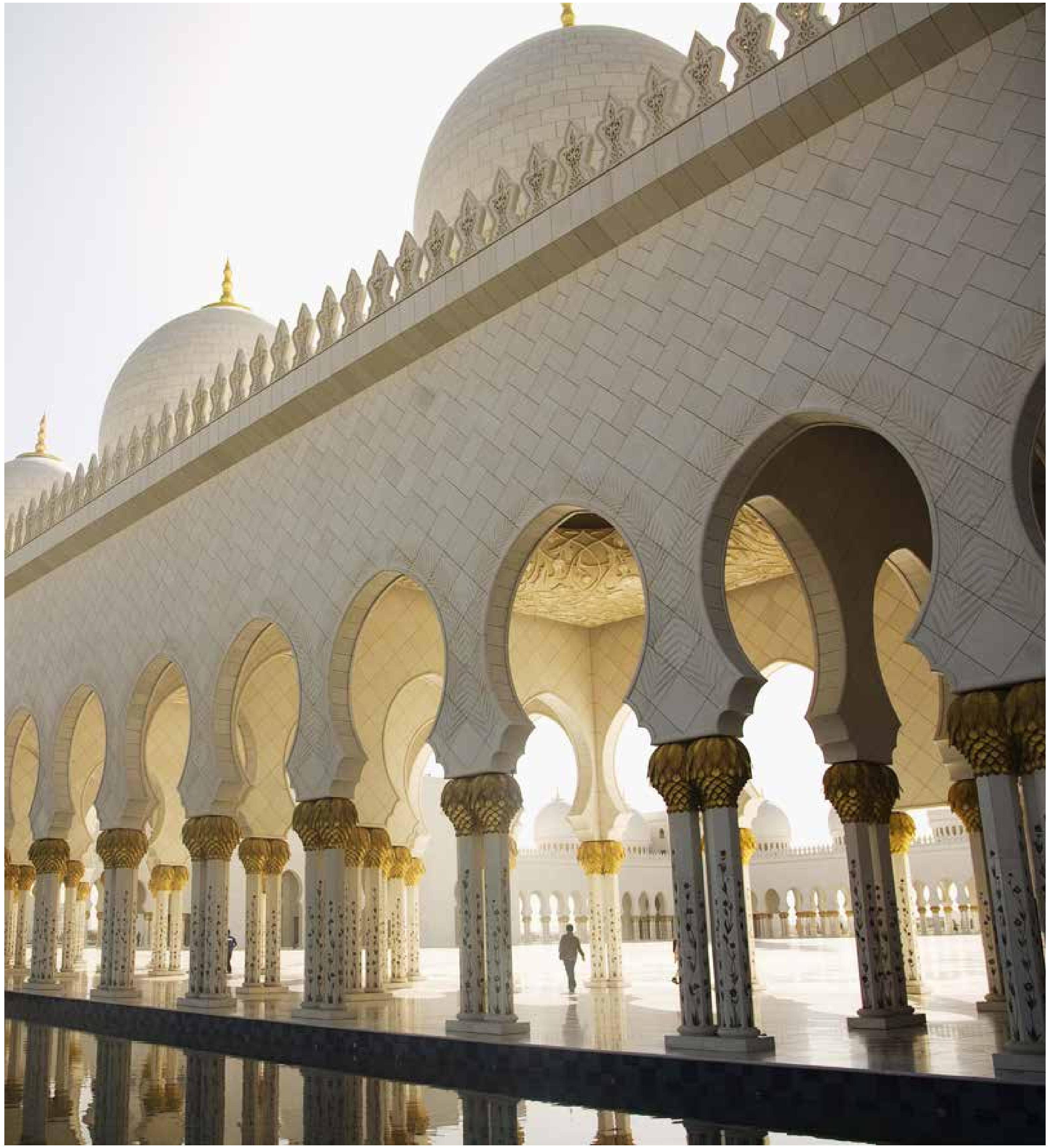

লেজ-কাটা

সতর্কতা

১ - যবেহকৃত হাদীর গোশত যাতে অবহেলায় নষ্ট না হয়ে যায়, বরং এর যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত হয় এ ব্যাপারে সচেতন থাকা আবশ্যক। অনেক হাজী এমন রয়েছেন যারা যবেহ করার জায়গাতে চামড়া ছুলানো অথবা গোশত কাটা ব্যতীতই তাদের কুরবানীকৃত পশু ফেলে রেখে চলে আসেন। এরূপ করা সমুচিত নয়।

২ - যে ব্যক্তি কুরবানী করতে চায় তার চুল কাটা, নখ কাটা অথবা গায়ের চামড়ার কোনো অংশ কাটা বৈধ নয়। যিলহজ্ব মাস শুরু হওয়ার পর থেকে যবেহ করা পর্যন্ত এসব থেকে বিরত থাকতে হবে। উম্মে সালামা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, **'যখন যিলহজ্বের প্রথম দশক প্রবেশ করবে এবং তোমাদের কেউ কুরবানী করতে ইচ্ছা করবে তখন চুল ও চামড়ার কিছুতে সে হাত দেবে না।'** (বর্ণনায় মুসলিম)

অবশ্য পরিবার-পরিজনের মধ্যে যাদের পক্ষ থেকে কুরবানী করা হয়, যেমন স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, তাদের উপর এসব বিষয়ের নিষেধাজ্ঞা নেই।



আলোকচিত্রে ইবাদত

সহজ সরল উপয়ে ইসলামের বিধি-বিধান শেখা

পবিত্রতা | নামাজ | রোজা | যাকাত | হজ্ব



Dr. Abdullah Bahmmam

অনুবাদ

আবদুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান

পর্যালোচনায়

মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

যিয়ারতে মদীনা: ফজিলত ও তাৎপর্য



১১

যিয়ারতে মদীনা: ফজিলত ও তাৎপর্য

সূচিপত্র

মদীনার নামসমগ্র

মদীনার নামসমগ্র

১- আলা মাদীনা: আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

﴿يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ﴾

(তারা বলে, যদি আমরা মদীনায় ফিরে যাই তাহলে অবশ্যই সেখান থেকে প্রবল, দুর্বলকে বহিষ্কার করবে।) [সূরা আল মুনাফিকুন:৮]

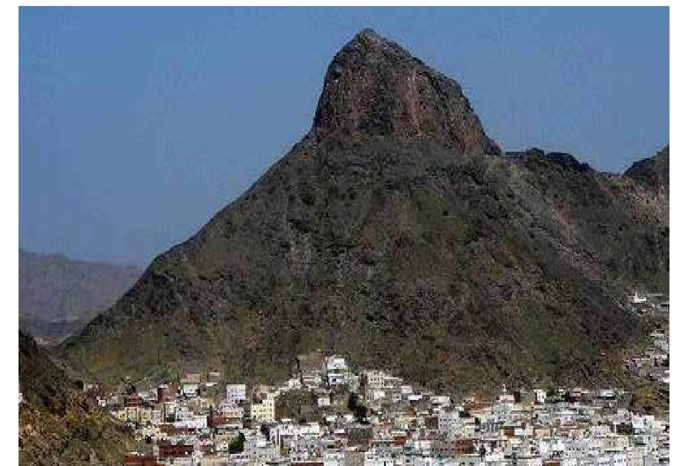
২- তাবা: জাবের ইবনে সামুরা রাযি. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, ‘নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মদীনার নাম তাবা রেখেছেন।’(বর্ণনায় মুসলিম)

৩- তাইয়েবা: যায়েদ ইবনে ছাবেত রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘নিশ্চয় মদীনা ‘তাইয়েবা’, গোনাহকে সরিয়ে দেয় যেভাবে আগুন রুপার আবর্জনা সরিয়ে দেয়।’(বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

মদীনার ফজিলত

সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,‘মদীনা তাদের জন্য উত্তম, তারা যদি জানত। যদি কেউ মদীনাকে নিরাগ্রহবশত ছেড়ে যায়, তবে আল্লাহ তার জায়গায় তার থেকেও উত্তম কাউকে বসবাস করাবেন। আর মদীনার কষ্ট-যাতনায় যে ধৈর্য ধরবে আমি অবশ্যই তার জন্য সুপারিশকারী হব অথবা কিয়ামতের দিন তার পক্ষে সাক্ষী হব।’(বর্ণনায় মুসলিম)

২ - আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন। ‘আমাকে একটি জনপদে হিজরত করে যেতে বলা হয়েছে, যা সকল জনপদকে খেয়ে ফেলবে। মানুষ একে য়াছরিব বলে, আর তা হলো মদীনা। মদীনা খারাপ মানুষদেরকে সরিয়ে দেয় যেভাবে কামারের হাপর লোহার আবর্জনা সরিয়ে দেয়।’(বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)



জাবালে ছাওর



জাবালে আইর

মদীনার বৈশিষ্ট্য

১ - আইর ও ছাওর পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী মদীনা নিরাপদ ও পবিত্র অঞ্চল। অতএব মদীনার গাছ কাটা ও শিকারজন্তু শিকার করা নিষিদ্ধ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘আইর ও ছাওরের মধ্যবর্তী মদীনা পবিত্র অঞ্চল। অতঃপর যে ব্যক্তি এতে কোনো বিদআতের উদ্ভব ঘটাবে অথবা বিদআতীকে আশ্রয় দেবে, তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও সমস্ত মানুষের লানত।’(বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

২ - মদীনায় নামাজের ছাওয়াব বর্ধিত আকারে অর্জিত হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘আমার এ মসজিদে নামাজ আদায় অন্যকোনো মসজিদে এক হাজার নামাজের চেয়েও উত্তম, তবে মসজিদুল হারামের কথা ভিন্ন।’(বর্ণনায় বুখারী)

৩ - মদীনায় রাওযাতুন মিন রিয়াজুল জান্নাত রয়েছে, যাতে নামাজ আদায় করা সুন্নত।

আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,‘আমার ঘর ও আমার মিম্বারের মধ্যবর্তী জায়গা জান্নাতের রওজাসমূহের একটি



রওজাতুল জান্নাত

৪- মদীনায় শেষ যুগে দাজ্জাল প্রবেশ করবে না। মহামারিও প্রবেশ

করবে না।

আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন **‘মদীনায় দাজ্জাল আসবে, কিন্তু সে মদীনাকে ফেরেশতাদের দ্বারা প্রহরারত অবস্থায় দেখবে, অতঃপর মদীনায় মহামারি ও দাজ্জাল প্রবেশ করবে না ইনশাআল্লাহ।’** (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

৫ - রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার বরকতের জন্য দুআ করেছেন। আনাস রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, **‘হে আল্লাহ, আপনি মদীনাকে মক্কার তুলনায় দ্বিগুণ বরকতপূর্ণ করুন।’** (বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম)

মসজিদে নববী যিয়ারতের হুকুম

মসজিদে নববী যিয়ারত করা হজ্বের রুকন, শর্ত অথবা ওয়াজিবের মধ্যে শামিল নয়। তা বরং সুন্নত এবং যেকোনো সময়ই করা যায়।

তবে যিয়ারতে মদীনার উদ্দেশ্য হতে হবে মসজিদে নববীতে নামাজ আদায় করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবর যিয়ারত উদ্দেশ্য হলে শুদ্ধ হবে না। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,‘তোমরা তিন মসজিদের উদ্দেশ্য ব্যতীত সফর করো না: মসজিদুল হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদুল আকসা।

যদি সফরের উদ্দেশ্য মসজিদে নববীতে নামাজ আদায় না হয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবর যিয়ারত হয় তবে অধিকাংশ আলেমদের মতে তা শরীয়তসিদ্ধ হবে না। শরীয়তে এ ব্যাপারে কোনো নির্দেশও আসেনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনা গমন-বিষয়ক যেসব হাদীস উল্লেখ করা হয় তা আহলে ইলমের ঐক্যমত্য অনুযায়ী যঈফ অথবা মাওযু। নির্ভরযোগ্য হাদীসবিদগণের কেউই এসব হাদীস বর্ণনা করেননি। ইমামদের কেউ এসব হাদীস দলিল হিসেবেও উল্লেখ করেন নি’।

যিয়ারতের হুকুম ও আদব

১ - যখন যিয়ারতকারী মসজিদে নববীতে পৌঁছবে, ডান পা আগে দেবে ও বলবে اللَّهُمَّ افتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ (হে আল্লাহ, আপনি আমার জন্য রহমতের সকল দরজা উন্মুক্ত করে দিন।)

২ - তাহিয়াতুল মসজিদের দু রাকাত নামাজ পড়বে। এ দু রাকাত রওজাতুল জান্নাতে পড়তে পারলে ভালো।

৩ - নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবর, তার দুই সাথী আবু বকর ও উমর রাযি. এর কবর যিয়ারত করা সুন্নত। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবরের সামনে আদবের সাথে দাঁড়াবে। আওয়াজ নিচু রাখবে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি দরুদ ও সালাম পেশ করবে। এরপর আবু বকর রাযি. ও উমর রাযি. এর প্রতি সালাম পেশ করবে।

৪ - মসজিদে নববী যিয়ারতের সময় পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে নববীতে আদায় করা, বেশি বেশি দুআ-যিকর করা, নফল নামাজ পড়া, বিশেষ করে রওজাতুল জান্নাতে, সুন্নত বলে বিবেচিত।

৫ - নামাজ আদায়ের উদ্দেশে মসজিদে কুবা যিয়ারত করা সুন্নত। যদি শনিবারে তা সম্ভব হয় তবে তা উত্তম। ইবনে উমর রাযি. বলেন: **‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরোহিত অবস্থায় ও পায়ে হেঁটে মসজিদে কুবায় যেতেন। তিনি তাতে দু রাকাত নামাজ আদায় করতেন।’** (বর্ণনায় মুসলিম) অন্য শব্দমালায় এসেছে, **‘তিনি কুবায় যেতেন অর্থাৎ প্রতি শনিবার।’** (বাকী: মসজিদে নববী সংলগ্ন কবরস্থান যেখানে অনেক সাহাবী কবরস্থ রয়েছেন।)৬ - বাকীর কবরস্থান যিয়ারত করাও সুন্নত। হামযা রাযি.সহ উহুদযুদ্ধের শহীদদের কবর যিয়ারত করাও সুন্নত; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কবর যিয়ারত করতেন এবং তাদের জন্য দুআ করতেন। তিনি বলতেন:

«السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لَلَاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية»

(আপনাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক হে অত্র জায়গায় বসবাসকারী মুমিন-মুসলিমগণ। আমরা (আপনাদের সাথে) যুক্ত হব, ইনশাআল্লাহ। আমাদের জন্য ও আপনাদের জন্য আল্লাহর দরবারে পরিত্রাণ কামনা করি।)

যিয়ারতের ভুলত্রুটি

১ - কবর যিয়ারত ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ দেখার জন্য মদীনায় সফর করা। বরং শরীয়তসিদ্ধ হলো মসজিদে নববী যিয়ারত ও তাতে নামাজ আদায় করার উদ্দেশ্যে সফর করা। আর মসজিদে নববীতে গমন করলে কবর যিয়ারত স্বতঃস্ফূর্তভাবেই হয়ে যায়।

২ - দুআ করার সময় কবরমুখি হয়ে দুআ করা।

৩ - রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে কোনো কিছু চাওয়া। আল্লাহ ব্যতীত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে কোনো প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রার্থনা করা। এরূপ করা নিঃসন্দেহে বড় শিরক।

৪ - কবরের কাছে আওয়াজ উঁচু করা। দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকা। যতবার মসজিদে প্রবেশ করবে ততবার দূর থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি সালাম দেয়া। সালাম পেশ করার পর নামাজে দাঁড়ানোর ন্যায় ডান হাত বাম হাতের ওপর রাখা কিছুতেই উচিত নয়।

মদীনা মুনাওয়ারার ফজিলত

আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, **‘নিশ্চয় ইবরাহীম মক্কাকে পবিত্র হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন এবং মক্কার জন্য দুআ করেছেন। আমি মদীনাকে পবিত্র ঘোষণা করছি যেভাবে ইবরাহীম মক্কাকে পবিত্র ঘোষণা করেছেন। এবং আমি মদীনার জন্য দুআ করেছি। মদীনার মুদ ও সা (তৎকালীন দুটি শস্য মাপার পাত্র) এর জন্য দুআ করেছি, যেভাবে ইবরাহীম মক্কার জন্য করেছেন।’**(1) বর্ণনায় বুখারী ও মুসলিম

(1) (বর্ণনায় মুসলিম)



সূচীপত্র

বন্ধুত্বপূর্ণ সাইট